

খ্রিস্টমাণ্ডলী বিসয়ক বচনাসম্ভার

মিলনসত্তা – অংশগ্রহণ – মিশনকর্ম – সাক্ষ্যদান



মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তরে

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ, ঢাকা আর্চডায়োসিস

২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ

খ্রিস্টমাণ্ডলী বিসয়ক ব্রতাসঙ্ঘত

মিলনসত্তা - অংশগ্রহণ - মিশনকর্ম - সাক্ষ্যদান



মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তরে

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ, ঢাকা আর্চডাইয়েসিস
২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ

প্রকাশনা-তথ্য

গ্রন্থের নাম	: খ্রিস্টানগুলী বিসয়ক রচনাসমূহ মিলনসভা - অংশগ্রহণ - মিশনকর্ম - সাক্ষ্যদান
গ্রন্থণায়	: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
বর্ণবিন্যাসে	: জেমস গোমেজ
প্রকাশনায়	: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি কার্ডিনাল-পরম্পরা প্রকাশনা সাধুর বাড়ি, পাদ্রীশিবপুর (পশ্চিম), বরিশাল - ৮২৮২
সহযোগিতায়	: ফাদার স্বপন দাস, সিএসসি
স্বত্বাধিকার	: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
সংস্করণ	: সাধু প্যাট্রিকের পর্ব, ১৭ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
সহযোগিতা ও মুদ্রণে	: স্পেস্ট্রাম জিডিপি ১০, মনিপুরীপাড়া, ফার্মগেট তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ মোবাইল- ০১৭৭২৪১১৪০৩-৪
শুভেচ্ছা মূল্য	: ৩০০/- টাকা
প্রাপ্তিস্থান	: মরো হাউস, ২৮, রোড নং ৩, ব্লক - ডি, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা কার্ডিনাল-পরম্পরা, পাদ্রীশিবপুর, বরিশাল

বিসয়সূচি

গ্রন্থের প্রাক-কথন

“খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক রচনাসম্ভার” গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পর এটি নিয়ে ১৩ তম গ্রন্থ। অবশ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে অনেক রচনাই ছিল অতীতের অনেক লেখার সংকলন। ব্যতিক্রম হিসেবে সর্বশেষ দু’টো বই ছিল গবেষণামূলক ইতিহাস।

বিগত পাঁচ বছরে, অর্থাৎ ২০২০ থেকে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে এবং বিষয়ের ওপর অনেকগুলো লেখা অপ্রকাশিত ছিল যার বিষয়বস্তু ছিল: খ্রিস্টমণ্ডলী, খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, মণ্ডলীর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ, ধর্মোপদেশ এবং বিশেষ ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবন-আলেখ্য সংক্রান্ত। বিগত পাঁচ বছরে লেখা গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলো সংকলিত করে “খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক রচনাসম্ভার” নামে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করছি। এ রচনাসম্ভারে ৫৬ টি রচনা স্থান পেয়েছে। রচনাসম্ভারের মধ্যে যে মূল বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা প্রধানত: খ্রিস্টমণ্ডলীর “মিলনসভা, অংশগ্রহণ, মিশনকর্ম ও সাক্ষ্যদান” সম্পর্কিত বলে উপ-শিরোনামে উল্লেখ রয়েছে।

এ গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলো আটটি ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগের রয়েছে একটি সামগ্রিক মূলভাব যার আওতাভুক্ত ৫৬ টি রচনা বিন্যস্ত করা হয়েছে। আটটি ভাগের মূল শিরোনাম হচ্ছে:

- (১) কাথলিক মণ্ডলী: সিনড ও সিনড-প্রক্রিয়া (সাতটি রচনা);
- (২) কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা (তেরোটি রচনা);
- (৩) খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐক্য ও আন্তঃমণ্ডলিক সংলাপ (তিনটি রচনা);
- (৪) বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলীতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ (তিনটি রচনা);
- (৫) জুবিলীবর্ষ - ২০২৫ খ্রি. : পুণ্যবর্ষ (চারটি রচনা);
- (৬) প্রতিষ্ঠানের জুবিলী উদ্‌যাপন (সাতটি রচনা);
- (৭) পবিত্র ত্রুশ সংঘে নিবেদিত জীবন (নয়টি রচনা); এবং
- (৮) বিশেষ ব্যক্তিবর্গের স্মরণে ভক্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি (দশটি রচনা)।

অধিকাংশ লেখাই বাংলায় রচিত। তবে এই পুস্তকে ১০ টি লেখা আছে ইংরেজীতে। ইংরেজী জানা পাঠক-পাঠিকারাও বইটি পড়ে উপকৃত হবেন।

উপসংহারে, আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই মট্‌স-এর পরিচালক মি. জেমস গোমেজকে। পূর্বের ন্যায়, শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও, এবারও বইটি পাণ্ডুলিপি পাঠ করে সংশোধন করেছেন এবং গ্রন্থের বর্ণ বিন্যাস এবং প্রুফ রিডিং করে বইটি উপস্থাপনার মান উন্নীত করেছেন। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাই ফাদার স্বপন দাশ, সিএসসি-কে। তিনি পুস্তকটি মুদ্রণের কাজে সহায়তা করেছেন।

“খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক রচনাসম্ভার” গ্রন্থটিতে সম-সাময়িক ও যুগোপযোগী অনেক বিষয় আছে যেখানে নতুন পদ্ধতিতে মণ্ডলী নির্মাণ করার ধারণা ও নির্দেশনা রয়েছে। পাঠকদের কাছে অনুরোধ রচনাগুলো পাঠ করে খ্রিস্টমণ্ডলী সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের স্বপ্ন ও রূপরেখা অনুসারে খ্রিস্টমণ্ডলীকে মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণমূলক ও মিশনমুখী করতে আপনাদের নিজস্ব অবদান রাখবেন।

প্রথম ভাগ: কাথলিক মণ্ডলী: সিনড ও সিনড-প্রক্রিয়া পৃষ্ঠা

রচনা- ১: খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিশপ সিনড: বিশ্বজনীন মণ্ডলীর ধারণা ও স্থানীয় মণ্ডলীর সাক্ষ্যদান	৭
রচনা- ২: সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী : সিনড-প্রস্তুতি ও সিনড-অধিবেশন	১৭
রচনা- ৩: “সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী”: সিনডের প্রথম অধিবেশন	২৫
রচনা- ৪: সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর আধ্যাত্মিকতা	৩২
রচনা- ৫: পোপ ফ্রান্সিস : প্রেরিতিক সংবিধান “মঙ্গলবার্তা ঘোষণা”	৩৫
রচনা- ৬: পোপ লিও-র আমন্ত্রণে কার্ডিনাল পরিষদের বিশেষ সভা	৪৪
রচনা- ৭: CLERICALISM: UNDERSTANDING AND REMEDIES ...	৪৭

দ্বিতীয় ভাগ: কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বিষয়ক রচনা

রচনা- ১: পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তাধারা অনুসারে ন্যায় ও শান্তি	৫০
রচনা- ২: আশাময় ধরিত্রী নির্মাণে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও পোপ চতুর্দশ লিও	৭১
রচনা- ৩: শান্তির পথ : শিক্ষা, শ্রম ও সংলাপ	৭৭
রচনা- ৪: REFLECTION: GOLDEN JUBILEE OF JUSTICE AND PEACE COMMISSION	৭৯
রচনা- ৫: সবুজ বিশ্বায়নে ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় যুবাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা	৮২
রচনা- ৬: কাথলিক মণ্ডলীতে শিক্ষাদানের সেবাকর্ম	৯১
রচনা- ৭: মূল্যবোধ-শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম	৯৫
রচনা- ৮: ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল: ইতিবৃত্ত	৯৯
রচনা- ৯: IDENTITY AND VALUES OF CARITAS BANGLADESH	১০২
রচনা- ১০: PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR A SUSTAINABLE CHRISTIAN SOCIETY	১০৭

রচনা- ১১: টেকসই খ্রিস্টান সমাজ নির্মাণ	১১৩
রচনা- ১২: ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসা	১১৫
রচনা- ১৩: সাম্প্রতিক বাংলাদেশ এবং স্থানীয় মণ্ডলীর ভাবনা	১১৭

তৃতীয় ভাগ: খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐক্য ও আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপ

রচনা- ১: মণ্ডলীতে খ্রিস্টীয় ঐক্য সম্পর্কে মৌলিক ধারণা	১২৩
রচনা- ২: খ্রিস্টান বিশ্বাস এবং নিসীয খ্রিস্ট-বিশ্বাসমন্ত্র	১৩৩
রচনা- ৩: আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্ক : পোপ ফ্রান্সিসের উদ্যোগসমূহ	১৪২

চতুর্থ ভাগ: বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলীতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

রচনা- ১: বাংলাদেশ মণ্ডলীর পালকীয় পরিকল্পনা ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ	১৪৮
রচনা- ২: আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আধ্যাত্মিকতা	১৫১
রচনা- ৩: PROMOTING A CULTURE OF HARMONY	১৫২

পঞ্চম ভাগ: জুবিলীবর্ষ - ২০২৫ : পুণ্যবর্ষ

রচনা- ১: “আশার তীর্থযাত্রী আমরা”	১৫৬
রচনা- ২: পরিবারের জুবিলী উদ্‌যাপন	১৫৯
রচনা- ৩: জুবিলীবর্ষে তরুণদের নিকট তপস্যা কালীন বাণী	১৬২
রচনা- ৪: জাতীয় জুবিলী-উৎসব – ব্যক্তিগত ধ্যান সহভাগিতা	১৬৬

ষষ্ঠ ভাগ: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জুবিলী উদ্‌যাপন

রচনা-১: বাংলাদেশ ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সুবর্ণ জয়ন্তী	১৬৯
রচনা- ২: ঢাকা আর্চবিশপ ভবনের শততম বর্ষপূর্তি	১৯৯
রচনা- ৩: জাতীয় উচ্চ সমিনারি প্রতিষ্ঠার পূর্বকথা	২০৭
রচনা- ৪: পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারির সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে ধর্মোপদেশ	২১৩

রচনা- ৫: স্থানীয় মণ্ডলীর উন্নয়নে নটর ডেম কলেজের অবদান	২১৭
রচনা- ৬: অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট : প্রাচ্যের প্রতিষ্ঠান	২২২
রচনা- ৭ দি ঢাকা খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: ঢাকা: সপ্ত-দশক পূর্তি	২২৫

সপ্তম ভাগ: পবিত্র ত্রুশ সংঘে নিবেদিত জীবন

রচনা- ১: ঈশ্বরের আহ্বান	২২৭
রচনা- ২: প্রভু যিশুর শিষ্য আমরা	২৩০
রচনা- ৩: পবিত্র ত্রুশ সংঘ ঃ প্রেরণার বাণী	২৩৪
রচনা- ৪: ঐশ পরিকল্পনায় ফাদার মরোর আস্থা	২৪৪
রচনা- ৫: যিশু হৃদয় সংঘ প্রদেশ প্রতিষ্ঠার প্রাক্-কথন	২৪৬
রচনা- ৬: যিশু হৃদয় সংঘ প্রদেশ : একসঙ্গে পথচলার চেতনা ও অভিজ্ঞতা	২৫৪
রচনা- ৭: ENLARGE THE SPACE OF HOLY CROSS TENT.....	২৫৯
রচনা- ৮: CATHOLIC EDUCATION APOSTOLATE IN BANGLADESH...	২৬৯
রচনা- ৯: যিশু-হৃদয় সংঘ-প্রদেশ প্রতিষ্ঠার রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে ধর্মোপদেশ	২৭৪

অষ্টম ভাগ : বিশেষ ব্যক্তিবর্গের স্মরণে ভক্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি

রচনা- ১: পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি : “সত্যের সাধক”	২৭৯
রচনা- ২: REFLECTIONS ON POPE FRANCIS	২৮৪
রচনা- ৩: পোপ চতুর্দশ লিও: কী তাঁর পরিচয়? কোন পথে তিনি চলবেন?	২৮৮
রচনা- ৪: SHORT BIOGRAPHY ON ARCHBISHOP THEOTONIUS A. GANGULY, CSC.	২৯৯

রচনা- ৫: INTERVIEW ON ARCHBISHOP THEOTONIUS A. GANGULY, CSC.	৩২০
রচনা- ৬: ঈশ্বর-সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী	৩৪৩
রচনা- ৭: পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ বার্গাবা দ্বিজেন মণ্ডল: প্রাণের ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি	৩৪৬
রচনা- ৮: স্যামসন এইচ চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী	৩৫১
রচনা- ৯: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি : দায়িত্ব থেকে অবসর	৩৫৪
রচনা- ১০: নিধন ডি'রোজারিও সম্পর্কে কয়েকটি কথা	৩৫৮
কার্ডিনালের প্রকাশিত রচনাসমূহ	৩৬১
লেখক পরিচিতি	৩৬৩

প্রথম ভাগ: কাথলিক মণ্ডলী: সিনড ও সিনড-প্রক্রিয়া

রচনা- ১: খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিশপ সিনড:

বিশ্বজনীন মণ্ডলীর ধারণা ও স্থানীয় মণ্ডলীর সাক্ষ্যদাতা

ভূমিকা:

আধুনিক জগতের সাম্প্রতিক জটিল অবস্থায় কাথলিক মণ্ডলী ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতার বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে মানুষের ও কাথলিক বিশ্বাসীদের বহু প্রশ্ন, চ্যালেঞ্জ, সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে পোপ মহোদয় গোটা কাথলিক মণ্ডলীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন যেন মণ্ডলী সিনড-প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, যার মধ্য দিয়ে মণ্ডলী জনগণের কথা ও মতামত শ্রবণ করতে পারে, একসঙ্গে পবিত্র আত্মার ইচ্ছা কী তা অবধারণ করতে পারে এবং একসঙ্গে পথ চলার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। পাপ মহোদয়ের নির্দেশনা এই যে, মণ্ডলী যেন সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নির্দেশনা ও মণ্ডলীর এতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই পোপ ফ্রান্সিস এই নির্দেশনা দিচ্ছেন।

সিনড (*synod*) শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ *synodus* (সিনোডুস) থেকে যার অর্থ হচ্ছে: ‘একসঙ্গে চলা’ বা ‘একসঙ্গে পথচলা’। মণ্ডলীর ভাবনায় সিনড কথার অর্থ হচ্ছে: প্রেরিতদূতদের উত্তরাধিকারী মণ্ডলীর বিশপগণ জনগণের সাথে, পরস্পরের সাথে এবং মণ্ডলীর প্রধান পোপের সাথে একসঙ্গে পথ চলবেন।

৥ ক ৥ প্রেক্ষাপট: বিশপ-সিনড-এর ২৬তম সাধারণ অধিবেশন-২০২৩

পুণ্যপিতা পাপ ফ্রান্সিস, বিগত ২৪ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, বিশপ-সিনড দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেল, কার্ডিনাল মারিও গ্রৈথকে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে “বিশপ-সিনড-এর ২৬তম সাধারণ অধিবেশন” অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার প্রস্তাবিত কর্মসূচিতে তিনি অনুমোদন দিয়েছেন।

অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বজনীন বিশপ সিনড-২০২৩-এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে: “সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী : মিলন, অংশগ্রহণ ও মিশনকর্ম”।

আসন্ন বিশপ সিনডের প্রস্তুতি স্বরূপ বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নোক্ত তিন বছরের একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে:

১ ॥ অক্টোবর ২০২১ : বিশপ সিনড উদ্বোধন

ঃ পোপ মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধন: ৯-১০ অক্টোবর, ২০২১

ঃ স্থানীয় মণ্ডলী/ডাইয়োসিসে উদ্বোধন: ১৭ অক্টোবর, ২০২১

২ ॥ অক্টোবর ২০২১ – এপ্রিল ২০২২ : স্থানীয় মণ্ডলীতে সিনড-প্রক্রিয়া

(১) দেশের ডাইয়োসিস পর্যায়: (প্রস্তুতিমূলক প্রশ্নমালার সাহায্যে) জনগণের সঙ্গে অধিবেশন, অবধারণ (পরস্পরের মতামত শ্রবণ ও পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ) ও প্রতিবেদন।

(২) দেশের বিশপ সম্মিলনী পর্যায়: দেশের বিশপগণ ও নির্ধারিত ব্যক্তিদের সঙ্গে অধিবেশন, অবধারণ (পরস্পরের মতামত শ্রবণ ও পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ) ও প্রতিবেদন।

(৩) মহাদেশীয় বিশপ-সম্মিলনী জোট পর্যায়: (আলোচ্য বিষয়বস্তু সংক্রান্ত দলিলের সাহায্যে) নির্ধারিত বিশপ ও সদস্যবৃন্দের অধিবেশন, অবধারণ (পরস্পরের মতামত শ্রবণ ও পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ) ও প্রতিবেদন।

৩ ॥ অক্টোবর-২০২৩: বিশ্বজনীন মণ্ডলী পর্যায় : বিশ্বজনীন মণ্ডলীর বিশপ-সিনড

সিনড প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়: জনগণ, বিশপগণ (বিভিন্ন পর্যায়ের মণ্ডলী) এবং পোপের সকল দপ্তরের মধ্যে আলোচনা-অধিবেশন; বিশপগণ “পিতরের-সঙ্গে ও পিতরের-অধীনে” পোপের সঙ্গে অবধারণ করবেন (পরস্পরের মতামত শ্রবণ ও পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ); এবং মণ্ডলীর প্রধান পোপের নিকট সিনড প্রক্রিয়ার ফলাফল (প্রতিবেদন) প্রেরণ করবেন; পবিত্র আত্মায় অবধারণ পূর্বক পোপ মহোদয় মণ্ডলীর শিক্ষা প্রকাশ করবেন।

॥ খ ॥ সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী সম্বন্ধে পাপ ফ্রান্সিসের ধারণা

বিশপ-সিনড স্থাপনের ৫০ বছরের পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রদত্ত পুণ্যাপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বক্তব্য-এর ভাবাদর্শ অনুসারে রচিত, ভাটিকান, ১৭ অক্টোবর, ২০১৫।

(ক) বিশপ-সিনড প্রতিষ্ঠার পঞ্চদশ বর্ষ পূর্তির অভিজ্ঞতা

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পর থেকে মণ্ডলী সিনডের মধ্য দিয়ে ‘একসঙ্গে পথচলা’-র আবশ্যিকতা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করে আসছে। দ্বিতীয় মহাসভার পঞ্চদশ বর্ষ পূর্তিতে মণ্ডলী আনন্দিত, প্রভুর প্রশংসা করে এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানায়।

পোপ ফ্রান্সিস রোমের বিশপ নিয়োগের সূচনা থেকে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার মূল্যবান ঐতিহ্য, এই সিনড ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর পূর্বসূরী পোপ যষ্ট পল, পাপ দ্বিতীয় জন পল এবং পোপ বেনেডিক্ট মহোদয়গণ সিনডের গুরুত্ব অনুভব করেছেন ও তার উন্নতিকল্পে নিজস্ব অবদান রেখে গেছেন এবং মণ্ডলীর আইন-সংহতিতে স্থান দিয়েছেন।

সেই একই পথ ধরে মণ্ডলীকে চলতে হবে। যে বিশ্বে মণ্ডলী বাস করছে, অনেক বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও, সেখানেই ভালবাসতে ও সেবা করতে মণ্ডলী আহূত; এবং মণ্ডলীর সকল মিশনকর্মে সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করা আবশ্যিক। তৃতীয় সহস্রাব্দীতে ঈশ্বর চান যেন মণ্ডলী ‘একসঙ্গে চলা’র পথ অনুসরণ করে।

(খ) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর ভিত্তি

প্রভু মণ্ডলীর কাছ থেকে কী আশা করেন তা ‘সিনড’ শব্দের মধ্যে নিহিত আছে: মণ্ডলীর ভক্তজনগণ, পালক ও রোমের বিশপ একসঙ্গে যাত্রা করবে। ধারণাটা কথায় বেশ স্পষ্ট কিন্তু কাজে পরিণত করা ততো সহজ নয়।

খ্রিস্টে দীক্ষিত ব্যক্তির সকলে হয়ে উঠেছে “আধ্যাত্মিক মন্দির ও পবিত্র যাজকসমাজ” (২য় ভা. মহাসভা, খ্রিস্টমণ্ডলী, ১০)। “পবিত্রজনের পরম অভিষেকের গুণে বিশ্বাসীবর্গ সকলে একসাথে ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে ভুল করতে পারে না (দৃ: ১ম যোহন ২:২০, ২৭)। এই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে গোটা বিশ্বাসীবর্গের অলৌকিক বিশ্বাসবোধে, যখন ‘ধর্মপাল থেকে আরম্ভ করে ভক্তজনগণ পর্যন্ত সকলেই’ বিশ্বাস ও নৈতিকতার বিষয়ে সর্বজনীন মত প্রকাশ করেন” (২য় ভা. মহাসভা, খ্রিস্টমণ্ডলী, ১২)। এখান থেকে বিশ্বাসের অদ্রাস্ততা।

‘মঙ্গলবার্তার আনন্দ’ শীর্ষক ঐতিহাসিক ধর্মোপদেশে পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, দীক্ষান্নানে “অভিষেকের গুণেই ঈশ্বরের জনগণ পবিত্র হয়ে উঠেছে, আবার এ কারণেই সে বিশ্বাসে অদ্রাস্ত” (মঙ্গলবার্তা, অনু. ১১৯)। তিনি আরও বলেন, ‘সকল দীক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ – মণ্ডলীতে তাদের অবস্থান যা-ই হোক না কেন, অথবা বিশ্বাস সম্বন্ধে তাদের শিক্ষার স্তর বা মাত্রা যা-ই হোক না কেন – তারা সবাই মঙ্গলবার্তা প্রচারক। সুতরাং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভক্তবিশ্বাসীদেরকে নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা হিসেবে বিবেচনা করে, শুধু পেশাদার কর্মীদের দ্বারা খ্রিস্টাদর্শ প্রচারের পরিকল্পনা নিছক অর্বাচীনতার পরিচায়ক” (মঙ্গলবার্তা, অনু. ১২০)।

একই ভাবনা অনুসরণ ক’রে ‘পরিবার বিষয়ক’ বিশপ সিনড আয়োজিত হয়েছিল। প্রস্তুতি পর্বে দু’ধরনের প্রশ্নমালা দেওয়া হয়েছিল যাতে যারা পারিবারিক জীবনে আছে তারাও যেন তাদের দুঃখ-কষ্ট ও আশা-আনন্দ প্রকাশ করতে পারে। পারিবারিক জীবনে যারা আছে তাদের কথা না শুনে কী করে বিশপ সিনড অনুষ্ঠিত পারে?

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হচ্ছে এমন মণ্ডলী যে ‘শ্রবণ’ করে। কেবলমাত্র ‘কথা শ্রবণ’ নয়; বরং পরস্পরের মতামত শ্রবণ করা যেখানে প্রত্যেকেই কিছু শেখার আছে। বিশ্বাসী জনগণ, বিশপ-সম্মিলনী, রোমের বিশপ – প্রত্যেকেই পরস্পরকে শ্রবণ করবে, পবিত্র আত্মাকে শ্রবণ করবে, যিনি হচ্ছেন ‘সত্যের আত্মা’ (যোহন ১৪:১৭); পবিত্র আত্মা ‘মণ্ডলীর কাছে কী বলেন’ তা তারা শ্রবণ করবে।

বিশপ সিনড হচ্ছে সকল শ্রবণ-প্রক্রিয়ার লক্ষ্য, যে-প্রক্রিয়া মণ্ডলীর বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সিনড-প্রক্রিয়া শুরু হয় ঈশ্বর জনগণের কথা শ্রবণ করার মধ্য দিয়ে, কেননা তাদের কথা “খ্রিস্টের প্রাবক্তিক দায়িত্বেরই অংশবিশেষ”। এই প্রক্রিয়া চলমান থাকে পরবর্তীতে পালকদের কথা শ্রবণ করার মধ্যে। সিনড পিতৃগণের মাধ্যমে বিশপগণ, সাম্প্রতিক অনেক জনমত পরিবর্তনের সময়ে, অতি যত্নের সাথে সবকিছু যাচাই করে দেখেন, যাতে বিশ্বাসের খাঁটিত্ব রক্ষা পায়, সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া হয় এবং সেই বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয়া হয়। সিনড প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় যখন গোটা মণ্ডলী রোমের বিশপের কথা শ্রবণ করে, কারণ তিনি সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পালক ও শিক্ষক। তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে নয়, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছা, খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার এবং মণ্ডলীর শিক্ষা পরম্পরার প্রতি অনুগত থেকে তিনি পালন ও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সিনড সর্বদাই ‘পোপের সঙ্গে’ ও ‘পোপের অধীনে’ কাজ করে। আর এটাই মণ্ডলীর ঐক্য নিশ্চিত করে।

(গ) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে যাজক-কর্তৃপক্ষ

‘একসঙ্গে পথচলা’ মণ্ডলীর স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য। এ প্রেক্ষাপটেই মণ্ডলীর যাজক-কর্তৃপক্ষের সেবাকাজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাধু জন খ্রিসোস্তম বলেছেন “মণ্ডলী আর সিনড সমার্থক”। মণ্ডলী ঈশ্বরের মেসপাল, যারা এই জগতে ‘একসঙ্গে পথ চলে’ যাতে প্রভু যিশুর সাথে সাক্ষাৎ পেতে পারে। মণ্ডলীর মধ্যে কেউ “উচ্ছে” থাকবে তাতো নয়; বরং প্রত্যেকেই ‘নিম্নে’ নামতে হবে ভাইবোনের সেবা করার জন্য।

যিশু দ্বাদশ প্রেরিতদূতদের সংঘটিকে মণ্ডলীর প্রধান রূপে স্থাপন করেছেন, যেখানে পিতর হচ্ছেন ‘পাথর’, যিনি তাঁর ভ্রাতাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে রাখেন। পিরামিড-সদৃশ মণ্ডলীতে প্রেরিতদূতদের স্থান উপরে নয় বরং তার স্থান নিম্ন-ভিত্তিতে, যেখান থেকে তারা সেবা করেন। সবার কারণেই প্রত্যেক বিশপ, তার দায়িত্বে ন্যস্ত জনগণের ‘খ্রিস্টের ভিকার’, হয়ে উঠেন, অর্থাৎ সেই যিশুর ভিকার যিনি শেষভোজে নত হয়ে প্রেরিতদূতদের পা ধুইয়ে দিয়েছেন। একই ধারণায় পিতরের উত্তরাধিকারী “ঈশ্বরের দাসানুদাস” ছাড়া আর কিছু নন।

একটা বিষয় যেন ভুলে না যাই! যিশুর শিষ্য হিসেবে অতীতে, বর্তমানে এবং সর্বদা আমাদের একমাত্র কর্তৃত্ব হচ্ছে সেবার কর্তৃত্ব; আমাদের ক্ষমতা ক্রুশের ক্ষমতা।

আমাদের শিক্ষাগুরু যিশু বলেছেন: “তোমরা তো জানোই, বিজাতীয়দের শাসকেরা নিজেদের প্রজাদের ওপর প্রভুত্ব চালায়। তাদের মধ্যে যারা বড়ো, তারাও অন্যের ওপরে কর্তৃত্ব ফলায়। আমাদের মধ্যে যে বড় হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের সেবক, এবং তোমাদের মধ্যে যে প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের দাস” (মথি ২০:২৫-২৭)। তোমাদের মধ্যে যেন এমনটি না হয়: এখানেই মণ্ডলীর রহস্যের প্রাণ খুঁজে পাই এবং এখান থেকেই কর্তৃপক্ষের সেবার আসল অর্থ বুঝতে পারি।

(ঘ) মণ্ডলীতে সিনডের স্তর-বিদ্যুৎ

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে বিশপ সিনড হচ্ছে মণ্ডলীর মিলনের গতিধারার প্রকাশ; বিশপ সিনড মাণ্ডলিক সকল সিদ্ধান্তের প্রেরণা-উৎস।

মণ্ডলীতে ‘একসঙ্গে পথচলা’র প্রথম স্তর হচ্ছে নির্দিষ্ট মণ্ডলী বা ডাইয়োসিস। ডাইয়োসিসের সিনড হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠান যেখানে ডাইয়োসিসের যাজক ও ভক্তজনগণ বিশপের সঙ্গে মণ্ডলীর সার্বিক কল্যাণে সহযোগিতা করে থাকে। ধর্মপ্রদেশীয় মণ্ডলীতে রয়েছে অনেকগুলো “মিলন সংগঠন”, যেমন: ধর্মপ্রদেশীয় যাজক পরিষদ, মন্ত্রণা পরিষদ, উচ্চপদস্থ যাজক-পরিষদ, পালকীয় পরিষদ। এই সমস্ত সংগঠন যখন ভিত্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং তৃণমূলের জনগণের ও তাদের প্রতিদিনের সমস্যা থেকে সবকিছুর সূত্রপাত হয়, তখনই মণ্ডলীর সিনড-প্রক্রিয়া শুরু হয়। এখানেই শ্রবণ ও সহভাগিতার আরম্ভ।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে দেশীয়/জাতীয়/আঞ্চলিক মণ্ডলী, বিশেষ ভাবে বিশপ সম্মিলনী ও তাদের জোট। বিশপ সম্মিলনীতে কী করে বিশপদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা আরও বৃদ্ধি করা যায়, তা অনেক জায়গায় এখনও আলোচনা ও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে স্থানীয় বিশপদের পরিবর্তে, পাপকে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে বিকেন্দ্রীকরণের অনেক সুযোগ রয়েছে বলে পোপ ফ্রান্সিস মনে করেন।

সর্বশেষ স্তর হচ্ছে বিশ্বজনীন মণ্ডলী। এই স্তরে বিশপ-সিনড বিশপদের মধ্যে সংঘবদ্ধতার প্রকাশ ঘটে, কননা কাথলিক বিশপদের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই বিশপ-সিনড গঠিত। এই অবকাঠামোতে বিশপদের সংঘবদ্ধতা এবং মণ্ডলীর সিনড-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এই ব্যবস্থায় মণ্ডলী একদিকে “কার্যকরী” আবার অন্যদিকে “ফলপ্রসূ” হয়ে ওঠে। কারণ ঈশ্বর-জনগণের ভাবনা নিয়ে বিশপগণ নিজেদের মধ্যে এবং পোপের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন।

(ঙ) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে মাণ্ডলিক ঐক্য

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী গড়ে তোলার জন্য মিশনকাজে, প্রভুর দ্বারা ন্যস্ত নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে, আমরা সবাই আহ্বান পেয়েছি। এই ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য-নিষ্ঠা মণ্ডলীর

সর্বজননীতা অর্জনে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পোপ মহোদয় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, মণ্ডলীর জীবনে সিনড নীতি কীভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং কীভাবে পোপ সবার ওপরে সভাপতিত্ব করবেন তার সঠিক ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করবে বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্য।

পোপ মহোদয় বলেন যে, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে “পোপের আধিপত্য” কীরূপ হবে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পোপ, নিজের ক্ষমতা বলে, মণ্ডলীর উর্ধ্বে নয়। তিনি মণ্ডলীর অভ্যন্তরে অবস্থান করেন: দীক্ষিত ভক্তদের সঙ্গে তিনিও একজন, বিশপদের সঙ্গে তিনি সংঘভুক্ত, বিশপদের মধ্যে তিনি একজন বিশপ। আবার একই সময়ে পিতরের উত্তরাধিকারী রূপে, রোমের মণ্ডলীকে পরিচালন করতে তিনি আহূত, কননা রোমের মণ্ডলী সকল মণ্ডলীর উপর ভালবাসায় সভাপতিত্ব করে।

পোপ ফ্রান্সিস পুনরায় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন য, “পোপের আধিপত্য” বিষয়টির মধ্যে একটা পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তাঁর পূর্বসূরী পোপ দ্বিতীয় জন পলের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে, অনেক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য একটা প্রত্যাশা সব সময় ব্যক্ত করা হচ্ছে। রোমের বিশপ হিসেবে সেই প্রত্যাশার প্রতি মনোযোগী হওয়া রোমের বিশপের একটা দায়িত্ব। এ ব্যাপারে, রোমের বিশপের নিকট বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অনুরোধ আসে। রোমের বিশপের মিশন অক্ষুণ্ন রখে “পোপের আধিপত্য” কী ভাবে অনুশীলন করা হবে সে বিষয়ে আলোচনার জন্য উদারতা প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন।

(চ) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী মানবজাতির জন্য একটি নিদর্শন

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী সমস্ত জাতিগণের মধ্যে একটা আদর্শ সৃষ্টি করবে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। বর্তমান জগতের মানুষ যখন আরও অংশগ্রহণ, সংহতি এবং জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা আশা করে, তখন মানবজাতি আর কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে, ক্ষুদ্র ও ক্ষমতাপ্রিয় কয়েকটি দলের নিকট জিম্মি হয়ে যায়। “একসঙ্গে পথচলা”র মধ্য দিয়ে মণ্ডলী এমন এক স্বপ্ন দেখছে যেখানে মণ্ডলী, ইতিহাসের দুঃখ-কষ্টভোগী নারী-পুরুষের সহভাগী হয়ে, জনগণের অলঙ্ঘনীয় মর্যাদা পুনঃআবিষ্কার করার জন্য এবং কর্তৃপক্ষকে সেবামুখী করার জন্য নাগরিক সমাজকে সাহায্য করবে, ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হবে এবং সেই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরও সুন্দর এবং মানবিক জগৎ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

॥ গ ॥ বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সিনড-প্রক্রিয়ার সমীক্ষণ

নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি যে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ভাব, শিক্ষা ও নির্দেশনা তিনটি প্রধান পর্যায়ের মণ্ডলী, যেমন: বাংলাদেশের ডাইয়োসিসগুলো,

বাংলাদেশের বিশপ সম্মিলনী এবং এশীয় বিশপ মণ্ডলীর জোট, প্রভূত ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ভাবধারা বাংলাদেশ মণ্ডলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে এবং তা রক্ষা, ধারণ ও প্রবাহমান করার জন্য যথোপযুক্ত সাংগঠনিক অবকাঠামো গড়ে উঠেছে।

ডাইয়েসিস ও বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীর সাংগঠনিক অবকাঠামোগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হল। এই তালিকায় যা উল্লেখ রয়েছে তা যে একটি নির্দিষ্ট ডাইয়েসিসে সবগুলো একেবারে নেই, তা বলা যাবে না; আবার সব সাংগঠনিক অবকাঠামোগুলো প্রত্যেক ডাইয়েসিসে বিদ্যমান আছে, তা-ও বলা যাবে না। প্রতিটি ডাইয়েসিসের আপন আপন নিজস্বতা অনুসারে সাংগঠনিক অবকাঠামোগুলো গড়ে উঠেছে। আবার বিদ্যমান সাংগঠনিক অবকাঠামোগুলো যে শতকরা একশত ভাগ সক্রিয় তা-ও বলা যাবে না। তবে এই তালিকা সিনড-প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত বহন করছে, সম্ভাবনা উন্মুক্ত করছে ও অনুসরণের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করছে।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে “একসঙ্গে পথচলা”। বিশপ তার যাজক, ভক্তজনগণ, ও উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী একত্র হয়ে “একসঙ্গে পথ চলবেন”। বিশপ অন্য বিশপদের সঙ্গে একসঙ্গে পথ চলবেন, এবং বিশপগণ পোপ মহোদয়ের সঙ্গে একসঙ্গে পথ চলবেন। ডাইয়েসিসে ও বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীতে একসঙ্গে পথচলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মণ্ডলীর মিশন সম্পন্ন করা যা সকল দীক্ষিত ব্যক্তির নিকট অর্পণ করা হয়েছে। মিশন সম্পাদনের জন্য পরস্পরের কথা শ্রবণ করা এবং পবিত্র আত্মার কথা শ্রবণ করা যাতে তাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা অবধারণ করা যেতে পারে। স্থানীয় মণ্ডলীতে উদ্ভাবিত সাংগঠনিক অবকাঠামোগুলো পরস্পরের কথা শ্রবণ করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। অতএব দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা থেকে আগত “একসঙ্গে পথচলা”র প্রক্রিয়ায় অনেক অর্জনের জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলী অনেক গর্ব করতে পারে এবং তার জন্য প্রভুর প্রশংসা করতে পারে।

১৯ ডাইয়েসিস পর্যায়ে সিনড-তুল্য সাংগঠনিক কাঠামো

(ক) ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ পর্যায়

ভৌগোলিক: ব্লক/ওয়ার্ড/পাড়া/গ্রাম/মহল্লা

খ্রিস্টান সংগঠনসমূহ

(খ) ধর্মপল্লী পর্যায়:

যাজক/পালক ও পালকীয় পরিষদ

পালকীয় উপ-পরিষদ ও কমিটিসমূহ

সংগঠন: সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংঘ, সমিতি, আন্দোলন সমূহ

ধর্মপল্লীর পালকীয় অধিবেশন (নিয়মিত/অনিয়মিত)

(গ) আঞ্চলিক/ভিকারিয়েট পর্যায়ে সিনড-তুল্য সাংগঠনিক কাঠামো
আঞ্চলিক/ভিকারিয়েট পর্যায়ে পালকীয় পরিষদ
আঞ্চলিক/ভিকারিয়েট পর্যায়ে সাব-কমিটি ও অন্যান্য সংগঠন
আঞ্চলিক/ ভিকারিয়েট পালকীয় অধিবেশন (নিয়মিত/অনিয়মিত)

(ঘ) ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে সিনড-তুল্য সাংগঠনিক কাঠামো
ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় পরিষদ (ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী, যাজক/বিশপ)
ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় অধিবেশন/সম্মেলন (ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী, যাজক/বিশপ)
ধর্মপ্রদেশীয় সমাবেশ (যাজক ও ভক্তজনগণ)
ধর্মপ্রদেশীয় সমাবেশ (যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী)
ধর্মপ্রদেশে কর্মরত যাজক-সভা (যাজক)
ধর্মপ্রদেশীয় যাজক-সভা (যাজক)
ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় কমিশনসমূহ/কমিটিসমূহ ও সমন্বয় কমিটি
ধর্মপ্রদেশীয় মন্ত্রণা পরিষদ (যাজক)
ধর্মপ্রদেশীয় অর্থবিষয়ক কমিটি (যাজক ও ভক্তজনগণ)
ধর্মপ্রদেশীয় নির্মাণ ও সংস্কার কমিটি (যাজক ও ভক্তজনগণ)
ধর্মপ্রদেশীয় সংগঠন, সংঘ, সংস্থা, সমিতি, আন্দোলন (ভক্তজনগণ)

২৥ দেশীয় বিশপ সম্মিলনী পর্যায়ে সিনড-তুল্য সাংগঠনিক কাঠামো
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর কমিশনসমূহ ও সংগঠনসমূহ
বিশপ সম্মিলনীর জাতীয় কর্মশালা ও পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর কমিশন ও সংগঠন সমূহের বার্ষিক সভা
আন্তঃধর্মপ্রদেশীয় সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংঘ, সংস্থা।
সিবিসিবি-কমিশনেরই জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্মসূচি

৩৥ মহাদেশীয় বিশপ সম্মিলনী পর্যায়ে সিনড-তুল্য সাংগঠনিক কাঠামো
এশীয় বিশপ সম্মিলনীর জোট (এফ.এ.বি.সি.)
এফ.এ.বি.সি কেন্দ্রীয় কমিটি
এফ.এ.বি.সি সাধারণ অধিবেশন
এফ.এ.বি.সি – অফিসসমূহ

॥ ঘ ॥ বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সিনড-প্রক্রিয়া উন্নয়নে করণীয়

ইতোমধ্যে স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে সিনড-প্রক্রিয়া চলমান আছে এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামোও গড়ে উঠেছে। তথাপি স্থানীয় মণ্ডলীকে পোপ মহোদয়ের ধারণা ও নির্দেশনা অনুসারে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী রূপে আরও যোগ্যভাবে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর আরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলো ধর্মপ্রদেশ ও দেশের স্থানীয় মণ্ডলীর সাংগঠনিক কাঠামোগুলোকে আরও সক্রিয়, প্রাণবন্ত ও অর্থপূর্ণ করবে এবং স্থানীয় মণ্ডলী হয়ে উঠবে মিলনসমাজ, অংশগ্রহণমূলক ও মিশনকর্মমুখী।

- (১) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী সম্বন্ধে পোপ মহোদয়ের ধারণা ও পোপের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে প্রেরিত সকল নির্দেশনা গুরুত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন করা এবং সম্পৃক্ত সকলে এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং অন্যকে অবগত করা।
- (২) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর ভিত্তির উপর আরও গুরুত্ব দেয়া। সেই ভিত্তি হচ্ছে খ্রিস্টীয় জীবনের মর্যাদা ও অধিকার। প্রত্যেক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি খ্রিস্টের কাছ থেকে ধর্মময়তার যাজকীয় দায়িত্ব, শিক্ষা-সাক্ষ্যদানের প্রাবৃত্তিক দায়িত্ব এবং ঐশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালনার সেবা-দায়িত্ব লাভ করেছে। সিনড প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ভিত্তি আরও শক্ত, সক্রিয় ও সম্প্রসারিত হবে।
- (৩) জনগণের জীবনাবস্থা অনুসারে বিশপ/যাজক ও জনগণ একসঙ্গে পরস্পরের কথা শ্রবণ করবে এবং পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট জীবন-অবস্থায়, পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর কাছ থেকে কী চায়, তা একসঙ্গে শুনবে ও যাচাই করবে।
- (৪) মণ্ডলীর “যাজক-কর্তৃপক্ষ”, যিশুর সেবার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মিলন, অংশগ্রহণ ও মিশন-কর্ম সম্পাদনের নীতি অনুসরণ করে, ঈশ্বর-জনগণের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করবেন। পদ, কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার কারণে নয় বরং সেবা করার উদ্দেশ্যে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষকে নিয়োজিত করবেন।
- (৫) ধর্মপ্রদেশের পবিত্রীকরণ, শিক্ষাদান ও পরিচালনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য একসঙ্গে অবধারণ পূর্বক ঈশ্বর-জনগণকে সম্পৃক্ত করা। বিশেষ উদ্দেশ্যে আহূত ডাইয়েসিসের সিনড, অথবা নিয়মিত ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় পরিষদ একটি উপযুক্ত অবকাঠামো হিসেবে কাজ করতে পারে।
- (৬) আপন ধর্মপ্রদেশে যাজক ও ঈশ্বর-জনগণের সঙ্গে এবং বিশপ-সম্মিলনীতে পরস্পর বিশপগণের মধ্যে এবং রোমের বিশপের সঙ্গে বিশপদের সংঘবদ্ধতা আরও জোরদার করা।

- (৭) বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে আয়োজিত নির্দিষ্ট বিশপ-সিনড প্রস্তুতিতে, সংশ্লিষ্ট পোপের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসারে “প্রস্তুতিমূলক প্রশ্নমালা”-র সহায়তায় মতামত ব্যক্ত করা এবং তার ফলাফল সঠিক সময়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতঃ বিশপ সিনডে অংশগ্রহণ করা ধর্মপ্রদেশ ও দেশের বিশপ সম্মিলনীর দায়িত্ব। (২০২৩ খ্রিস্টাব্দে আয়োজিত বিশপ-সিনডের ২৬ তম অধিবেশনের নির্দেশিকা দেখুন)।
- (৮) বিশ্বজনীন বিশপ সিনড-এর সমাপ্তিতে পোপ মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত মণ্ডলীর শিক্ষা সম্বলিত “প্রেরিতিক প্রেরণাপত্র” ধর্মপ্রদেশের ঐশ জনগণের নিকট ও বিশপ সম্মিলনীর সকল অঙ্গ-সংগঠনের নিকট পৌঁছে দেওয়া। তাতে পোপ মহোদয়ের শিক্ষা সবার কাছে অবগত হবে। এভাবে যে-বিষয়ে তারা মতামত ব্যক্ত করেছেন সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শিক্ষা তারা লাভ করতে পারবেন এবং পোপ মহোদয়ের সাথে বিশ্বাস ও নৈতিকতার বিষয়ে ঐক্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

Sources:

1. Pope Francis, Address of His Holiness, Ceremony Commemorating the 50th Anniversary of the Institution of the Synod of Bishops, October 17, 2015.
2. Mario Card. Grech, General Secretary, Synodus Episcoporum, “For a synodal Church: communion, participation and mission”, 21 May, 2021.
3. Massimo Faggioli, The Synodal Process 2021-2023, La Croix International, May 24, 2021.

রচনা- ২: সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী :

সিনড প্রস্তুতি ও সিনড-অধিবেশন

বিগত ২০২১ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে বিশ্বজনীন মণ্ডলী ও স্থানীয় মণ্ডলীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সিনড বা একসঙ্গে পথচলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আজ কুড়ি মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। কারো কারো মনে প্রশ্ন – সিনড বিষয়ে আমরা বর্তমানে কোথায় আছি?

প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে একটি ধারণা আর সেটা হল সিনড – ‘একসঙ্গে পথচলা’ একটা প্রক্রিয়া। এটি চলমান। যাত্রাকালে বিশেষ কয়েকটি মাইলফলক নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করা যেতে পারে, কিন্তু খ্রিস্টমণ্ডলীর পথচলা একটি যাত্রাস্বরূপ যা সর্বদাই চলমান।

দ্বিতীয়ত, সিনড মণ্ডলী বর্তমানে কোথায় আছে তার উত্তরে আমাকে অবশ্যই প্রথমে বলতে হবে আমি কোথায় আছি? এর মানে হচ্ছে আমি যে মণ্ডলীতে সহযাত্রা করছি, আমি কোথায় আছি? আহ্বান পেয়েছি মিলন-সমাজ করতে, অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলী গড়ে তুলতে এবং মণ্ডলীর মিশন সম্পন্ন করতে। এই সময়ে পবিত্র আত্মা আমাকে কী বলেন? আমি পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর কীভাবে শুনতে পাচ্ছি? পবিত্র আত্মা আমাকে কী শুনতে, কী বলতে, কী করতে অনুপ্রাণিত করছেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বর্তমানে আমি এই সিনড প্রক্রিয়ায় কোথায় আছি?

তৃতীয়ত, যাকে আমরা খ্রিস্টমণ্ডলী বলি সেটা আকাশে-বাতাসে থাকছে না, কল্পিত কিছু নয় বরং বিভিন্ন পর্যায়ে তার অবস্থান রয়েছে। একই মণ্ডলী বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে: পরিবার বা গৃহ-মণ্ডলী, ক্ষুদ্র সমাজ মণ্ডলী, ধর্মপল্লীর মণ্ডলী, ধর্মপ্রদেশীয় মণ্ডলী, আঞ্চলিক বা দেশীয় মণ্ডলী, মহাদেশীয় মণ্ডলী এবং বিশ্বজনীন মণ্ডলী। প্রতিটি পর্যায়ের মণ্ডলী সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হয়ে পথ চলবে; সীমিত একটি সময়ের জন্য নয়, কিন্তু সর্বসময়ে, সর্বস্থানে ও সর্বপরিস্থিতিতে পবিত্র আত্মার কথা শ্রবণের মাধ্যমে মিলন-সমাজ হবে, সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে, মঙ্গলবার্তা ঘোষণার মিশন সম্পন্ন করার জন্য একসঙ্গে পথ চলবে। সুতরাং প্রত্যেক পর্যায়ের মণ্ডলীকে প্রশ্ন করতে হবে এবং তার উত্তর দিতে হবে সিনড-প্রক্রিয়ায় আমরা কোথায় আছি?

বিশ্বজনীন মণ্ডলীর সিনড অধিবেশন

প্রাথমিক পরিকল্পনায় কাথলিক মণ্ডলীর প্রচলিত “বিশ্ব বিশপ সিনড”-এর চূড়ান্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। কিন্তু যেহেতু বিশ্ব-বিশপ সিনড-এর মূল আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছিল “সিনড-বিশিষ্ট

মণ্ডলী” যার জন্য অধিক সময়ের প্রয়োজন ছিল, সেহেতু এখন বিশ্বজনীন সিনড রোমে অনুষ্ঠিত হবে দু’টি অধিবেশনে – প্রথম অধিবেশন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে এবং দ্বিতীয় অধিবেশনটি হবে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে।

এ প্রসঙ্গে একটা বিষয়ে উল্লেখ করা যথার্থ বলে মনে করি। পূর্বের প্রচলিত কাথলিক মণ্ডলীর “বিশ্ববিশপ সিনড”-এর অফিসিয়াল সদস্য ছিলেন মাত্র বিশপগণ এবং প্রাচীন কয়েকটি ধর্মসংঘের যাজক-ধর্মাধ্যক্ষ (প্রায় ১০ জন)। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় আসছে সিনড-এর পূর্ণ সদস্য হিসেবে আরও ৭০ জনকে নিয়োগ দেবেন যাদের মধ্যে থাকবেন পুরুষ ও নারী ধর্মসংঘের ১০ জন প্রধান, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের প্রতিনিধি এবং অধিকাংশ পুরুষ ও নারী ভক্তজনগণ। এই সিদ্ধান্ত সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীরই ধারাবাহিকতার স্বীকৃতি, প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি এবং ভবিষ্যৎ মণ্ডলীর ইঙ্গিত।

সিনড-এর কার্য প্রণালী

আগামী সিনড-এর দুটো অধিবেশন কোন্ বাস্তব অবস্থার নিরিখে অনুষ্ঠিত হবে, কী বিষয়ে আলোচনা করা হবে এবং কী প্রক্রিয়ায় সেই আলোচনা চলবে সেই বিষয়ে একটি “বিশ্ববিশপ সিনড” মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষ একটি “কার্য-প্রণালী” (বা ইনস্ট্রুমেন্টম লাবোরিস) প্রস্তুত করেছেন এবং ২০ জুন, ২০২৩ খ্রি. তা অনলাইনে সবার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। (<https://www.synod.va/en/synodal-process/the-universal-phase.html>)

নিম্নে বিশ্বজনীন সিনডের প্রথম অধিবেশনের জন্য যে কার্য প্রণালী প্রকাশ করা হয়েছে তারই একটি সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হল।

কার্য প্রণালীতে প্রেরণাবাগী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত শাস্ত্রবাণী: “সমস্ত নিষ্ঠতা, সমস্ত আশ্বাসের উৎস স্বয়ং পরমেশ্বর তোমাদের এই বর প্রদান করুন, খ্রিস্টযিগুর আদর্শ অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একপ্রাণ হতে পার, আর এই ভাবে একই মনোভাব নিয়ে তোমরা যেন মিলিত কর্তে আমাদের প্রভু যিগুখ্রিস্টের ঈশ্বর ও পিতার মহিমা কীর্তন করতে পারো।” (রোমীয় ১৫:৫-৬)

সিনড প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপের অর্জন

বিগত ২০২১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর থেকে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় গোটা মণ্ডলীকে “সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী” বিষয়ক মূলভাবসহ সিনড আহ্বান করেছেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা পথ চলেছি। আমাদের জন্য যে নির্দেশনা ছিল তা হল: “একসঙ্গে পথচলার যাত্রা মণ্ডলীর বিভিন্ন পর্যায়ে – স্থানীয় থেকে সর্বজনীন পর্যায় পর্যন্ত – কীভাবে বর্তমান মণ্ডলীতে চলছে, মণ্ডলীর নিকট ন্যস্ত মঙ্গলবার্তার ঘোষণা করার মিশন কীভাবে

পালন করা হচ্ছে, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হতে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আমরা কী কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে স্থানীয় (ধর্মপ্রদেশীয় ও দেশীয়) মণ্ডলী এবং মহাদেশীয় মণ্ডলীর ধ্যান-প্রার্থনা-পর্যালোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করে সিনড সংক্রান্ত পোপের মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন ডকুমেন্ট বা দলিল প্রেরণ করা হয়। এরই আলোকে সিনড-এর “কার্য প্রণালী” প্রস্তুত করা হয়। এরই মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় সিনড-এর প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে দু’টো সিনড অধিবেশন (২০২৩ এবং ২০২৪)।

- (১) প্রথম ধাপে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা মণ্ডলী বর্তমানে কী পরিস্থিতিতে অবস্থান করছে, তাদের কী উপলব্ধি তা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অন্যের কাছে তা শেয়ার করা হয়েছে। সিনড-এর প্রথম ধাপে এই চিহ্নিত পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বজনীন সিনড-অধিবেশন আরও গভীরভাবে প্রবেশ করবে এবং তারা চিন্তাভাবনা করবে কী করে এই অবস্থায় মণ্ডলী তার মিশনকাজ চালিয়ে যেতে পারে।
- (২) প্রথম ধাপে সবাই একটা আনন্দময় মুহূর্ত উপলব্ধি করেছে আর সে আনন্দ হচ্ছে পরস্পর বিশ্বাসী ভাইবোনের সাথে আন্তরিক সাক্ষাৎ হয়েছে এবং এই সাক্ষাতের মধ্যে প্রভু যে তাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন তারও অভিজ্ঞতা হয়েছে। মণ্ডলীর কাথলিক অর্থাৎ সর্বজনীনতার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হয়েছে, বছর মধ্যে একের অভিজ্ঞতাও উপলব্ধি হয়েছে।
- (৩) মণ্ডলীকে আরও সিনড-বিশিষ্ট হওয়ার জন্য তার আপন পরিচয় ও আহ্বান সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা উপলব্ধি করেছি যে, আমরা পথে আছি, একসঙ্গে পথ চলছি এবং ভবিষ্যতেও চলব। আমরা আরও সচেতন হয়েছি যে, এই পথচলা জগতের শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।
- (৪) সিনড প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপের শেষে, সকল সাধু-সাক্ষী এবং বিশেষভাবে মণ্ডলীর মাতা কুমারী মারীয়ার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যেন সিনড-অধিবেশনে পবিত্র আত্মা যেন আগমন করেন, তার চাইতেও বেশী, আমরা যেন এমন অনুগ্রহ লাভ করতে পারি যাতে সিনডের ফলাফল বিশ্বের প্রতিটি খ্রিস্টান-সমাজের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব করে তুলতে পারি।

বিশ্বজনীন সিনড-অধিবেশনের “কার্য প্রণালী”

- ১) কার্য প্রণালীতে বলা হয়েছে যে, ইতোমধ্যে স্থানীয় মণ্ডলী, মহাদেশীয় সিনড এবং মহাদেশীয় অধিবেশের প্রতিবেদন, প্রভৃতি বিষয়ে অনেক ডকুমেন্ট রয়েছে। যারা সিনডে অংশগ্রহণ করবেন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা অতীতের ডকুমেন্ট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকেন এবং এগুলো যেন তাদের অবধারণের জন্য সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেন। তাছাড়া ভাটিকান থেকে প্রকাশিত অন্যান্য ডকুমেন্ট সম্বন্ধেও অবগত থাকেন।
- ২) অতীতের সকল ডকুমেন্ট অধ্যয়ন করে, ঐশজনগণের কথা শ্রবণ করে, যে-অগ্রাধিকারগুলো বেরিয়ে আসছে তার উল্লেখ কার্য প্রণালীতে করা হয়েছে। কোন বিষয়ে সমর্থন না করে সিনড-অধিবেশনের নিকট প্রশ্ন আকারে তুলে ধরা হয়েছে। সিনড-অধিবেশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আত্মায় অবধারণ করবে, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর বৃদ্ধির জন্য বাস্তব পদক্ষেপ সুপারিশ করে পোপ মহোদয়ের কাছে তা প্রেরণ করা হবে। এই কার্য প্রণালী যদিও মূলত সিনড-যোগদানকারীর জন্য, তথাপি সকলের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে কেবলমাত্র স্বচ্ছতার কারণে নয়, বরং স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলে যেন প্রার্থনা, অনুধ্যান, সিদ্ধান্ত ও নিজস্ব অবদান রাখার জন্য বিষয়বস্তুর ব্যবহার করতে পারেন।
- ৩) সিনডের প্রথম ধাপে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে স্থানীয় মণ্ডলীর চিন্তাধারার ওপর, কারণ সেখানেই রয়েছে ঐশতাত্ত্বিক স্থান ও দীক্ষিতজনের “একসঙ্গে পথচলা”র অভিজ্ঞতা। তবে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন স্থানীয় মণ্ডলী অন্য স্থানীয় মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কোন স্থানীয় মণ্ডলী বিশেষ ভাবে রোমের মণ্ডলী থেকে পৃথক অবস্থানে থাকতে পারে না, কেননা তার প্রধান হচ্ছেন পোপ মহোদয়, যার হাতে ন্যস্ত হয়েছে মণ্ডলীর ঐক্যকে অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব এবং যিনি নিজেই বিশ্বজনীন মণ্ডলীকে সিনডে আহ্বান করেছেন।
- ৪) সিনডের কার্য প্রণালীর মধ্যে জোর দেয়া হয়েছে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় নির্ধারিত মণ্ডলীর ভিশন-এর ওপর, যা সবাইকেই গ্রহণ করতে হবে, যা স্থানীয়ত্ব ও সর্বজনীনত্ব উভয়েরই স্বীকৃতি দান করেছে এবং যেখানে গোটা দেহ, মস্তকসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযুক্ত।
- ৫) সিনডের “কার্য প্রণালী” দু’টো ভাগে বিভক্ত: (ক) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী, (খ) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর তিনটি অগ্রাধিকার: মিলন, মিশন ও অংশগ্রহণ।

॥ ক ॥ সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী: ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

“নানা দিব্য দান আছে, তবে যিনি তা দিয়ে থাকেন, সেই পবিত্র আত্মা কিন্তু এক। নানা সেবাকর্মও আছে, তবে যাকে সেবা করা হয়, সেই প্রভু কিন্তু এক। ঐশ আত্মাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রত্যেককে দেওয়া হয় সকলেরই মঙ্গলের জন্য।” (১ করি ১২:৪-৭)

কার্য প্রণালীর প্রথম ভাগে, বিগত দিনের একসঙ্গে পথচলার আলোকে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর পথ চলায় একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে আর তা হল পথচলাকালে পবিত্র আত্মার সঙ্গে সংলাপ।

খ্রিস্টবিশ্বাসী হয়ে প্রভুর সাথে বন্ধন উপলব্ধি করতে, জনগণের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন উপলব্ধি করতে এবং মণ্ডলীকে ভালবাসতে সিনড প্রক্রিয়া এক বিশেষ আনন্দময় সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। উপলব্ধি হয়েছে যে, পবিত্র আত্মাই ছিলেন সিনড-প্রক্রিয়া প্রধান পরিচালক। তাত্ত্বিক আলোচনার স্থলে অনুভব হয়েছে “আপন গভীর” থেকে উদ্ভাবিত কণ্ঠস্বরের সহভাগিতা, কোন নীতি ও সূত্রের আলোচনা নয়, বরং সেখানে ছিল সক্রিয়, শ্রদ্ধাশীল, প্রার্থনাপূর্ণ আলাপ, শ্রবণ ও সংলাপমূলক প্রক্রিয়া।

- (১) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর মূল ভিত্তি হচ্ছে দীক্ষান্নানের মর্যাদা, যা সবার জন্য এক, যার ফলে সকলে ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা, ঐশ পরিবারের সদস্য, খ্রিস্টেতে ভাইবোন, একই আত্মার দ্বারা আচ্ছাদিত এবং একই মিশন সম্পাদনে প্রেরিত। তাই সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হচ্ছে মিলন-সমাজ, যা আবার একই সময়ে মিশন।
- (২) মণ্ডলীর কাঠামো, পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রকাশ ঘটবে যেখানে সকলে তাদের দীক্ষান্নানের মর্যাদা, সহ-দায়িত্ব নিশ্চিত হবে এবং তার অনুশীলন ও চর্চা হবে। কর্তৃপক্ষ পালন করবে সেবার দায়িত্ব।
- (৩) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হচ্ছে শ্রবণকারী মণ্ডলী: আত্মার কথা শুনে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে খ্রিস্টান সমাজের কথা শুনে।
- (৪) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী বিন্দু থাকার বাসনা পোষণ করে, মণ্ডলী জানে যে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং অন্যের কাছ থেকে অনেক কিছু জানার আছে।
- (৫) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে আছে সাক্ষাৎ ও সংলাপ করার বৈশিষ্ট্য; খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য মণ্ডলী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সিনড-বিশিষ্ট আন্তঃমণ্ডলিক সংলাপে নিয়োজিত, কেননা অন্য মণ্ডলীগুলোও একই দীক্ষান্নানের অধিকারী। খাঁটি সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী একই দীক্ষান্নাত

ব্যক্তিদেরকে সম্পৃক্ত করে। সকল প্রকার নির্যাতন ও পরিবেশিক জরুরী অবস্থায় “শহীদমৃত্যু দ্বারা খ্রিস্টীয় ঐক্য” স্থাপনে মণ্ডলী সক্রিয় থাকে।

- (৬) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী অন্য ধর্ম, কৃষ্টি ও সমাজের সাথে “সাক্ষাৎ ও সংলাপের কৃষ্টি” গড়ে তুলতে আহূত। এই মণ্ডলী নিজের মধ্যে থাকা বিভিন্ণতা ও বিচিত্রতা ভয় করে না বরং মূল্য দান করে, সমরূপ হবার কোন চাপ সৃষ্টি করে না। সিনড প্রক্রিয়ায় আমরা শিখতে পেরেছি বছর মধ্যে ঐক্যে বাস করা। সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে “আমি” পরিবর্তে “আমরা” হয়ে উঠি। সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা কাথলিক বা সর্বজনীন হয়ে উঠি।
- (৭) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী সবার প্রতি উন্মুক্ত, সবাইকে গ্রহণ করে এবং সবাইকে আপন করে নেয়। পবিত্র আত্মার কাজের কোন সীমানা নেই। খ্রিস্টধর্মের প্রধান পরিচয় হল সকল মানুষকে নিয়ে, সকল ভাইবোন মানুষের মাঝে, এমন একটি সমাজ নির্মাণ করা যেখানে ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা হয়ে জীবনযাপন করবে, ভালবাসার সত্যকে ধারণ করবে, দান গ্রহণ করে উদার হবে। আমাদের মৌলিক আহ্বান হল সবাই মিলে আকর্ষণীয় ও বাস্তবসম্মত মণ্ডলী নির্মাণ করা, একসঙ্গে করা, যা হবে বহির্মুখী মণ্ডলী যেখানে সবাই সাদরে গৃহীত হবে।
- (৮) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী সত্যিকারে এবং নির্ভয়ে মণ্ডলীকে চ্যালেঞ্জ করে যেন সবাই ভালবাসা ও সত্য – এ দু’য়ের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর ভাবে বুঝতে পারে। সাধু পলের আহ্বান হচ্ছে: “বরং ভালবাসার প্রেরণায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে, আমরা সব দিক দিয়ে আরও নিবিড় ভাবেই খ্রিস্টের অঙ্গ হয়ে উঠব। মস্তকস্বরূপ তিনি; তাঁরই ওপর নির্ভর করে সমগ্র দেহ তার যত গ্রন্থির বাঁধন-শক্তিতে সুসংবদ্ধ সুসংহত হয়ে আছে; তাঁরই উপর নির্ভর করে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারেই সমগ্র দেহটি গড়ে উঠছে আর নিজেকে গেঁথে তুলছে ভালবাসার গাঁথুনিতে।” (এফেসীয় ৪:১৫-১৬)
- (৯) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে সকল প্রকার উদ্ভিগ্নতার দ্বারা নিঃশেষিত না হয়ে সম্মুখপানে পথ চলতে সক্ষম করে। উদ্ভিগ্নতার অভিজ্ঞতা মিলন, মিশন ও অংশগ্রহণ আরও গভীর করতে, তার অর্থ বুঝতে, সেই অনুসারে জীবন-যাপন করতে আমাদের সক্ষম করে। একসঙ্গে পথচলার মধ্যেই নিহিত আছে প্রকৃত পরিবর্তনের সুগম পথ।
- (১০) একসঙ্গে পথ চলা আমাদের জন্য নিয়ে আসে সুস্থ অস্বস্তি ও অসম্পূর্ণতা – এই চেতনায় যে আরও অনেক কিছু আছে যার বোঝা বহন ও ধারণ করতে আমরা অক্ষম (দ্র: যোহন ১৬:১২)। তাড়াহুড়া করে সমস্যার সমাধান করা প্রধান উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা।

(১১) ঐ সমস্ত উদ্ভিগ্নতার সমাধান কারো ব্যক্তির বোঝা নয় বরং সেটা গোটা সমাজের দায়িত্ব। সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী সর্বদাই নিজেকে পরিপুষ্ট করে উপাসনা-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, যা মণ্ডলীর উৎস ও পরিণাম।

(১২) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হচ্ছে “আত্মায় অবধারণ” মূলক মণ্ডলী। “পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী বলেন” (প্রত্যাদেশ ২:৭) তা শুনতে আরও মনোযোগী হই। যার ফলে মণ্ডলী পবিত্র আত্মার শক্তিতে অধিকতর প্রাবৃত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

(১৩) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর ভবিষ্যত পথচলা: “আত্মায় সংলাপ”

- বিগত সিনড প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি বিশেষ বিষয় স্বীকৃতি পেয়েছে আর তা হল: “আত্মায় সংলাপ” বা “সিনড-পদ্ধতি”।
- “আত্মায় সংলাপ” হচ্ছে: আত্মার কথা শোনা ও অন্যদের সাথে একাত্ম হয়ে পারস্পরিকতায় কথা বলা বা সহভাগিতা করা। বলা যায় পবিত্র আত্মাই সেখানে প্রধান পরিচালক। আত্মায় সংলাপে আমরা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় একসঙ্গে একত্রিত হই, আত্মার কথা শ্রবণ করি এবং একসঙ্গে শ্রবণ করি।
- “আত্মায় সংলাপ” করা এমন একটি পদ্ধতি যা সিনড প্রক্রিয়ায় গৃহীত ও “আবিষ্কৃত” হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সাথে অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে এবং আত্মায় অবধারণ করতে, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- “আত্মায় সংলাপ” করা মণ্ডলীতে একটি অতি প্রচলিত ও ঐতিহ্যগত মাণ্ডলিক অবধারণ পদ্ধতি যার ফলে মণ্ডলীতে কর্মপদ্ধতি ও কর্মধারার বিচিত্রতা সৃষ্ট হয়েছে।
- অনেক দৃষ্টান্তের মাঝে মঙ্গলসমাচারে একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে: ইম্মাউসের পথে দুই শিষ্যদের সাথে পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর কথোপকথনের বিবরণ (দ্র: লুক ২৪:১৩-২৫)। ব্যাখ্যায় এটি স্পষ্ট যে, পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে মিলন নির্মাণ করেন, মিশনারি আগ্রহ সৃষ্টি করেন এবং আবার মিলন-সমাজে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।
- “আত্মায় সংলাপ” যেন সমবেত অবধারণের জন্য একটি সহভাগিতামূলক প্রার্থনা। এই পদ্ধতিতে তিনটি ধাপ আছে: (ক) প্রথম ধাপে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রথমে কথা বলে এবং অন্যেরা তা শ্রবণ করে; (খ) দ্বিতীয় ধাপে নিরবতা ও প্রার্থনার মাধ্যমে অন্যের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি সে নিজেকে উন্মুক্ত করে এবং

অন্যের ও আত্মার কথা শুনে তা নিজের অন্তরের কথা জেগে ওঠে এবং তার মধ্যেই পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর প্রকাশ পায়; (গ) তৃতীয় ধাপে আবারও প্রার্থনার পরিবেশে ও আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মূল বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয় এবং সবার সম্মতিতে সমবেত প্রচেষ্টার ফল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

- যখনই আমরা ভালবাসায় অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করি তখন আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে আরও নতুন কিছু জানি।
- “আত্মায় সংলাপ” বিষয়ে গঠনের মধ্যে আছে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে গঠনের ধারা।

॥ খ ॥ তিনটি অগ্রাধিকার: মিলন, মিশন ও অংশগ্রহণ

বিগত দিনের সকল পর্যায়ে সকল আলোচনায় তিনটি অগ্রাধিকার চিহ্নিত হয়েছে। সিনড-অধিবেশনে এই তিনটি অগ্রাধিকারের ওপর আত্মায় অবধারণের জন্য প্রতিটি অগ্রাধিকারের জন্য পাঁচটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে। দলীয় কর্মশালায় এই তিনটি অগ্রাধিকার সম্বন্ধে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হওয়ার উদ্দেশ্যে কীরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তা আলোচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে বিগত দুটো বিশ্ববিশপ সিনড-এর সাধারণ অধিবেশনে আলোচিত বিষয় দুটো বিশেষ গুরুত্ব পাবে: পরিবার (“ভালবাসার আনন্দ”- ২০১৫) এবং যুবসমাজ (“খ্রিস্ট জীবিত”- ২০১৮)।

তিনটি অগ্রাধিকারের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

- মিলন যা আলোকিত করে: আমরা কীভাবে ঈশ্বরের সাথে মিলন এবং মানবসমাজের সাথে ঐক্যের চিহ্ন হতে পারি?
- মিশনকর্মে সহ-দায়িত্ব: কীভাবে আমরা আমাদের গুণাবলি ও কর্তব্যকাজ মঙ্গলসমাজের সেবায় নিয়োজিত করতে পারি?
- অংশগ্রহণ, প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষ: সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে কী সকল প্রক্রিয়া, অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠান থাকবে?

রচনা- ৩ : “সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী” :

সিনডের প্রথম অধিবেশন

ভাটিকানে কাথলিক মণ্ডলীর বহুদিনের প্রতীক্ষিত সিনডের প্রথম অধিবেশন গত ৪ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। এই সিনডের বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণা, মতামত, ভয়-ভীতি-শঙ্কা, অস্পষ্টতা ও সন্দেহ এবং মণ্ডলীর মধ্যে বিভাজন নিয়ে অনেকে অনেক ধারণা পোষণ করেছেন। তাই এ সম্পর্কে কিছু সঠিক তথ্য দেয়া প্রয়োজন বিধায় এই বর্তমান লেখাটির উদ্দেশ্য। এর ফলে আমরাও যেন চিন্তা-ভাবনা ও প্রার্থনা-ধ্যানের মাধ্যমে মণ্ডলীর সিনডে অংশগ্রহণ করতে চাই।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী প্রথমত, অনেকের কাছে নতুন ধারণা। দ্বিতীয়ত, মণ্ডলীতে বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণ একসঙ্গে যাত্রা করবে, বিভিন্ন বিষয়ে আত্মার অবধারণ করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, প্রভৃতি কাজে আমরা সবাই ততোটা অভ্যস্ত নই। তৃতীয়ত, বর্তমান সিনড আগের সিনডের মতো নয়; এবারের সিনডের ভোট অধিকারসহ সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৩৬৫ জন। তার মধ্যে প্রথমবারের মতো পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় ৭০ জনকে মনোনয়ন দিয়েছেন, যারা বিশপ নন, যাদের মধ্যে আছে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী, ভক্তজনগণ পুরুষ ও নারী (৩৭ জন নারী সদস্য)। তাদেরকে নিয়ে যে একটি মণ্ডলী, একটি মিলনসমাজ তা সবকিছুতে: সিনড উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রা, সদস্যদের স্থান নির্ধারণ, সামগ্রিক আয়োজন, বসার স্থান-বিন্যাস, গোল-টেবিলে বসার ধারা, প্রভৃতিতে স্পষ্ট আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

“সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী” বিষয়ক সিনডটি দুটো অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হবে তা পূর্বেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম অধিবেশন এবছরে ৪ঠা থেকে ২৯শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর, অর্থাৎ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বান:

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস “সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর সিনড” আহ্বান করেছেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ সাধু ত্রয়োবিংশ যোহন দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা আহ্বান করেছিলেন। মণ্ডলীর নবীকরণের জন্য আহ্বান করে তিনি বলেছিলেন: “মণ্ডলীর জানালা খুলে দাও যেন বিশুদ্ধ বায়ু মণ্ডলীতে প্রবেশ করতে পারে।” দ্বিতীয় মহাসভায় বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস যোগদান করেন নি। কিন্তু সেই দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নবায়ন বাস্তব করার জন্য তিনি আবার আহ্বান জানাচ্ছেন: “মণ্ডলীর দরজা খুলে দাও, দরজা বন্ধ করে রেখো না”। অনেকে মন্তব্য করেছেন যে মণ্ডলীর জন্য তৃতীয় ভাটিকান মহাসভা প্রয়োজন। পোপ ফ্রান্সিস বলেন তৃতীয় ভাটিকান মহাসভার জন্য আমরা এখনও

পরিপক্ক নই। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নির্দেশনা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। আর এর জন্যই ‘সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী’র জন্য সিনডের প্রয়োজন, এবং তার আয়োজন ও উদ্‌যাপন। সিনড হচ্ছে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একসঙ্গে, পবিত্র আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অবধারণ ক’রে, মণ্ডলীকে মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণমূলক ও মিশনধর্মী করে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার বাস্তবায়ন আরও ত্বরান্বিত করবে ও মহাসভার গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে।

বিগত দশ বছরে পোপ ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে আমার কাছে যে বিষয়টা খুবই স্পষ্ট তা হচ্ছে: তিনি উত্তম মেসপালক যিশুর বিশ্বস্ত অনুসারী। পোপ মহোদয়, পিতা ঈশ্বরের পুত্র মানবদেহধারী যিশুর দৃশ্যমান উপস্থিতি হয়ে, পবিত্র আত্মার শক্তিতে যিশুর প্রচারিত মঙ্গলসমাচার অনুসারে নিজে জীবনযাপন ক’রে, খ্রিস্টমণ্ডলী ও বিশ্বের সবার কাছে সেই মঙ্গলসমাচার তুলে ধরেন এবং সবাইকে সেই মঙ্গলসমাচারের দিকে নিয়ে আসার প্রেরণা দান করেন।

উত্তম মেসপালক যিশু, ঈশ্বরের সুখবর বা সুসমাচার প্রচার করতে গিয়ে তিনি সকল মানুষের সাথে একাত্ম হয়েছেন, সাধারণ মানুষের সাথে মিশেছেন, সমাজের পরিত্যক্ত, প্রান্তিক ও অস্পৃশ্য মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছেন, পাপীদের আপন করে নিয়েছেন, তাদের কাছে ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমা প্রকাশ করেছেন, যিশু মানুষকে দণ্ড দিতে আসেননি, ধার্মিকদের জন্য আসেননি, সুস্থদের জন্য আসেননি, তিনি এসেছেন অসুস্থদের জন্য। যিশু তৎকালীন সমাজের অনেক নেতৃবর্গ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও শাস্ত্রীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন ও কঠিন কথা বলে তাদের অন্যায়ের পথ বর্জন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। যিশু কিন্তু ঈশ্বর-পিতার রাজ্য – ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা, ন্যায্যতা ও শান্তির রাজ্য ঘোষণা করতে অবহেলা করেননি। বরঞ্চ “আর পাপ করো না” বলে নির্দেশ দিয়েছেন এবং “মন-পরিবর্তন করো, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করো” বলে আহ্বান জানিয়েছেন।

আমরাও পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মধ্যে যিশুর মনোভাব ও আচরণ দেখি। অন্যকে বলার আগে তিনি নিজ জীবনে তা অনুশীলন করেন। পালক যিশুর অনুসরণে পালকীয় প্রেমের খাতিরে তিনি বর্তমান যুগের পাপীদের দণ্ড দিতে তিনি কে? বলে প্রশ্ন রেখেছেন; মণ্ডলীকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত হাসপাতালের সঙ্গে তুলনা করেছেন যেখানে শত্রু-মিত্র কেউ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত নয়। মণ্ডলীতে মেসপালকের ভূমিকায় যারা আছেন তাদের শরীর থেকে যেন মেষের গন্ধ পাওয়া যায়, অর্থাৎ তারা যেন জনগণের সাথে একাত্ম থাকেন।

প্রভু যিশুর আদর্শে, পোপ মহোদয়ের এই পালকীয় পদ্ধতি অনুসরণ নিয়ে কোন কোন ব্যক্তি ঐশ্বর্যপ্রত্যাদেশে ব্যক্ত ঐশতাত্ত্বিক ও ধর্মতাত্ত্বিক সত্যতা ও মণ্ডলীর প্রচলিত

শিক্ষা-পরম্পরার পরিপন্থী বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং পোপ মহোদয়ের নিকট তার ব্যাখ্যা চেয়েছেন। যে বিষয়গুলো নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা হল: বিবাহের ঐক্য ও অবিচ্ছেদ্যতা, দ্বিতীয় বিবাহ-করা ব্যক্তিদের কমিউনিয়ন গ্রহণ, সমকামীদের (তথাকথিত) বিবাহ আশীর্বাদ; নারীদের পুণ্যপদাভিষেক সংস্কার প্রদান, ইত্যাদি।

সিনড-অধিবেশন শুরুর পূর্বেই পোপ মহোদয় কয়েকটি ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন যে: “বিবাহ এক এবং অবিচ্ছেদ্য; সমকামীদের বিবাহ-আশীর্বাদ কোনভাবে বিবাহ-সংস্কার বলে গণ্য হবে না; নারীদের পুণ্যপদে অভিষিক্ত করা সম্ভব নয়।” এই নির্দেশ দিয়ে পোপ মহোদয় অযথা বাড়তি আলোচনা থেকে, যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে অযাচিত ব্যস্ততা থেকে মুক্ত রেখেছেন এবং সিনডের মূল আলোচনা থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছেন। উপরোক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বলে গোটা মণ্ডলীতে সিনড প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বিশেষ ভাবে: মণ্ডলীকে মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণমূলক এবং মিশনধর্মী করার উদ্দেশ্যে। এই সিনড-প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মা কী প্রকাশ করেন তা শোনার প্রচেষ্টা সিনডে আছে।

সিনডের দূরবর্তী ও আশু প্রস্তুতি

বিগত দু'টো বছরে তৃণমূল পর্যায়, বিশেষ করে ডাইয়োসিসের প্যারিশ পর্যায় থেকে শুরু করে, দেশীয় ও মহাদেশীয় পর্যায়ে অনেক তথ্য ও আলোচনা-পর্যালোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে, পক্ষ-বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত লিপিবদ্ধ করে এবং এমন কি ব্যক্ত করা কিছু ভয়-ভীতি ও সন্দেহ সম্বলিত করে প্রথমে একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সকলকে অবগত করা হয়েছে।

উক্ত সারসংক্ষেপের উপর ভিত্তি করে সিনড অধিবেশনের জন্য একটি কার্যপ্রণালী প্রস্তুত করা হয় যা বর্তমান অধিবেশনের পূর্বেই স্থানীয় মণ্ডলী ও মণ্ডলীর বিভিন্ন কার্যালয়ে ও সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হয় পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ। এই কার্য প্রণালীকে ভিত্তি করেই বর্তমান সিনড পরিচালিত হচ্ছে।

সিনড-অধিবেশনের আশু প্রস্তুতি হিসেবে ৩০ সেপ্টেম্বর ভাটিকানের সাধু পিতরের গির্জার চত্বরে দু-ঘন্টা ব্যাপী একটি আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রার্থনা সভায় পুণ্যপিতা পোপসহ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল: খ্রিস্টীয় ঐক্যের সাক্ষ্যদান, প্রার্থনায় আন্তঃমাণ্ডলিক সমর্থন, এবং পবিত্র আত্মাকে সম-কণ্ঠে আহ্বান করা কেননা তিনিই সকল ঐক্যের উৎস ও পরিচালক। অবাক হয়েছি দেখে যে, তেইজে ব্রাদারদের পরিচালনায়, যুবারা অনুষ্ঠানের অধিক-অংশ সঞ্চালন করেছে। প্রার্থনা-অনুষ্ঠানে “নীরবতা” পেয়েছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব; “নীরবতা” সামগ্রিক ও অন্তর্নিহিত ভাব ও বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

পরবর্তীতে ১-৩ অক্টোবর, সিনড-সদস্য ভক্তজনগণ, যাজক, বিশপ/আর্চবিশপ ও কার্ডিনালগণ মিলিত হন ত্রি-দিবসিক একটি নির্জন ধ্যানে। নির্জন ধ্যানটি পরিচালনা করেন ডমিনিকান সংঘের প্রাক্তন প্রধান শ্রদ্ধেয় ফাদার তিমথি রেডক্লিফ, ও.পি.। এই ধ্যান-সভাটি ছিল সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি। সিনডের কার্যপ্রণালিতে এমন কিছুই নেই যা তিনি তার উপদেশে উল্লেখ করে নির্দেশনা দেননি। ধ্যানের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল: সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী – সিনডের প্রকৃত অর্থ; নিরাশার মধ্যে আশা; ঈশ্বরের ঘরে আমাদের বাস আর আমাদের ঘরে ঈশ্বরের বাস; বাণী-প্রচার: বন্ধুত্বপূর্ণ সংলাপ (এম্মায়ূসের পথে); মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ; সত্যের আত্মা – আত্মায় সংলাপ; খ্রিস্টযাগে দেয়া অন্যান্য উপদেশ।

সিনডের আশু প্রস্তুতি হিসেবে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় সিনডের শুরুতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন যার মাধ্যমে সিনডের ধারা, সিনডের লক্ষ্য ও সফলতা ও সিনডের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছেন। এখানে পোপ মহোদয়ের কয়েকটি উক্তির অবতারণা করছি:

- ১) “এই সিনডে আমরা যারা এসেছি আমাদের কোন জাগতিক লক্ষ্য, পরিকল্পিত ও অভিষ্ট কৌশল-পদ্ধতি, রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ অথবা কোন আদর্শবাদ নিয়ে যুদ্ধ করার ভাবনা নেই। সিনড কোন সংস্কার-পরিকল্পনার জন্য কোন সংসদ সভা নয়। আমরা এসেছি যিশুর দৃষ্টির সামনে একসঙ্গে পথ চলতে, যে যিশু ঈশ্বরের প্রশংসা করেন এবং যারা শ্রান্ত ও নির্যাতিত তাদের আমন্ত্রণ জানান”।
- ২) “যিশুর দৃষ্টি আমাদেরকে আনন্দমনে মণ্ডলী হতে, ঈশ্বরের কাজ ধ্যান করতে এবং বর্তমানে তা অবধারণ করতে আহ্বান করে।
- ৩) পোপ ফ্রান্সিস, তাঁর পূর্বসূরী পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শুরুতে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: “মণ্ডলীর পিতৃগণের কাছ থেকে যে পুণ্য পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়েছে সেখান থেকে মণ্ডলী সরে যেতে পারে না। কিন্তু একই সময়ে মণ্ডলীকে বর্তমানের পরিস্থিতি দেখবে, আধুনিক জগতে জীবনযাপনের যে নতুন অবস্থা ও প্রণালী দেখা যাচ্ছে তা কাথলিক প্রেরিতিক কাজের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে তারও অবধারণ করতে হবে।”
- ৪) পোপ মহোদয় আরও বলেন যে, “আমাদের মনে হয়, যারা ‘বিষাদগ্রস্ত প্রবক্তা’ রয়েছেন তাদের ব্যাপারে আমাদের ভিন্নমত পোষণ করতে হবে, কেননা তারা সর্বদা ধ্বংসের কথা বলেন, তাদের কথা শুনে মনে হয় যেন জগতের অন্তিম সময় এসে গেছে।” এ প্রসঙ্গে পোপ মহোদয় বলেন যে, পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের মতো আমিও ‘প্রভুতে বিশ্বাস করি’। সিনড-সদস্য “আমরা প্রভুরই, আমরা স্মরণ

করি যে, এই জগতে আমরা আছি শুধু তাঁকেই জগতে নিয়ে আসার জন্য... আমাদের কোন জাগতিক স্বার্থ নেই; জাগতিকভাবে নিজেদেরকে আকর্ষণীয় করতে চাই না, কিন্তু আমরা চাই জগতের মধ্যে মঙ্গলসমাচারের সাক্ষ্য পৌঁছে দিতে, ঈশ্বরের অসীম ভালবাসার সাক্ষ্য প্রত্যেকের কাছে আরও উপযোগী করে দান করতে চাই।”

৫) সিনড-সদস্য সকলকে, এমন কি সমালোচকদেরও, পোপ মহোদয় স্মরণ করিয়ে দেন যে, “আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা, আমরা এমন মণ্ডলী হব যা মানুষকে মমতা দিয়ে দেখবে। এমন মণ্ডলী হব যা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ, যারা উদাসীন তাদের মাঝে প্রেমে জাগ্রত করবে, তাদের জন্য এমন পথ উন্মুক্ত করবে যেন বিশ্বাসের সৌন্দর্য দেখে জনগণ আকৃষ্ট হয়। এমন মণ্ডলী হব যার প্রাণকেন্দ্রে থাকবে ঈশ্বর, যে-মণ্ডলী অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন নয়, বাহ্যিকভাবে কারো প্রতি নির্ভর না হয়। এভাবেই তো যিশু তার মণ্ডলীকে সেভাবে দেখতে চান, যে মণ্ডলী হয়ে উঠবে তাঁর আপন বধু”। যিশু এমন মণ্ডলী দেখতে চান, যে অন্যের “ঘারে বোঝা চাপিয়ে দেবে না, বরঞ্চ বারবার এই বলে আহ্বান করবে: “এসো, তোমরা যারা শ্রান্ত ও নির্যাতিত, এসো, তোমরা যারা পথ হারিয়ে ফেলেছো অথবা মনে করছো তোমরা অনেক দূরে সরে গেছো, এসো, তোমরা যারা প্রত্যাশার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছো: তোমাদের জন্য মণ্ডলী তোমাদের পাশে আছে।” মণ্ডলীর দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত, প্রত্যেকের, প্রত্যেকের জন্য উন্মুক্ত।”

৬) সিনড-সদস্যদের আরও বললেন: “আমাদের সামনে যে সকল কষ্ট ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেখানে যিশুর আশীর্বাদিত এবং স্বাগত দৃষ্টিতে অবস্থান করে আমরা যেন বিপজ্জনক প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকি, অর্থাৎ জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে মণ্ডলীকে যেন কঠোর করে না তুলি; আবার মণ্ডলীকে যেন এমন উদাসীন করে না ফেলি, যে মণ্ডলী জগতের সকল ফ্যাশনের প্রতি গা ভাসিয়ে দেবে; ক্লান্ত হয়ে মণ্ডলী যেন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে না রাখে।”

৭) সিনড-উদ্বোধনী নির্দেশনার পরিসমাপ্তিতে পোপ মহোদয় বলেন: “এসো একসঙ্গে পথ চলি: বিনম্রতার সাথে, আগ্রহভরে ও আনন্দচিত্তে পথ চলি। আসিসির ফ্রান্সিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, যিনি দরিদ্রতা ও শান্তির সন্তজন ছিলেন, যিনি ‘ঈশ্বর-পাগল’, যিনি যিশুর পঞ্চক্ষত আপন দেহে ধারণ করেছেন, যিনি যিশুকে পরিধান করার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিবস্ত্র করছেন।”

৮) পোপ ফ্রান্সিস মণ্ডলীর আদি পিতৃগণের রচনাবলি উল্লেখ করে বলেন যে, মণ্ডলীর পরিচালক হচ্ছেন পবিত্র আত্মা: মানবজীবনের পরিব্রাণ পূর্ণভাবে সাধিত হয় পবিত্র আত্মারই দ্বারা। (ক) মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা গভীরতা ও বিচিত্রতা উজ্জ্বল করে তোলে: পঞ্চশতমীর মতো মণ্ডলীতে ঝড় সৃষ্টি করে। (খ) পরিব্রাণ ইতিহাসে পবিত্র আত্মা সম্প্রীতি সৃষ্টি করেন যার ফলে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে মিলনের বন্ধন সৃষ্টি হয়। (গ) পবিত্র আত্মা হাত ধরে মণ্ডলীকে পরিচালনা করেন এবং সর্বদাই মণ্ডলীকে সান্নাধ্য প্রদান করেন। (ঘ) পবিত্র আত্মাই মণ্ডলীকে সৃষ্টি করেন। (ঙ) পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেন।

সিনড-অধিবেশন চলাকালে পোপ মহোদয় আরও কয়েকটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন যার উল্লেখ নিম্নে করা হল:

প্রথমত, সিনড-অধিবেশনে ও ছোট দলে যা-কিছু আলোচনা হয় সে বিষয়ে যেন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

দ্বিতীয়ত, সিনডের কাজ হচ্ছে “সমবেতভাবে আত্মায় অবধারণ করা”। সিনডের ভূমিকা হচ্ছে আত্মায় অবধারণ করে মতামত প্রকাশ করা; জনগণের বিশ্বাসবোধ থেকে সেই মতামত ব্যক্ত হয় বলে তার গুরুত্ব অনেক। তবে পরবর্তী ধাপে নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও পোপ মহোদয় কর্তৃক পবিত্র আত্মায় অবধারণ করার পর ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা সম্পর্কে মণ্ডলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মতামত প্রকাশ করা, ভোট দিয়ে মতামত প্রকাশ করার অধিকার সবার আছে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার মণ্ডলীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত।

উপসংহারে বলতে চাই যে, রোমে অনুষ্ঠিত সিনড-এর সঙ্গে আমরা সবাই আত্মিক ও বাস্তবিকভাবে সম্পৃক্ত। আমাদের সম্পৃক্ততা শুধু তথ্য জানার মধ্যে সীমিত নয়। সিনডের লক্ষ্য, ভাবধারা, কার্যপ্রণালী, আত্মায় সংলাপ এবং আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আমরা সবাই একসঙ্গে যাত্রা করছি। সিনড-এর মাধ্যমে পবিত্র আত্মা আমাদেরকে কী বলেন সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া, আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করা এবং আমাদের আত্মনিয়োজন সুদৃঢ় করা হবে সিনড-সদস্যদের সাথে আমাদের একসঙ্গে পথচলার ধারা। প্রার্থনায় আমাদের প্রতিনিধিদের সাথে একাত্ম হব। এই একাত্মতা মণ্ডলীর মধ্যে মিলন-সমাজ গঠন করতে, অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলী গড়ে তুলতে এবং মণ্ডলীর মিশন সম্পন্ন করতে আমাদেরকে আরও তৎপর ও সক্রিয় করবে।

তথ্যসূত্র:

1. *Rev. Fr. Timothy Redcliff, OP, Five Meditations for the Retreat to the Synod Members, October 1-3, 2023.*
2. *Pope Francis: Collection of Patristic Texts for the Opening of the Synod's Work*
3. *Pope Francis, Homily at the Solemn Inauguration of Synod at the Concelebrated Mass (St. Peter's Square)*
4. *Gerard O'Connell, Analysis: The synod is not Vatican III. It's Pope Francis' implementation of Vatican II October 04, 2023*
5. *Gerard O'Connell, Synod Diary: A synod doesn't decide—it discerns, in AMERICA*
6. *1st General Congregation Report from the General Relator By Jean-Claude Card. Hollerich, Relatore generale SYNOD.VA (CNUA)*

রচনা – ৪ : সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর আধ্যাত্মিকতা

সাম্প্রতিক কালে মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনায় যে বৈশিষ্ট্যটি পোপ মহোদয় গুরুত্ব আরোপ করেন সেটা হচ্ছে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী; “সিনড” কথার অর্থ হচ্ছে “একসঙ্গে পথচলা”। মণ্ডলীতে সবার “অংশগ্রহণ”, মণ্ডলীর “মিশন” সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে, মণ্ডলী যেন “মিলন-সমাজ” হওয়ার জন্য সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীরা – ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী, যাজক ও বিশপগণ “একসঙ্গে পথ চলেন”।

পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্বে আমরা প্রত্যাদেশ গ্রন্থ থেকে এই বাণী শুনি: “যার কান আছে, সে শুনুক, ঐশ আত্মা এখন মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।”

কাথলিক মণ্ডলী “এক” বলে আমরা বিশ্বাস করি। তবে এই “এক”-এর মধ্যে আছে “বহু”। মণ্ডলীতে আছে বহু কৃষ্টি, ভাষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা, দেশ ও যুগ; বহু ধরনের মানুষ, তাদের বহু ধরনের শক্তি, ভূমিকা, দায়িত্ব; বহু মন-মেধা, চিন্তাধারা, হৃদয়বৃত্তি, মতামত ও সামর্থ্য। তবে “বহু”র মধ্যে রয়েছে “প্রভু” যিনি এক, বিশ্বাস যা “এক”, পবিত্র আত্মা যিনি “এক”, খ্রিস্টদেহরূপ মণ্ডলীর বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে তিনিই একমাত্র “প্রাণ”। “ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন”?

মণ্ডলীকে সিনড-বিশিষ্ট করতে হলে পবিত্র আত্মাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরপুত্র প্রভু ষিগু খ্রিস্টেতে সবাইকে “এক” করেন, আমাদের সবাইকে “এক” পিতার সন্তান করে রাখেন। “ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন”?

একারণেই পবিত্র আত্মার আগমন পর্বে (পঞ্চাশত্তমী পর্বে) আমরা মণ্ডলীর জন্মদিন পালন করি। পবিত্র আত্মার শক্তিতেই মণ্ডলী জন্ম লাভ করে, আবার মণ্ডলী যা, তা-ই হয়ে ওঠে। মণ্ডলী যদি সত্তাগত ভাবে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হতে হয় তাহলে পবিত্র আত্মার শক্তি, কাজ, প্রেরণা ও মিশন ছাড়া সম্ভব নয়। “ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন”?

পোপ মহোদয় বলেছেন যে, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্টতা হবে “শ্রবণ করা”; “ঐশ আত্মা কী বলছেন” তা শ্রবণ করা; আমার কাছে পবিত্র আত্মা কী বলছেন তা শ্রবণ করা; পবিত্র আত্মা অন্যের কাছে কী বলছেন তা শ্রবণ করা; মণ্ডলীর মধ্যে যেন কেউ মনে না করেন যে, কেবলমাত্র তার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা কথা বলেন। পবিত্র আত্মাকে সবাই লাভ করেছেন। তারা দীক্ষিত ও প্রেরিত।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে শুধু নিজের কথা শোনা নয়, পবিত্র আত্মা আমার মধ্য দিয়ে

এবং অন্যের মধ্য দিয়ে কী বলছেন তা শ্রবণ করা। এর ফলেই মণ্ডলীতে গুরুত্ব পাবে আত্মার শক্তি দ্বারা জানার প্রক্রিয়া, যাকে আমরা বলি “আত্মায় অবধারণ শক্তি”।

আত্মায় “অবধারণ” হচ্ছে আত্মার একটি শক্তি। “অবধারণ শক্তি” দ্বারা আমরা জানি, বিবেচনা করি, যাচাই করি, পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে কী বলছেন।

“আত্মায় অবধারণ শক্তি” দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে যাকিছু ভাল বা মন্দ আছে তা আমরা জানতে পারি; “আত্মার অবধারণ শক্তি” দ্বারা অন্যের মধ্যে যাকিছু ভাল বা মন্দ আছে তা জানতে পারি; আত্মায় অবধারণ শক্তি দ্বারা নিজেদের মধ্যে ও অপরের মধ্যে যা ভাল, অথচ গোপন আছে, তা বের করে আনতে পারি।

“আত্মায় অবধারণ শক্তি” দ্বারা আমরা বুঝতে পারি পবিত্র আত্মার কাজ কোনটি এবং পবিত্র আত্মার বিরোধী কাজ কোনটি; কোন কাজটি শয়তানের শক্তি দ্বারা পরিচালিত।

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী করতে বলেন? যাকিছু “ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম”, (গালাতীয় ৫:২২-২৩); ঐক্য-মিলন, দ্রাতৃত্ব, ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান, সমঝোতা, সংলাপ, সংহতি, স্বার্থচিন্তা-মুক্তি, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে – তাই পবিত্র আত্মার কাজ।

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী করতে নিষেধ করেন? “ব্যভিচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, বেসামাল ভোজ-উৎসব” (গালাতীয় ৫:১৯-২১), মিথ্যা-অপবাদ দেওয়া, দুর্নাম করা, সুনাম নষ্ট করা, বিরূপ সমালোচনা করা, স্বার্থচিন্তা, আঞ্চলিকতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, মিডিয়ার মধ্য দিয়ে কাইকে হেয় করা, কারো চরিত্র হনন করা, ধুমকি-ধামকি দেওয়া, ক্ষমতা প্রদর্শন করা, সত্যতা যাচাই না করে অসত্য প্রচার করা, ইত্যাদি কাজ সকল পবিত্র আত্মার পরিপন্থী। এগুলো কোন সময়ে পবিত্র আত্মার কাজ হতে পারে না।

ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলেন তা শ্রবণ করা ধ্যান ও প্রার্থনার মাধ্যমে; শ্রবণ করা অন্যের মতামত জানার মাধ্যমে; ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও মাণ্ডলিকভাবে আত্মায় অবধারণ শক্তির মাধ্যমে। “যার কান আছে, সে শুনুক, ঐশ আত্মা এখন মণ্ডলী গুলোকে কী বলছেন।”

পবিত্র আত্মার শক্তিতে অবধারণ করে অনেকে আছেন যারা সংসাহস, সুবিবেচনা, ন্যায়পরায়নতা ও মিতাচারিতা নিয়ে, অন্যকে কঠিন চ্যালেঞ্জ দিতে পারে, সত্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা দৃঢ়প্রত্যয়ী, মানুষের কথা না শুনে তারা ঈশ্বরের কথা শোনে, তারা নিজের মধ্যে কষ্ট থাকলেও শান্তি অনুভব করে, ভুলের সংশোধন তারা গ্রহণ করতে পারে, ভুল করলে তারা ক্ষমা চাইতে পারে এবং অপরকে ক্ষমা করতে পারে। তারা শান্তিকামী, তারা ধন্য। শান্তি পবিত্র আত্মারই দান।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী গড়ার প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মায় অবধারণ শক্তি দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা জেনে, যা-কিছু করণীয় তা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, এসো আমরা আমাদের মাতা মণ্ডলীকে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী গড়ার কাজে নিয়োজিত হই। সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী নির্মাণ করার প্রক্রিয়ায় এসো আমরা পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা অবধারণ প্রক্রিয়ায় একসঙ্গে পথ চলি এবং জানতে চেষ্টা করি “ঐশ আত্মা এখন মণ্ডলীগুলোকে কী বলছেন।” এটাই হচ্ছে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর আধ্যাত্মিকতা যেখানে আছে আত্মার ঐক্য, মিলন, সক্রিয়তা ও মিশন সম্পাদনের দৃঢ় চেতনা।

ব্রত্যা -৬ : পোপ ফ্রান্সিস : প্রৈরিতিক সংবিধান “মঙ্গলবার্তা ঘোষণা”

রোমীয় কাথলিক চার্চের প্রধান, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে ও সভাপতিত্বে বিগত ২৭, ২৯-৩০ আগস্ট, ২০২২ খ্রি. তারিখে ভাটিকানে কার্ডিনাল-কলেজের সদস্যদের অংশগ্রহণে ধর্মানুষ্ঠান ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটির একাধিক আনুষ্ঠানিক অধিবেশন ছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে আমিও নিজে উপস্থিত ছিলাম। সুতরাং উক্ত সভা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি প্রতিবেদন দেওয়া সমীচীন বলে মনে করি, কারণ কাথলিক মণ্ডলী নিয়েই সকল অনুষ্ঠান ও আলোচনা হয় এবং এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও পরিচয় রাখা সাম্প্রতিককালের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের দাবি ও অধিকার। আলোচিত বিষয়গুলো সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণ ও মিশন সম্পৃক্ত বিষয়ক বিধায় সবারই তা জানা উচিত কেননা তা গোটা মণ্ডলীর জন্য উপকারে আসবে।

তিন দিনের সভায় যে গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনসমূহ অনুষ্ঠিত হয় তা নিম্নরূপ: (ক) নবনিযুক্ত কার্ডিনালদের অধিষ্ঠান-অনুষ্ঠান এবং দুজন ব্যক্তির সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের অনুমোদন (২৭ আগস্ট); (খ) “মঙ্গলবার্তা ঘোষণা” নামক প্রৈরিতিক সংবিধান-এর ওপর চারটি ভাষাভিত্তিক (ইতালিয়ান-৪, ইংরেজী-৪, ফরাসী-২, স্পেনিশ-২) ১২ টি দলে ও সাধারণ অধিবেশনে আলোচনা ও সহভাগিতা; (গ) মণ্ডলীর ২০২৫ বছর-পূর্তির জুবিলী ও পুণ্যবর্ষ বিষয়ক আলোচনা।

৥ ক ৥ নবনিযুক্ত কার্ডিনালদের অধিষ্ঠান-অনুষ্ঠান (২৭ আগস্ট)

পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক পূর্বেই ২১ জন কার্ডিনালকে মনোনয়ন দান করেন। তাদের মধ্যে ২০ জনকে পোপ মহোদয়, সাধু পিতরের মহামন্দিরে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, লাল টুপি, অঙ্গুরী ও উপাধিসূত্রে রোমের একটি চার্চের আসন প্রদান করেন। নব নিযুক্ত কার্ডিনালদের মধ্যে যা লক্ষণীয় তা হল: তারা অধিকসংখ্যক মনোনীত বিশ্বের প্রান্তিক এলাকা, অর্থাৎ যে দেশ ও ডাইয়োসিস থেকে, যেখান থেকে পূর্বে কোন কার্ডিনাল মনোনীত হয় নি; এবং ২০ জনের মধ্যে এশিয়া মহাদেশ থেকেই ৬ জন। এই অনুষ্ঠানে আগত সকল কার্ডিনালগণ, এবং বিশপগণ, পুরোহিতগণ, কূটনীতিকবৃন্দ, নবনিযুক্ত কার্ডিনালদের অতিথিবৃন্দ ও আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শেষের দিকে দুজন ব্যক্তির সাধু শ্রেণীভুক্তিকরণ চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়।

বর্তমানে কার্ডিনালদের মোট সংখ্যা ২২৯ জন; তার মধ্যে ৮০ বছরের উপরে ৯৭ জন, এবং আশি বছরের নিচে, যাদের পোপ-নির্বাচনে ভোটাধিকার আছে তাদের সংখ্যা ১৩২ জন। ভোটাধিকার প্রাপ্তদের মধ্যে ইউরোপ থেকে ৫৪ জন, আমেরিকা

(লাতিন+যুক্তরাষ্ট্র+কানাডা) থেকে ৩৮ জন, এশিয়া থেকে ২০ জন, আফ্রিকা থেকে ১৭ জন এবং ওসেনিয়া থেকে ৩ জন)।

॥ খ ॥ “মঙ্গলবার্তা ঘোষণা” বিষয়ক প্রৈরিতিক সংবিধান-এর উপর আলোচনা (২৯-৩০ আগস্ট)

Pope Francis: **Apostolic Constitution *Praedicate Evangelium*** on the ROMAN CURIA and its Service to the Church in the World.

পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফের পর্বদিনে (১৯ মার্চ, ২০২২) “মঙ্গলসমাচার প্রচার” শীর্ষক প্রৈরিতিক সংবিধানটি আনুষ্ঠানিক ভাবে জারি ও প্রকাশ করেন এবং ২০২২ খ্রি. ৫ জুন, পঞ্চগশত্তমি পর্বদিন থেকে কার্যকরী বলে ঘোষণা করেন।

পোপ ফ্রান্সিস পোপ হিসেবে নির্বাচিত হন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ। নির্বাচনের পূর্বে সম্ভ্রাহব্যাপী কার্ডিনালগণ সভায় মিলিত হন এবং আলাপ আলোচনায় রোমীয় কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা (রোমান কুরিয়া) পুনঃসংস্কার করার জন্য জোর সুপারিশ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে পোপ ফ্রান্সিস ৯ জন কার্ডিনালদের নিয়ে একটি কার্ডিনাল-কাউন্সিল গঠন করেন। তারা পোপ মহোদয়ের সাথে একত্রে দীর্ঘ আট বছর ধরে কাজ করেন। খসড়া দলিলটি রোমান কুরিয়ার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এবং দেশীয় বিশপ সম্মিলনীসমূহের কাছ থেকে মতামত লাভ করার পর সংবিধানটি চূড়ান্ত করা হয়। “মঙ্গলসমাচার প্রচার” নামক প্রৈরিতিক সংবিধানটি জারি করার ফলে প্রচলিত ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের “উত্তম মেম্পালক” নামক সংবিধানটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

নতুন প্রৈরিতিক সংবিধানটি ১০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি দলিল। এখানে আছে ২৫০টি ধারা। এই ধারাগুলো অনুসরণ করে কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা (রোমান কুরিয়া) সংশ্লিষ্ট বিভাগ, শাখা, প্রতিষ্ঠান, দপ্তর তার নিজস্ব অনুশাসন-বিধি তৈরী করে তা অনুমোদন করে নেবে।

(ক) রোমান কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার (রোমান কুরিয়া) বিশেষত্ব (ধারা ১-৫২)

(১) “মঙ্গলবার্তা ঘোষণা” নামক প্রৈরিতিক সংবিধানটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও মঙ্গলবার্তা মুখী, মঙ্গলবার্তা ভিত্তিক এবং মঙ্গলবার্তা-ঘোষণামুখী করে তোলা। এরই কারণে মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রথমই রাখা হয়েছে গুরুত্ব অনুসারে তিনটি বিভাগ (ডিকাস্ট্রি): (১) মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক; (২) খ্রিস্টবিশ্বাস-নীতি বিষয়ক; (৩) সেবামূলক দয়ার কাজ বিষয়ক।

- (২) রোমান কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার (রোমান কুরিয়ার) মধ্যে আছে: ভাটিকান রাষ্ট্রের সেক্রেটারিয়েট, বিভাগসমূহ (ডিকাস্ট্রি), প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং দপ্তরসমূহ।
- (৩) প্রৈরিতিক সংবিধানের নির্দেশনা অনুসারে বিগত বছরগুলোতে প্রশাসনিক নতুন ব্যবস্থা ইতোমধ্যে সুবিন্যস্ত করে প্রায় সবই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পোপ মহোদয় কাথলিক মণ্ডলীর প্রথম ও প্রধান কর্তৃপক্ষ হিসেবে মণ্ডলীর শিক্ষা-পরম্পরায় এই নির্দেশনার অধিকার তাঁর আছে। ফলশ্রুতিতে, বিভিন্ন কনগ্রেসন, পোপীয় সংস্থা বা কাউন্সিল, প্রভৃতি পুনঃবিন্যাস করে সর্বমোট ১৬ টি বিভাগ (ডিকাস্ট্রি) গঠন করা হয়েছে। আর তার সাথে রয়েছে: ন্যায্যতা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, অর্থ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং কয়েকটি দপ্তর।
- (৪) প্রৈরিতিক সংবিধানের প্রথমদিকে কয়েকটি মৌলিক নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মণ্ডলীতে প্রতিজন খ্রিস্টবিশ্বাসী যিশুর একজন মিশনারী শিষ্য। এর বলে খ্রিস্টবিশ্বাসী প্রত্যেকে, এমন কি ভক্ত-জনগণকে, কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ভূমিকায়, পিতরের উত্তরাধিকারী প্রতিনিধি হিসেবে পোপ মহোদয় নিয়োগ দিতে পারবেন।
- “প্রতিজন খ্রিস্টবিশ্বাসী, তার দীক্ষান্নানের গুণে একজন মিশনারী, যদি সেই ব্যক্তি খ্রিস্ট যিশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালবাসা উপলব্ধি করে থাকে। মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কারে এই সত্যতা কোন ভাবেই বিবেচনা না করা ঠিক হবে না; অতএব নারী ও পুরুষ ভক্তজনদের অংশগ্রহণ, এমন কি পরিচালন ও দায়িত্বশীল ভূমিকায়, সুযোগ থাকতে হবে।”
- (৫) মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা (রোমান কুরিয়া) একদিকে পোপের মাধ্যমে বিশ্বজনীন মণ্ডলীকে সেবা করবে; আবার অন্যদিকে বিশপদের মাধ্যমে স্থানীয় মণ্ডলীকে সেবা করবে।
- (৬) প্রৈরিতিক সংবিধানের মূল লক্ষ্য ও নীতি গোটা কাথলিক মণ্ডলীর জন্য প্রযোজ্য। তবে কাথলিক মণ্ডলীর রোমান কুরিয়ার জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছে তা একদিকে পোপের কাজের সেবার্থে এবং অন্যদিকে স্থানীয় মণ্ডলীর সেবার্থে। অতএব এই মূল লক্ষ্য ও নীতি প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলীতে উপযোগী করে প্রয়োগ করতে হবে।
- (৭) “মিশনারী শিষ্য” হওয়ার দায়িত্ব হবে প্রশাসনিক কর্মীদের প্রধান আধ্যাত্মিকতা।

- (৮) মণ্ডলীর প্রশাসন কর্মকাণ্ড সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রক্রিয়া অনুসরণে পরিচালিত হবে।
- (৯) মণ্ডলীর প্রশাসন-ব্যবস্থায় যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীর কার্যকাল: যে সমস্ত যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী রোমান কুরিয়াতে কাজ করবেন তারা প্রথমত পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ পাবেন। প্রয়োজনবোধে আরও পাঁচ বছরের জন্য নিয়োজিত হতে পারবেন।
- (১০) মণ্ডলীর প্রশাসন-ব্যবস্থা অনুসারে প্রতিটি বিভাগ নিয়মিত ভাবে পোপ মহোদয়ের সাথে সভা করবে। আবার আন্তঃবিভাগ পর্যায়েও সংশ্লিষ্ট বিষয় ও সমন্বয়ের জন্য নিজেদের মধ্যে সভা করবে।
- (১১) মণ্ডলীর প্রশাসন-ব্যবস্থায় যারা কাজ করবেন তাদেরকে অবশ্যই গঠন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক, প্রশাসনিক, পেশাদারিত্বে তাদেরকে দক্ষ হতে হবে।

(খ) মণ্ডলীর প্রশাসন-ব্যবস্থার (রোমান কুরিয়ার) বিভাগসমূহ (ধারা ৫৩-১৮৮)

পূর্বে রোমান কুরিয়াতে যেগুলোকে “কনগ্রেশন” বা “পন্টিফিকাল কাউন্সিল” নামে অভিহিত করা হত সেগুলো এখন নতুন প্রৈরিতিক সংবিধান অনুসারে, পুনর্গঠন্যাস করে ১৬ টি প্রশাসনিক “বিভাগ” অথবা “ডিকাস্ট্রি” বলে নামকরণ করা হয়েছে। এই প্রশাসনিক বিভাগ বা ডিকাস্ট্রিগুলোর নাম এবং প্রতিটি বিভাগের মূল কাজ সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১) মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ (ধারা ৫৩-৬৮)

এই বিভাগের মধ্যে আছে দুটো শাখা : (ক) বিশ্বে মঙ্গলবার্তা ঘোষণার মৌলিক বিষয়সমূহ; (খ) মঙ্গলবার্তা ঘোষণার প্রথম ধাপ এবং নতুন নির্দিষ্ট মণ্ডলীসমূহ। প্রতিটি শাখার জন্য থাকবে একজন সহ-প্রধান। বিভাগের প্রধান হিসাবে পোপ মহোদয় সভাপতিত্ব করবেন।

(২) খ্রিস্টবিশ্বাস-নীতি বিষয়ক বিভাগ: (ধারা ৬৯-৭৮)

খ্রিস্টবিশ্বাস ও নৈতিকতার বিষয়ে মণ্ডলীর সমন্বিত শিক্ষা অক্ষুন্ন রেখে মঙ্গলবার্তা ঘোষণার জন্য পোপ মহোদয় ও বিশপদের সাহায্য করে।

(৩) সেবামূলক দয়ার কাজ বিষয়ক বিভাগ: (ধারা ৭৯-৮১)

এ বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে বিশ্বের দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও বঞ্চিতদের অগ্রাধিকার দিয়ে, পোপ মহোদয়ের নামে ত্রাণ-সাহায্য ও সহায়তা দান করা।

(৪) প্রাচ্য মণ্ডলী বিষয়ক বিভাগ: (ধারা ৮২-৮৭)

প্রাচীন ও প্রাচ্য কথলিক মণ্ডলীগুলোর ব্যক্তিবর্গ ও বিষয়াদি সম্বন্ধে দেখাশুনা করা এই বিভাগের মূল কাজ।

(৫) ঐশ-উপাসনা ও সংস্কারসমূহের নিয়মাবলি বিষয়ক বিভাগ (ধারা ৮৮-৯৭)

এই বিভাগে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নবায়ন অনুসারে ঐশ-উপাসনা ও পবিত্র সংস্কারসমূহের নিয়মকানুন যাচাই করা, উপাসনা-অনুষ্ঠানের দেখভাল করা এবং মণ্ডলীর পবিত্র উপাসনা-অনুষ্ঠান বিধিসম্মত কি-না তা পরীক্ষা করা হয়।

(৬) সাধু শ্রেণিভুক্তকরণ বিষয়ক বিভাগ (ধারা ৯৮-১০২)

অনুমোদিত প্রক্রিয়া অনুসারে এ বিভাগটি ধন্য ও সাধু শ্রেণিভুক্ত করার সমস্ত বিষয় দেখাশুনা করে। প্রয়োজনে ডাইয়েসিসগুলোকে এ কাজে সাহায্য করে।

(৭) বিশপগণ বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১০৩-১১২)

“মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ”-এর অন্তরায় না হয়ে এ বিভাগটি ডাইয়েসিস সংক্রান্ত বিষয় ও বিশপ মনোনয়ন ও গঠন, এবং বিশপের অফিস, বিশপ সম্মিলনী, আদালিমিনা ভিজিট, প্রভৃতির দায়িত্বভার পালন করে।

(৮) যাজক-সম্প্রদায় বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১১৩-১২০)

যাজক ও ডিকন সংক্রান্ত বিষয় এই বিভাগের উপর ন্যস্ত আছে। যাজকদের আহ্বান ও গঠন-প্রশিক্ষণ, পালকীয় সেবাকর্ম, যাজক-ব্যক্তি, ইত্যাদি এই বিভাগের আওতাধীন।

(৯) উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী সংঘ ও প্রৈরিতিক জীবনব্রতী সংঘ বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১২১-১২৭)

মঙ্গলসমাচারে সুমঞ্জর্ণা অনুযায়ী জীবনাহ্বান বৃদ্ধি, উৎসাহদান এবং নির্দেশনা প্রদান করে এবং উৎসর্গীকৃত জীবনযাপন এবং প্রৈরিতিক সংঘের জীবন ও কাজের জন্য নিয়মনীতি অনুমোদন করে।

(১০) মণ্ডলীর ভক্তজনগণ, পরিবার ও মানবজীবন বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১২৮-১৪১)

এ বিভাগের কাজ হচ্ছে: ভক্তজনগণের প্রৈরিতিক কাজ, যুবাদের পালকীয় যত্ন, ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে পরিবার ও তার মিশন, প্রবীণ, জীবন-রক্ষা, প্রভৃতি দেখাশুনা করা। একাজে বিভাগের কর্মকর্তাগণ স্থানীয় মণ্ডলী ও বিশপ সম্মিলনীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করে।

(১১) খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৪২-১৪৬)

সমগ্র খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। এই কাজ শুধু কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্য মণ্ডলী ও মাণ্ডলিক সম্প্রদায়ের সাথে একত্র হয়ে আন্তঃমাণ্ডলিক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

(১২) আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৪৭-১৫২)

অন্য ধর্মের মানুষের সাথে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা গঠিত বিভিন্ন দলের সাথে সংলাপের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে ও তাদের সম্পর্কের তত্ত্বাবধান করে। (ইহুদী ধর্মের সাথে সংলাপ খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক বিভাগের আওতাভুক্ত)।

(১৩) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৫৩-১৬২)

এই বিভাগে সংস্কৃতি ও শিক্ষার জন্য দুটো ভিন্ন শাখা আছে। সংস্কৃতি বিষয়ক শাখার মধ্যে আছে সংস্কৃতির উন্নয়ন, পালকীয় কার্যসূচি এবং সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিস্তার। শিক্ষা বিষয়ক শাখার মধ্যে আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কাথলিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণামূলক মাণ্ডলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন। উভয় শাখার জন্য সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে খ্রিস্টীয় নৃতত্ত্বের আলোকে জনগণের মানবিক মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন এবং তথা পূর্ণ খ্রিস্টীয় শিষ্যত্ব বাস্তবায়নে অবদান রাখা।

(১৪) সমন্বিত মানবোন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৬৩-১৭৪)

সমন্বিত মানবোন্নয়নের যে কাজ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, তা হল: ঈশ্বর-প্রদত্ত মানবব্যক্তির মর্যাদার উৎকর্ষসাধন; যার সাথে সম্পৃক্ত আছে: মানবাধিকার, স্বাস্থ্য, ন্যায্যতা এবং শান্তি। যে বিষয়গুলো অর্থনৈতিক ও মানবশ্রমের সঙ্গে সংযুক্ত সেগুলো, সৃষ্টি এবং সর্বসাধারণের বসতবাটি ধরিত্রীর যত্ন, অভিবাসী ও মানবিক দুর্যোগ সম্পর্কিত, প্রভৃতি বিষয়গুলো এই বিভাগের আওতাভুক্ত। এই বিষয়ের সাথে জড়িত আছে মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা মূল্যায়ন, উপযোগীকরণ ও সম্প্রসারণ করার দায়িত্ব।

(১৫) বিধানিক দলিল বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৭৫-১৮২)

এই বিভাগের কাজ হল: মণ্ডলীর আইন সংহিতা বা ক্যানন ল' বিধানের অর্থ ব্যাখ্যা করা ও তা গ্রহণ করতে মণ্ডলীকে সাহায্য করা। আইন বিষয়ে অন্যান্য রোমান কুরিয়ার বিভাগ, ডাইয়োসিস/এপারখিয়েট(*Eparchie*), বিশপ সম্মিলনীকে সাহায্য প্রদান করে এই বিভাগটি তার কর্তব্য পালন করে।

(১৬) যোগাযোগ-মাধ্যম বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৮৩-১৮৮)

প্রৈরিতিক পুণ্যদপ্তরের সামগ্রিক যোগাযোগ মাধ্যমের অবকাঠামোগত ও কার্যক্রমের মধ্যে ঐক্য বিষয়ে দেখাশুনা করে। ডিজিটাল মিডিয়ার উন্নয়ন, তথ্যের ঐক্য এবং আন্তঃকার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবাহী ঘোষণা করার জন্য বিভাগ তার দায়িত্ব পালন করে।

(গ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরসমূহ (ধারা ১৮৯-২৫০)

ন্যায্যতা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ (ধারা ১৮৯-২০৪) : ন্যায্যতা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, এ্যাপোস্টলিক পেনিটেনসিয়ারি, এ্যাপোস্টলিক সিগনাতুরা বিষয়ক সুপ্রিম ট্রাইবুনাল, রোমান রোটা বিষয়ক ট্রাইবুনাল।

আর্থিক বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ (ধারা ২০৫-২২৭) : অর্থ বিষয়ক কাউন্সিল, অর্থ বিষয়ক সচিবালয়, মণ্ডলীর সম্পত্তির প্রশাসন, প্রধান অর্থ-নিরীক্ষকের কার্যালয়, গোপনীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত কমিশন, অর্থ বিনিয়োগকারী কমিশন।

দপ্তরসমূহ (ধারা ২২৮-২৩৭) : পোপের বাসগৃহ সংক্রান্ত, পোপের দ্বারা অনুষ্ঠিত উপসনা-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত, পোপের নির্বাচনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কার্ডিনাল কামেরলেঙ্গো বিষয়ক।

অন্যান্য বিষয় (ধারা ২৩৮-২৫০) : মাণ্ডলিক উকিলবর্গ সম্পর্কিত, পোপের পুণ্য-দপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে নির্দেশনা।

৥ গ ৥ মণ্ডলীর ২০২৫ বর্ষপূর্তির জুবিলী ও পুণ্যবর্ষ বিষয়ক উপস্থাপনা (৩০ আগস্ট)

জুবিলী সব সময়ই জনগণের একটি ঘটনা বলে পরিচিত। পোপ অষ্টম বনিফাস ১৩০০ খ্রিস্টাব্দকে পুণ্যবর্ষ হিসেবে প্রথমবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা এসেছে রোমীয় জনগণের চাহিদা থেকে। জনগণ চেয়েছিল পোপের পূর্ণ ক্ষমা, ঈশ্বরের দয়া এবং “পোপের পূর্ণ দণ্ডমোচন”। পরবর্তীতে ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পোপ দ্বিতীয় পল প্রত্যেক ২৫ বছর অন্তর অন্তর “পুণ্য দ্বার” উন্মোচন এবং পিতর ও পলের সমাধিতে তীর্থ করার ব্যবস্থা রোমে প্রচলিত হয়েছিল।

ধারণা করা হচ্ছে যে, বর্তমানকালের পরিস্থিতিতে আগামী ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ জুবিলী হবে মণ্ডলীর জন্য পালকীয় একটি বিশেষ অনুগ্রহের মুহূর্ত যখন খ্রিস্টবিশ্বাসী জনগণ তাদের বিশ্বাস, লোকভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের এক সুবর্ণ সুযোগ পাবে। অবশ্যই এই জুবিলী হতে হবে সঠিক ধর্মশিক্ষার আলোকে।

সাম্প্রতিক জগতের অবস্থা সর্বক্ষেত্রে যদিও শুভ নয় তথাপি এ অবস্থা তীর্থের পরিপন্থী নয়, কেননা তীর্থ সবসময় ‘প্রত্যাশা’ জাগ্রত করে। বর্তমান কালের সকল নেতিবাচক পরিস্থিতিতে একমাত্র প্রত্যাশাই পারে সকল অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে। এই প্রসঙ্গে প্রবক্তা ইসাইয়ার কথা স্মরণ করতে পারি: “সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ, আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না; কারণ প্রভুই আমার বল ও শক্তি, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ” (১২:২)।

পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জুবিলীর জন্য যে মূলভাব বেছে নিয়েছেন তা হল: “আশার তীর্থযাত্রী”। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: “যে আশা আমরা দান রূপে পেয়েছি তা উজ্জীবিত করতে হবে, নতুন শক্তি ও নিরাপত্তা লাভের জন্য অপরকে সাহায্য করতে হবে, যেন তারা ভবিষ্যতের দিকে উন্মুক্ত চিন্তে তাকাতে পারে, তারা যেন পেতে পারে ভরসাপূর্ণ হৃদয় ও দূরদর্শী দর্শন। আসছে জুবিলী প্রত্যাশার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, নবায়ন ও নব জন্মের জন্য ভরসা জাগাতে পারে, যা আমরা কতো জরুরিভাবে বাসনা করছি। এ কারণে আমি জুবিলীর মটো হিসেবে বেছে নিয়েছি: ‘আশার তীর্থযাত্রী’।”

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যথার্থই সমীচীন যে, ২০২৫ খ্রিস্ট বর্ষটি হবে ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিসীয় মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি। এই স্মরক-অনুষ্ঠান আন্তঃমণ্ডলিক একটি ভাব দেবে, কেননা এই মহাসভাটি খ্রিস্টতত্ত্ব বিষয়ক বিশ্বাসমন্ত্র মণ্ডলীতে প্রথমবারের মতো চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল যা আজ পর্যন্ত সর্ব খ্রিস্টবিশ্বাসীদের একের চিহ্ন হয়ে আছে। জুবিলী বর্ষে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করবে।

“আশার তীর্থযাত্রী” মূলভাবকে ঘিরে জুবিলী হবে তিন বছর ব্যাপী। ইতোমধ্যে “মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ, শাখা-ক” তিন বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মটো ও লোগো নির্ধারিত হয়েছে; জুবিলী-সঙ্গীত রচিত হয়েছে; যুবাদের দিকে তাকিয়ে “ডিজিটাল সংস্কৃতি”তে প্রবেশ করার প্রথম উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে; ডিজিটাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে কীভাবে তীর্থযাত্রী হওয়া যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পোপ মহোদয় আগামী বছর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের স্বর্গারোহন পর্ব দিনে (২১ মে), সাধু পিতরের মহামন্দিরে “পুণ্যদ্বার” উন্মুক্ত করে আনুষ্ঠানিক ভাবে জুবিলী ঘোষণা করবেন। এর পরপরই প্রত্যেক ডাইয়োসিসে কাথিড্রাল গীর্জার দ্বার উন্মোচিত হবে।

২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ: দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ৬০ বছর পূর্তিতে, ভাটিকান মহাসভার শিক্ষার পুনঃআবিষ্কার করার পরিকল্পনা রয়েছে, কেননা মণ্ডলীতে এখনও সেই শিক্ষা অনেকটাই অনাবিষ্কৃত হয়ে আছে। এই বছরে বিশেষ করে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার চারটি সংবিধান অধ্যয়ন করা হবে নির্দেশিত সহায়িকার মাধ্যমে।

২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ: উৎসর্গ করা হবে প্রার্থনা-বর্ষ হিসেবে। “প্রভুর প্রার্থনা”র উপর ভিত্তি করে বছরটি পালনের জন্য সহায়িকা প্রদান করা হবে।

২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ: তীর্থ যাত্রা, সমন্বিতভাবে রোমান কুরিয়ার বিভিন্ন বিভাগ জুবিলী বর্ষের জন্য সাধারণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতি করবে, যেখানে থাকবে রোম নগরীতে বিভিন্ন দল বা শ্রেণির জন্য তীর্থযাত্রা। তীর্থযাত্রা শুধু রোমে অনুষ্ঠিত হবে তা নয়। প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলী, তার আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসারে, নিজস্ব ভাষা ও প্রতীক-চিহ্নের মাধ্যমে জনগণ প্রকাশ করবে তাদের খ্রিস্টবিশ্বাস, তারা সাক্ষ্যদান করবে এবং উৎসব-উদ্‌যাপন করবে।

পরিশেষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের উক্তি উদ্ধৃত করে বলি : “জুবিলী সবসময়ই এমন একটি ঘটনা যা মণ্ডলীর জন্য আধ্যাত্মিক, মাণ্ডলিক এবং সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম পঁচিশ বছর পূর্তি যতোই এগিয়ে আসছে ততোই আমরা আহ্বান পাচ্ছি প্রস্তুতিপর্বে প্রবেশ করতে যেন খ্রিস্টান জনগণ পুণ্যবর্ষের পালকীয় বিভিন্ন দিকের অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হয়। জুবিলীর আধ্যাত্মিক দিক, যা আমাদেরকে মনপরিবর্তন করতে আহ্বান জানায়, তা যেন আমাদের সামাজিক জীবনের মৌলিক দিকগুলো সম্পৃক্ত হয়ে জীবনের সামগ্রিকতার অঙ্গভূক্ত হয়। যে-জগত ঈশ্বর আমাদের হাতে চাষাবাদ ও রক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেখানে আমরা যেন সবাই তীর্থযাত্রী রূপে উপলব্ধি করি; আমাদের যাত্রাপথে সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং এই পৃথিবী যে আমাদের সবার অভিন্ন বসতবাটি – এই কথা ধ্যান করতে আমরা যেন কোনদিনও ভুলে না যাই।”

রচনা – ৬: পোপ লিও-র আনুষ্ঠানিক কার্ডিনাল পরিষদের বিশেষ সভা

পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় কর্তৃক আহূত কার্ডিনালদের সভায় ২৪৫ জন কার্ডিনালদের মধ্যে ১৭৭ জন উপস্থিত ছিলেন (জানুয়ারি ৭-৮, ২০২৬ খ্রি.)। প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে পোপ মহোদয় বললেন, যেহেতু কার্ডিনালগণ তাঁকে নির্বাচন করেছেন সেহেতু বিশ্বজনীন মণ্ডলীকে পরিচালনা করার জন্যে তাঁকে যেন তাঁরা পরামর্শ দান করেন।

অধিবেশনে আগমনের জন্য পোপ মহোদয় কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে সকলকে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার জন্য আহবান জানান। সংলাপ ও পবিত্র আত্মার অবধারণ শক্তি দিয়ে আত্মা মণ্ডলীকে কী বলেন তা জানার জন্য সাহায্য করেন।

প্রথমেই পোপ মহোদয় বললেন: “আমি আপনাদের কথা শুনতে চাই”। আগামী দুই বছরের কর্মসূচি হিসেবে নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের উপর, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দুটো বিষয় বেছে নিয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার অনুরোধ করেন:

(ক) মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করা (*Evangelii Gaudium*, Pope Francis, 2013);

(খ) মন্ডলীর মন্ত্রণালয় বা রোমিও পুণ্য দণ্ডের সেবামূলক কার্যক্রম (*Predicate Evangelium*, Pope Francis, 2022);

(গ) সিনড-বিশিষ্ট মন্ডলী ও সিনডি পদ্ধতি (*Synod and Synodality*, Pope Francis, 2024);

(ঘ) উপাসনা-অনুষ্ঠান (*Sacrosanctum Concilium*, Vatican II, 1963)

উপরোক্ত বিষয় আলোচনার জন্য দুটো শ্রেণীর দল নির্ধারিত ছিল:

প্রথম শ্রেণী: ৯ টি ভাষাভিত্তিক দল, যার সদস্যরা ছিলেন কার্ডিনালগণ যারা বর্তমানে ধর্মপ্রদেশের বিশপ হিসেবে কার্যরত আছেন। এই দলগুলোর আলোচনার ফলাফল সাধারণ অধিবেশনে পাঠ করা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণী: ১২ টি ভাষাভিত্তিক দল, যার সদস্যরা ছিলেন বর্তমানে রোমীয় দণ্ডের কার্যরত কার্ডিনালগণ এবং অবসরপ্রাপ্ত বিশপগণ। তাদের দলীয় আলোচনার প্রতিবেদন সময়ের স্বল্পতার জন্য সাধারণ অধিবেশনে পাঠ করা হয়নি; তবে লিখিত আকারে পোপের কমিটির কাছে দেয়া হয়।

একুশটি দলের মধ্যে আলোচনা করার পর অধিকাংশ কার্ডিনালগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চারটির মধ্যে দুইটি বিষয় বেছে নিয়েছেন:

(ক) সিনোড- বিশিষ্ট মন্ডলীর ভাবধারা ও পদ্ধতি ।

(খ) মঙ্গলবার্তা ঘোষণা ।

তবে অন্য দুটি বিষয়: উপসনা-অনুষ্ঠান ও রোমান কুরিয়া বা কার্যনির্বাহী দণ্ডের সংস্কার -- নির্ধারিত দুটো বিষয়ের সাথে জড়িত থাকবে ।

নির্ধারিত দুটি বিষয়ের উপর প্রত্যেকজন কার্ডিনাল দলের মধ্যে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন, অন্যের কথা শ্রবণ করেন, নীরবতা ও প্রার্থনায় পবিত্র আত্মা কী বলেন তা শ্রবণ করার পর আবারও কথা বলার সুযোগ পান যাতে সর্ব সম্মতিক্রমে দলের রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারেন ।

প্রথম শ্রেণীর ৯ টি দলের রিপোর্ট সাধারণ অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ১২ টি দলের লিখিত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয় ।

সিনোড-বিশিষ্ট মন্ডলী শুধু আলোচনার বিষয়বস্তুই ছিলনা, বরং এটা ছিল আলোচনার পদ্ধতিও । এই পদ্ধতি অনুসারে গোটা সভার কার্যক্রম পরিচালিত হয় ।

দলের রিপোর্ট এবং মুক্ত আলোচনায় কয়েকজনের মন্তব্য শোনার পর পোপ মহোদয় উপসংহার স্বরূপ সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ।

পোপ মহোদয় সমাপনী অধিবেশনে ঘোষণা দিলেন যে, প্রতি বছর, সাধু পিতর ও পলের পর্ব ঘিরে ২৭-২৮ জুন কার্ডিনালদের সঙ্গে এ ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হবে ।

কার্ডিনালদের সভার সময়ে প্রায় সবদা পোপ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন । অধিবেশনের আগে-পরে, বিরতির সময় কার্ডিনালদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন ।

এই দুই দিনে পোপ মহোদয়ের সাথে আমার চারবার সাক্ষাৎ ও কথা বলার সুযোগ হয়েছিল । একবার প্রায় দশ মিনিট বাংলাদেশ সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ হলো । ৮ জানুয়ারি আমার যাজকীয় অভিষেকের ৫৪তম বার্ষিকী থাকায় মাথা পেতে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করার ভাগ্য হলো । পোপ মহোদয়ের আমন্ত্রণে কার্ডিনালগণ একসঙ্গে দুপুরের ভোজসভায় তাঁর সাথে যোগ দিলেন ।

সংক্ষিপ্ত আকারে এই দুই দিনে আমার উপলব্ধি হল: পোপ মহোদয়ের নম্রভাব, অন্যের কথা শুনতে, এমন কি ব্যক্তিগতভাবে কার্ডিনালদের কাছ থেকে মতামত জানতে আগ্রহী; কার্ডিনালদের সাথে একসঙ্গে যাত্রা ও কাজ করতে উদ্যোগী । মন্ডলীর মধ্যে যেন কোনো অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা না আসে তার জন্য পোপের আবেদন; মণ্ডলীর কাজ শুধু নয়, মণ্ডলীর কার্ডিনাল, বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী এবং ভক্তজনগণ যেন খ্রিস্টের

সাথে এক হয়ে চলাটা যেন তাদের আধ্যাত্মিকতা হয়; সেটাই যেন মঙ্গলবার্তা হয়ে অপরকে আকর্ষণ করে। সেটাই হবে আমাদের সবার জন্য আনন্দময় মঙ্গলবার্তা ঘোষণা। খ্রিস্টের সাথে ও ভাইবোন মানুষের সাথে এক হয়ে পথচলা হবে আমাদের আধ্যাত্মিকতা এবং সেই সাক্ষ্যদানই হবে মণ্ডলীর মঙ্গলবার্তার আনন্দবার্তার ঘোষণা করা।

পরিশেষে পোপ মহোদয়ের সাথে একাত্ম হয়ে, মণ্ডলীর সর্বক্ষেত্রে এবং তার সকল সেবা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসহ সিনোড পদ্ধতিতে গড়ে ওঠে।

সিনোড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর ভাবধারা ও প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে:

- (ক) যিশুর সঙ্গে একত্রে পথচলা;
- (খ) অন্যের সাথে একসঙ্গে বা সমবেত ভাবে যাত্রা করা, পথচলা; যাদের মতামত জানতে চাই তাদের সাথে একত্রে বসা, সংলাপ করা, আলোচনা করা।
- (গ) প্রত্যেকে প্রত্যেকের কথা ও মতামত মনোযোগের সঙ্গে খোলামন নিয়ে শ্রবণ করা;
- (ঘ) নির্দিষ্ট বিষয়ে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবার কথা শোনার পর ধ্যান ও প্রার্থনায় ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা শ্রবণ করা, পবিত্র আত্মার শক্তিতে তিনি কী বলেন তা শ্রবণ করা।
- (ঙ) নিরবতা ও ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী ও পবিত্র আত্মা কী চান, সেই কথাগুলো আবার ব্যক্ত করা। সংক্ষেপে একটা-দুইটা বিষয় উল্লেখ করা।
- (চ) সবার কথা শোনার পর পরিচালক দলের সম্মতিক্রমে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে সম্মত হয়ে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন।
- (ছ) কাজে পরিণত করার জন্য সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

तुलना- १ : CLERICALISM: UNDERSTANDING AND REMEDIES

Introduction

1. Catholic Church faces at present a crisis especially in

- Western World: Canada, USA, Europe, Australia, Chile, etc.
- Asia, particularly in India

2. Crisis is: Sexual Abuse of the minors and vulnerable and its Cover-up.

- Sexual abuse of minors (under 18) is a crime in the eyes of state laws and Church laws.
- Priests, Bishops, Cardinals and also Religious are involved in the abuse
- Media plays a big role
 - (a) Positive: unveiling the heinous immoral activities of the clergy
 - (b) Negative: Opinion against the Church, anti-Church position
 - (c) Unfolding of the crimes done in the long past.

3. Reasons: Variety of motivations

- (a) Actual presence of the crime and the cover-up of the information
- (b) Anti-Catholic Church attitude by the secularized world and other denominations
- (c) Questioning the moral authority of the Catholic Church, questioning the claim of being voice of the conscience.
- (d) Against the vow or promise of Celibacy

4. Dilemma in the Church in the Crisis

- (a) Admission of truth, sinfulness, responsibility, accountability, transparency.
- (b) Gospel of love, mercy and forgiveness to the victims and to the perpetrators

5. Church's Remedies:

- (a) Follow the procedures given by Rome and Local Church to deal with the case
- (b) Zero tolerance for crime
- (c) Listening to the victims is the first step and provide all the assistance necessary to come out of the broken life: counseling, financial assistance, rehabilitation, etc. not to cover-up the truth.
- (d) Listen to victimised and give the care needed without justifying his/her acts.

6. Clericalism lies at the bottom of the crisis (many say)

- (a) Clericalism: What is it? Derives from the word cleric.
- (b) Clericalism is an attitude which can be present among the clerics, religious, even lay people.
- (c) It is an attitude to divinize worldly and secular powers, authority, position, activities, decisions, etc.

Examples:

- no one should question my power and authority because I am a priest;
- I am a priest why should I give accounts; I am not stealing.
- Challenge and questions by others considered as anti-church attitude
- Afraid to dialogue but shows his power in pulpit (wrong use of pulpit).
- "Culture of Silence" is misused with respect, reverence, obedience, faithfulness, etc.

7. What are the areas where clericalism or clerical attitude is manifested? Need to identify the areas.

8. Scandals in the Church

- a) Jesus says: If anyone causes one of these little ones to stumble, it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and to be drowned in the depths of the sea. (Mt 18:6)

- b) Scandals have different forms: abuse committed by Priests and Religious may cause laity to loose faith, loose moral authority of the Church, pastoral authority of the Church, code of silence, “creating the scandal” is more scandalous that publication of it in media, Church not serious in seeking truth, rather covering up of the truth, not denunciation of injustices, silencing the victims by power of threats and money, etc.

9. Examples of Testimonies and Scandals

- a) Scandals of Cardinals, Bishops, Priests in many countries
- b) Scandal of Cardinal McCarrick and Testimony of Cardinal Donald Weurl, Washington DC as shepherd of Church, experience of disunity in the Church; long legal proof will affect the unity of the Church more; as shepherd and for unity of the Church Cardinal Donald resigns.
- c) Accusations on Cardinal Pell and the Suffering and pain of the Australian Church.
- d) Indian Church: scandals and testimony

10. Remedies of Clericalism and Scandals

- a) Recognition of the Baptismal call of the Christians
 - Dignity of life and vocation of Christians
 - Recognition of the Hierarchical (Sacred Orders) and charismatic gifts: Religious Institutes, Movements, Associations and Organizations by the priests, religious and lay people.
 - Role of the gifts of the Holy Spirit given to individuals to serve the community.
- b) Sacredness of Priesthood is the holiness of life
 - Spiritual life is the foundation; lack of it is the deep-rooted cause of Clericalism.
 - Church has sometimes failed in this; hence abuse of children, women, power, exclusivism, privileges, positions, prestige, etc.
 - Not all the services of priests are sacred
- c) Testimony of the Gospel Values: Life of the Gospel – Joy of the Gospel.

দ্বিতীয় ভাগ: কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বিষয়ক রচনা

রচনা-১: পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তাধারা অনুসারে ন্যায় ও শান্তি

এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের সকল রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে ন্যায় ও শান্তি বিষয়ে কিছু মৌলিক ধারণা তুলে ধরি এবং উক্ত বিষয় সম্পৃক্ত মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার কয়েকটি বিষয় মোটা দাগে উল্লেখ করে পরবর্তীতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের কিছু চিন্তাধারা উপস্থাপন করি।

৥ ১ ৥ ন্যায় ও শান্তি বিষয়ে মৌলিক ধারণা

একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলেছিলেন: “মানুষের পথ ধরে চলো, তাহলে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাবে; ঈশ্বরের পথ ধরে চলো, তাহলে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে”। এ কথার অর্থ হচ্ছে ন্যায্যতা শুধু মানবিকতার বিষয়, অর্থাৎ মানুষের পথ ধরে চলার বিষয় শুধু নয়, বরং ঈশ্বরের পথে চলারও বিষয়। আবার খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবন ও মঙ্গলবাণী ঘোষণা শুধু ঈশ্বরের পথে চলার বিষয় নয়, বরং ন্যায্যতা বা মানবিকতার পথে চলার বিষয়ও বটে।

ন্যায় বা ন্যায্যতা হচ্ছে চারটি মানবিক বা নৈতিক গুণের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান। অন্য তিনটির নাম হচ্ছে: সদিবেচনা বা বিচক্ষণতা, সৎ-সাহস এবং মিতাচার বা সংযম। তিনটি নৈতিক গুণের সাথে ন্যায্যতা সব সময় সাথী হয়ে পথ চলে।

ন্যায্যতার চারটি মূলনীতি রয়েছে: সমতা, নিরপেক্ষতা, ন্যায্য অধিকার, ন্যায়-পদ্ধতি, ক্ষতিপূরণ/পুনর্মিলনমূলক ন্যায্যতা।

(ক) ন্যায্যতা বিষয়ে সাধারণ ধারণা

(১) ন্যায় বা ন্যায্যতার অর্থ

ন্যায্যতা বলতে কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় বলা হয়েছে যে, ন্যায্যতা হচ্ছে একটি “মানবিক সদগুণ” বা “একটি নৈতিক গুণ – ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর যা প্রাপ্য তা ফিরিয়ে দেওয়ার অবচল ও অবিরাম ইচ্ছা। ঈশ্বরের প্রতি ন্যায্যতাকে বলা হয় ‘ধর্মের গুণ’। মানুষের প্রতি ন্যায্যতা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানব

সম্পর্কের মধ্যে মিলন স্থাপনের ইচ্ছা জাগ্রত করা, যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তি ও গণমঙ্গল সম্পর্কিত সমতা।” (কা.ম.ধ. ১৮০৭)

ন্যায্যতা হল প্রত্যেককে তার পাওনা দিয়ে দেওয়া। মানুষ হিসাবে যা প্রাপ্য সেটাই তার পাওনা। মানুষের পাওনাগুলোই হচ্ছে তার অধিকার, যাকে বলা হয় মানবাধিকার।

(২) ন্যায্যতার প্রকারভেদ:

- আইনসম্মত ন্যায্যতা: নাগরিকের কাছ থেকে রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য যা বিধিসম্মত করা হয়েছে।
- বিনিময়াত্মক ন্যায্যতা: যে-ন্যায্যতা ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সকল বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে বিধিসম্মত করা হয়ে থাকে।
- বন্টনাত্মক ন্যায্যতা: নাগরিকের প্রয়োজন ও অবদানের অনুপাত অনুসারে রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকের প্রাপ্য।
- সামাজিক ন্যায্যতা: উপরোক্ত ক্লাসিকাল প্রকারভেদের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে “সামাজিক ন্যায্যতা” নামে আরেক প্রকার ন্যায্যতা যুক্ত হয়েছে আর এই ন্যায্যতা সাম্প্রতিক কালে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। সামাজিক বিষয়সমূহের পরিধি অনেক ব্যাপক এবং সামাজিক ন্যায্যতার বিষয়গুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং সেখান থেকে উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধানের সঙ্গেও জড়িত।

(৩) অন্যায়কে দু'ভাবে চিহ্নিত করা যায়:

ব্যক্তিগত অন্যায়: একজন ব্যক্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া (উদাহরণ: চুরি করা, হত্যা করা, দুর্নাম করা, ইত্যাদি)

সামাজিক অন্যায়: এই বিষয়টা জটিল কারণ সামাজিক সাংগঠনিক ব্যবস্থা এর সাথে জড়িত আছে, যেমন: আইনকানুন, সামাজিক ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক নীতি-পদ্ধতি, ঐতিহ্যগত পদ্ধতি, পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

সামাজিক অন্যায় ব্যবস্থাকে “সামাজিক পাপ” বলা হয়। উদাহরণ: যৌতুক প্রথা, শিশুশ্রম, নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, কালো আইন, দারিদ্রতা, নিরক্ষরতা, নির্যাতন, দুর্নীতি, শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় আচরণ।

অন্যায় আচরণের ভিত্তি হচ্ছে মানব-অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা; একই মানব-পরিবারের সদস্য-সদস্যা হিসাবে প্রত্যেকের সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার আছে, সেই অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত থাকতে পারে না।

(৪) মানবাধিকারসমূহ:

যেহেতু অন্যায়তা হচ্ছে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত বা মানবাধিকার লঙ্ঘন, সেহেতু মানবাধিকারসমূহ উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক ও বাঞ্ছনীয়। মানবাধিকারসমূহ তিনটি ভাগে ভাগ করে উল্লেখ করা হল:

(ক) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ: বেঁচে থাকা, আইনের আশ্রয় নেয়া, ভোটদান, অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি, ন্যায়বিচার পাওয়া, বুদ্ধি-পরামর্শ নেয়া, সংঘ-সমিতি করা, নাগরিক দায়িত্বে অংশগ্রহণ করা, সমাবেশ করা, মতামত প্রকাশ করা, বিবেকের স্বাধীনতা, বসতি পরিবর্তন করা, ইত্যাদির অধিকার।

(খ) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ: সম্পত্তি অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা, কর্মসংস্থান, ন্যায় পারিশ্রমিক, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ, বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে মুক্তি (লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, পদ ও ক্ষমতা), শিক্ষালাভ, সুনাম রক্ষা, পরিবেশ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মত প্রকাশ ও তথ্য জানা, ইত্যাদির অধিকার।

(গ) বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর অধিকার: পরিবার, শিশু, কিশোর-কিশোরী, নারী, ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী, কর্মজীবী, প্রতিবন্ধী, আসামী, কয়েদী, অভিবাসী, দেশ ও জাতি, ইত্যাদির অধিকার।

(খ) শান্তি বিষয়ে সাধারণ ধারণা

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় শান্তি সম্পর্কে এই কথা বলে: “মানব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শান্তি। তবে শান্তির মানে শুধু যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয় এবং শুধু শত্রুপক্ষের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করাই নয়। ব্যক্তি মানুষের সম্পদ রক্ষা করা, মানুষের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ স্থাপন, ব্যক্তি ও জাতিগণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং নিরন্তর ভ্রাতৃত্বপ্রেমের অনুশীলন ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। শান্তির অর্থ হচ্ছে “সুখম ব্যবস্থা”। শান্তি হচ্ছে ন্যায্যতার কাজ এবং প্রেমের ফসল” (কা.ম.ধ. ২৩০৪)।

ন্যায্যতা ও শান্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক:

শান্তি হচ্ছে “পবিত্র আত্মার ফলস্বরূপ”, যাকে আবার “ভালবাসার ফলস্বরূপ” বলেও আখ্যায়িত হয়। পবিত্র আত্মা ন্যায্যতা ও ভালবাসার চালিকাশক্তি; এবং আত্মা সকল খ্রিস্টীয় ন্যায্যতার সংগ্রামকে সঞ্জীবিত করে। আবার বলা হয়: ভালবাসার প্রথম ধাপ হচ্ছে ন্যায্যতা; ভালবাসা ন্যায্যতার প্রাণ। পোপ ত্রয়োবিংশ বলেছিলেন “উন্নয়নের অপর নাম শান্তি”। শান্তি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ফল। ন্যায্যতা ব্যতীত শান্তি সম্ভব নয়;

ভালবাসা/ক্ষমা ব্যতীত ন্যায্যতাও সম্ভব নয়। “শান্তির জন্য ন্যায্যতা যেমন, ন্যায্যতার জন্য ক্ষমাও তেমনি অপরিহার্য।”

সাম্প্রতিককালে বিশেষভাবে পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তাভাবনায় এই ভাবটি সত্য হয়ে আসছে যে, ন্যায় যদি শান্তির ফল হয় তাহলে বর্তমানে এ কথা বলা যেতে পারে যে, শান্তি একাত্মতার বা সংহতির ফলস্বরূপ। শান্তির লক্ষ্য অর্জিত হবে যদি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বের ঐক্য ও বন্ধন আরও দৃঢ়তর হয়, মানব পরিবারে মানুষ যদি পরস্পরের সঙ্গে ভাইবোন হিসেবে জীবন যাপন করে।

শান্তির বিপরীত হচ্ছে: প্রথমত মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চনা; সম্পদ, ক্ষমতা ও ভোগের লিপ্সার কারণে অধিকার থেকে বঞ্চনা; দ্বিতীয়ত কোন্দল, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, সংঘাত, সহিংসা ইত্যাদি। শান্তির প্রকাশ ঘটে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুসম্পর্কের মধ্যে।

অন্যায়ের প্রতিকার: অন্যায়ের সামনে তিন ধরনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া হতে পারে:

- নিষ্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া: সাধারণত এটাই লক্ষণীয়;
- সহিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া: অন্যায়কারীরা যে কৌশল ব্যবহার করে ঠিক একই প্রকার কৌশল প্রয়োগ, যেমন: প্রতিশোধ, নিপীড়ন, শোষণ, সহিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ও কার্যকলাপ, যুদ্ধ, সংঘর্ষ, ইত্যাদি।
- সক্রিয় অহিংসামূলক প্রতিক্রিয়া: সমস্যা সমাধানে জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্য, ভালবাসা, ন্যায়ের শক্তি, সংলাপ, অহিংসাবাদ ও পদ্ধতি ও অন্যান্য কৌশল অবলম্বন করে।

॥ ২ ॥ মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ন্যায় ও শান্তি বিষয়ে পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তাধারা ও শিক্ষা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে, তাঁর পূর্বসূরী পোপ মহোদয়দের পরিচালনায় মণ্ডলীতে যে সামাজিক শিক্ষা গড়ে উঠেছে তা থেকে কোন ভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না। শুধু তাই নয়, বিগতকালের মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার সাথে পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষার ধারাবাহিকতা বিবেচনা করে এবং তাঁর নিজস্ব শিক্ষার নতুনত্ব ও অগ্রাধিকার সুস্পষ্ট ভাবে বোধগম্য করতে হবে।

মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার উৎস হচ্ছে পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক থেকে শুরু করে প্রেরিতদের রচনাবলী পর্যন্ত। আদি থেকে সেটাই ছিল মণ্ডলীর শিক্ষা; এই শিক্ষা আধুনিককালের নানাবিধ “সামাজিক প্রশ্ন”-এর প্রেক্ষাপটে পোপ ত্রয়োদশ লিও’র “রেক্রম নভারুম” বা “নতুন বিষয়” নামক বিশ্বজনীনপত্র দিয়ে সামাজিক শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে।

মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা মূলত হচ্ছে মণ্ডলী কীভাবে সমাজকে এবং সমাজের অবকাঠামো ও পরিবর্তন কীভাবে দেখে তারই প্রকাশ। মণ্ডলীর সকলে – যাজক, সন্ন্যাসব্রতী এবং ভক্তজনগণ – এই সামাজিক শিক্ষা প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে।

(ক) মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার কয়েকটি নীতি

প্রথমে, যুগ যুগ ধরে মণ্ডলী কোন কোন বিষয়ে এবং কী কী শিক্ষা দিয়ে আসছে তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় কয়েকটি শিরোনামে তুলে ধরছি:

- (১) **মানবজীবন এবং মানবব্যক্তির মর্যাদা:** এটাই মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার মূল ভিত্তি। আমরা সকল মানুষ ঈশ্বর থেকে আগত, ঈশ্বরের জন্য আমরা এবং ঈশ্বরের প্রকাশ আমরা। তাই আমাদের রয়েছে অলঙ্ঘনীয় মর্যাদা। এই মর্যাদার পরিপন্থী যা কিছু তা-ই অন্যায়। অন্যায় চিহ্নিত করতে এবং কীভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে তার মাপকাঠি এই নীতি।
- (২) **গণমঙ্গল:** গণমঙ্গল হচ্ছে সমাজের সেই সকল অবস্থা বা ব্যবস্থাপনা যা প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলকে আরও উন্নত ও সহজভাবে পূর্ণতা অর্জন করতে সাহায্য করে: সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ, সাংস্কৃতিক আচরণ, প্রশাসনিক অবকাঠামো, ইত্যাদি।
- (৩) **সম্পদের সর্বজনীন লক্ষ্য:** যা কিছু উত্তম ও জীবন রক্ষা করে তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে এবং তা সকল মানবজাতির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। এটাই হচ্ছে সমগ্র নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার প্রথম নীতি। প্রকৃতিগতভাবে প্রকৃতির প্রতি সবার অধিকার আছে দৈহিক জীবন-রক্ষা ও ভবিষ্যত জীবন-সম্ভাবনাকে বাস্তবমূর্ত করার জন্য। এই নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে সামাজিক শিক্ষার অন্যতম নীতি: ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন ও তত্ত্বাবধায়ন, যার আলোচনা পোপ ফ্রান্সিসের প্রসঙ্গে করা হবে।
- (৪) **অধঃস্তন কর্তৃপক্ষের অগ্রাধিকার নীতি:** উর্ধ্বতন পর্যায়ের কোন কর্তৃপক্ষ সেই সমস্ত কাজ করবে না, যে-কাজ অধঃস্তন কর্তৃপক্ষ দ্বারা যথাযথ ও ফলপ্রসূভাবেই সম্পন্ন করা যেতে পারে। অধঃস্তন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এর ব্যত্যয় ঘটালে অন্যায় বলে বিবেচিত হবে। এই নীতিকে “সহযোগীদের প্রতি শ্রদ্ধা-নীতি” বলেও অভিহিত।
- (৫) **একাত্মতা অথবা সংহতি:** মানুষ সামাজিক জীব; একা একা জীবনযাপন করতে পারে না; স্বভাবগত ভাবেই পরনির্ভরশীল; কেউ একা থাকে না, একা পাপ করে না, একা মুক্তি পায় না; আমার জীবনে অন্যেরা ঢুকে পড়ে এবং আমিও অন্যের জীবনে ঢুকে পড়ি। এই একাত্মতা শুধু প্রকৃতিগত নয়; বরং যা প্রকৃতিগত তা

মানবিক সিদ্ধান্তের ফলে নানা সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধন গড়ে তুলি বা তুলতে হবে।

- (৬) **দরিদ্রদের পক্ষ সমর্থন:** এই নীতি যিশুর শিক্ষাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সমাজে যারা দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত তাদের প্রয়োজন মেটানোই গণমঙ্গলের প্রথম কাজ। যুক্তরাষ্ট্রের বিশপগণ বলেছেন: “ধনীদের বাসনার পূর্বে দরিদ্রদের প্রয়োজন অগ্রাধিকার পাবে; মুনাফা লাভের আগে শ্রমিকদের অগ্রাধিকার; নিয়ন্ত্রণহীন শিল্পের প্রসারণের পূর্বে পরিবেশ সংরক্ষণের অধিকার।”

(খ) সামাজিক ন্যায্যতার প্রধান নীতিসমূহ

সামাজিক ন্যায্যতা হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যা যার বিষয়বস্তু হচ্ছে সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক সম্বন্ধে, এবং সম্পদ, সুযোগ ও সামাজিক বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে চিন্তা-ধারণা।

সামাজিক ন্যায্যতার প্রধান পাঁচটি নীতি হল:

- (১) **সামাজিক সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার:** প্রত্যেকে যেন সেই সমস্ত সামাজিক সুবিধা পেতে পারে যা মানবিক জীবনযাপন করার জন্য প্রয়োজন, যেমন, খাদ্য-পানীয়, বস্ত্র, আশ্রয়-গৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিৎসাবিনোদনের সুযোগ। বাস্তবে এই সব ব্যাপারে সমাজে অসম অধিকার রয়েছে।
- (২) **সামাজিক বৈষম্যহীনতা:** আপন প্রয়োজন অনুসারে সেই সমস্ত সুযোগ লাভ করা যাতে সবাই তার আপন চাহিদা পূরণ করতে পারে; এর অর্থ হচ্ছে বৈষম্যশূন্য এবং ন্যায়-ব্যবস্থা যেখানে পক্ষপাতদুষ্টতা নেই। বৈষম্যহীনতা ও সমতা এক নয়। সমতা হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য একই সুযোগ দেওয়া যাতে সবাই একই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।
- (৩) **সামাজিক অংশগ্রহণ:** সামাজিক অংশগ্রহণের অর্থ হচ্ছে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের কথা নিজে বলতে পারে, নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং নিজেদের জীবিকা ও জীবনের চাহিদা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারে।
- (৪) **সামাজিক বিভিন্নতা:** সমাজের বিভিন্নতা ও কৃষ্টিগত পার্থক্য স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন বিশেষ করে, যারা নীতি প্রণয়ন করে তাদের জন্য, কারণ

তারা বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠীর বিভিন্নতা বিবেচনায় রেখে নীতি প্রণয়ন করে। এ কারণে সমাজের প্রান্তিক, সুবিধা-বঞ্চিত ও পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেওয়া সামাজিক ন্যায্যতার দাবি। উদাহরণস্বরূপ, যে সমাজে জাতি, লিঙ্গ, নৃগোষ্ঠি, পুরুষ-নারী, বয়স ও অন্যান্য বিশেষ বিষয়ে সমাজে চলমান আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে সেখানে বিভিন্নতা বিবেচনা করা আবশ্যিক।

(৫) সামাজিক মানবাধিকার: সামাজিক ন্যায্যতাও সকল নীতি ও ধারণার মৌলিক বিষয়। মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায্যতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও একে অন্যের অস্তিত্বের কারণ। মানবাধিকার সেই সমস্ত সমাজের ভিত্তিমূল, যে-সমাজ ব্যক্তি, সরকার ও সংগঠনের নাগরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কৃষ্টিগত, আইনগত ব্যক্তি অধিকারকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি এই অধিকার সংরক্ষণ করে না তারা সমাজের কাছে দায়বদ্ধ।

॥ ৩ ॥ সামাজিক শিক্ষা বিষয়ে পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তাধারা

পোপ ফ্রান্সিস ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে পোপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি বেশ কয়েকটি বিশ্বজনীনপত্র এবং প্রেরিতিক প্রেরণাপত্র প্রকাশ করেন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সামাজিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট এবং বর্তমান প্রবন্ধের সাথে প্রযোজ্য তিনটি দলিল নিম্নে উল্লেখ করা হল। পোপের এই দলিল তিনটি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। এই দলিলগুলোতে পোপ ফ্রান্সিসের উল্লেখিত ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক ধারণা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল।

(ক) Pope Francis, *Evangelii Gaudium*– “The Joy of the Gospel” 2013, অনুবাদ: “মঙ্গলবার্তার আনন্দ”, অনুবাদ-সম্পাদক: সিস্টার শিখা লিটিশিয়া গমেজ, সিএসসি-সহ অন্যেরা, ঢাকা, ২০১৪ খ্রি.

মণ্ডলীর মিশন হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা। মঙ্গলবাণী ঘোষণা সমস্ত খ্রিস্টবিশ্বাসীর দায়িত্ব; আধুনিককালে মঙ্গলবাণী ঘোষণার জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ ও বাধা রয়েছে; এবং কীভাবে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা যেতে পারে তার নির্দেশ পোপ মহোদয় দিয়েছেন। মণ্ডলীর ভেতরে প্রত্যেককে মিশনারী হয়ে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করে মণ্ডলীকে রূপান্তর ও নবায়ন করতে হবে।

মণ্ডলীর বাইরে আধুনিক সমাজে, সামাজিক বিষয় ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে, দরিদ্রদের পক্ষ নিয়ে, গণকল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে হবে।

মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে হলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া এবং যিশুর সাথে একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ও সম্পর্ক সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যিক। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা যিশুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ এবং যিশুর দেওয়া পরিত্রাণ গ্রহণ করে, পাপ, দুঃখ, অভ্যন্তরীণ শূণ্যতা ও নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেয়ে তারা মঙ্গলবাণীর আনন্দ উপলব্ধি করবে।

(খ) Pope Francis, *Laudato Si'* – “*Praised Be to You*” –

Encyclical Letter on the Care for Our Common Home, 2015.

তোমার প্রশংসা হোক – আমাদের অভিন্ন বসবাটির যত্ন, কারিতাস
বাংলাদেশ, ২০১৬ খ্রি.

(১) লাউদাতো সি – বিশ্বজনীনপত্রের সারসংক্ষেপ

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ১৮ জুন ২০১৫ খ্রি. “হোক তোমার প্রশংসা” (লাউদাতো সি) শীর্ষক একটি সর্বজনীনপত্র প্রকাশ করেছেন। এ পত্রের মূল বিষয় হচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশ; পত্রটি ধরিত্রী নামক “সর্বসাধারণের আবাস-গৃহ”-এর যত্ন নেওয়ার পথদিশা। বিশ্ববাসী এবং খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলের উদ্দেশ্যে তিনি এ পত্রটি লিখেছেন। পরিবেশের উপর এ পত্রটি মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার অংশবিশেষ এবং খুবই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধরিত্রীর প্রতি সকল অন্যায়ের ঘোর সমালোচনা, প্রতিবাদ এবং সমাধান প্রস্তাব করেছেন।

যে-পৃথিবীতে আমাদের নিবাস, যে-এলাকায় আমাদের অবস্থান, যে-বসতবাড়িতে আমরা বাস করি, সেখানকার প্রকৃতি কত অপব্যবহার ও কত দুর্ব্যবহারে আক্রান্ত। আমাদের আশেপাশের প্রকৃতি আজ চিৎকার করে বিলাপ করছে; সৃষ্টি “প্রসব বেদনায় গুমরে মরছে” (রোমীয় ৮:২২)। প্রকৃতির মধ্যে দেখি বায়ু দূষণ; বন-বৃক্ষ নিধনে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড; ত্রুটিপূর্ণ ও মাত্রাতিরিক্ত যানবাহন এবং নির্গত হচ্ছে কালো ধোঁয়া। পানি দূষণের ফলে পানীয় জলের অভাব; পানির যতটাই দুর্গন্ধ ততটাই বিবর্ণ; অন্যদিকে গৃহস্থালী বর্জ্য, শিল্পবর্জ্য, মাত্রাতিরিক্ত সার ব্যবহার, জলাবদ্ধতা, প্রয়োজনমতো পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থাপনার অভাবসহ নানাবিধ কারণে প্রতিনিয়ত পানি দূষিত হচ্ছে। খাল-বিল-ডোবা-নালা ও জলাশয় দিন দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে; ফলে পানি-ধারণের ক্ষমতা ধরণী হারিয়ে ফেলছে; প্রকৃতিতে জীব-বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে; ঘরে-ঘরে, কলকারাখানা-প্রতিষ্ঠানে, হাটে-মাঠে-বাজারে, গ্রামে-শহরে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে শব্দ দূষণে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে; অপরিবর্তিত নগরায়ন, আবাসিক এলাকায় শিল্পের প্রবেশ, সুন্দর বসতবাড়ি বস্তিতে পরিণতি, ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসন, ইত্যাদির মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে পরিবেশের বিপর্যয়। তাই প্রকৃতি কাঁদছে, সজোরে আর্তনাদ করছে।

এ অবস্থা প্রকৃতির প্রতি মানুষের বড়ো অন্যায়। জলবায়ু-ন্যায্যতা বিশ্বে নিশ্চিত করতে হবে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার, স্থানীয় সমাজ, জাতি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলকে আহ্বান জানান যেন আমরা সবাই সৃষ্টির আর্তনাদ শ্রবণ করি, প্রকৃতির সৌন্দর্য রক্ষা ও যত্নের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করি। তিনি বলেন সবাই মিলে, সর্বসাধারণের এই বসত-বাড়ি পৃথিবীটাকে রক্ষা করতে মানবজাতি এখনও সক্ষম।

সৃষ্টি ঈশ্বরের মঙ্গলবাণী। এ প্রসঙ্গে পোপ মহোদয় বলেন যে, ঈশ্বর আমাদের মুক্তিদাতা ও পরিব্রাতা; আবার তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আদিপুস্তকে সৃষ্টির বিবরণীতে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের জীবন ঈশ্বর, প্রতিবেশী ও প্রকৃতির সাথে সম্পর্কময় জীবনের উপর ভিত্তি করে গড়া। (দ্র: আদিপুস্তক ১-৩ অধ্যায়)

পোপ মহোদয় বলেন যে, আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী আমাদের আছে ত্রিমুখী খ্রিস্টীয় দায়িত্ব : সৃষ্টি ও প্রকৃতির প্রতি, সৃষ্টিকর্তার প্রতি এবং মানুষের প্রতি, বিশেষভাবে দরিদ্র মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আমাদের বিশ্বাস-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঈশ্বরপ্রেম ও প্রতিবেশীপ্রেমের সাথে প্রকৃতিপ্রেম দশ আজ্ঞারই অবিচ্ছেদ্য দাবি। প্রকৃতির উপর যে কোন ধরনের আক্রমণ মানব-মর্যাদার পরিপন্থী। আবার অন্যদিকে প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের হৃদয়ে যদি না থাকে মমতা, কোমলতা ও ভাবনা, তাহলে প্রকৃতিকেও আমরা প্রকৃত অর্থে ভালবাসতে পারি না।

পরমেশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি বললেন: “তোমরা বশীভূত কর।” এ কথা দিয়ে ঈশ্বর মানবজাতিকে আহ্বান করলেন যেন মানুষও ঈশ্বরের মতো সৃষ্টিকে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করে। ঈশ্বর আমাদের হাতে সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যেন আমরা বিশ্বস্ত কর্মচারী হয়ে সেই দায়িত্ব পালন করি।

পোপ মহোদয় আরও বলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনেকভাবে মানুষের উন্নয়ন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা যদি সকল ব্যক্তি ও প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর সম্পদ বিনিয়োগ না করা হয়, তাহলে সেই ব্যবসা অযৌক্তিক, অন্যায় ও মানবতার পরিপন্থী।

বর্তমান পরিবেশের দূরাবস্থা ও বিপর্যয়ের মূল কারণে রয়েছে মানুষ। পরিবেশের কথা না ভেবে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির কথা ভেবেছে। যার ফলে এসেছে প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে মারাত্মক বিপর্যয়। মানুষকে এর বিরুদ্ধে বিবেকী সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিকার করতে হবে।

পরিবেশ রক্ষার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি হিসেবে পোপ মহোদয় “সমন্বিত পরিবেশ”, অর্থাৎ পরিবেশকে সামগ্রিক বা অখণ্ডভাবে দেখার নীতির বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রকৃতি ও

পরিবেশকে মানবতা, পরিবার ও নগরায়ন, প্রভৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল মাত্র বাসের স্থান বলে বিবেচনা করা যাবে না। “সমন্বিত পরিবেশ” ভাবনা হতে হবে ন্যায়বিচারের নতুন নীতি।

মানব পরিবেশ “গণমঙ্গল” নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে যারা দরিদ্র অবস্থায় পড়েছে তাদের প্রতি আমাদের ভালবাসায় অগ্রাধিকার দেয়া ন্যায্যতার দাবি।

“সমন্বিত পরিবেশ” নীতি নিত্যদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার সামর্থ্য মানুষের আছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি, বিভিন্ন দল ও সংস্থার সৃজনশীলতা ও উদারতা লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয়। তারা প্রকৃতির বিরূপ আচরণ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে, উৎপাদনশীল হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে, অনেক অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সফল-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক সর্বজনীনপত্রটি অধ্যয়ন করতে হবে। এই পত্রের আলোকে পরিবেশ বিপর্যয়ের সঠিক অবস্থা জানতে ও তার লক্ষণগুলো বুঝতে এবং তার মূল কারণগুলো আবিষ্কার করতে হবে। বিভিন্ন সফলতার উদ্যোগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং সচেতনতা ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিবেশ বিপর্যয়ের অবস্থা জানা ও বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের প্রয়োজন আলাপ-আলোচনা, একমত্য পোষণ ও বাস্তব কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা যেখানে আমরা ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে প্রত্যেকে জড়িত হব। এ ব্যাপারে আমাদের সদিক্ষা ও নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে পোপ মহোদয় নির্দেশ দেন।

পোপ মহোদয় নির্দেশ দিয়ে আরও বলেন যে, পরিবেশ রূপান্তরের জন্য প্রথমতঃ প্রয়োজন অন্তরের পরিবর্তন। তাই অন্তরের পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে আর তার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিটি শিক্ষালয় জড়িত থাকবে, যেমন পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ মাধ্যম, ধর্মশিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

পরিবর্তনের সূচনা হবে “নতুন জীবনযাপন পদ্ধতি” গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। প্রতিদিনের জীবন-অভ্যাসে আসবে পরিবর্তন, যেমন: জল ব্যবহারে পরিমিত, বায়ু ও শব্দ দূষণের বিপরীতে কার্যকরী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ; বৃক্ষরোপন ও যত্ন, যত্রতত্র বর্জ্য না-ফেলানো, জৈবসারের ব্যবহার, অপচয় ও ‘ফেলে-দেওয়ার’ আচরণ বর্জন; বাড়ী ও জমির সীমানা-নির্ধারণ, গৃহ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং জমিজমা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পরিবেশবান্ধব মনোভাব এবং প্রতিবেশীর প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ প্রেম; প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ, ভোগ ও গচ্ছিত করার অভ্যাস বর্জন; জিনিসপত্রের সঠিক ব্যবহার, পুনঃব্যবহার ও নতুনভাবে ব্যবহারের অভ্যাস; বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও অপচয়রোধ।

পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, আমাদের থাকবে একটা *ধ্যানী মনোভাব*: প্রকৃতির সবকিছুকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার মনোভাব; আমার নয়, সবই পেয়েছি পরমেশ্বরের কাছ থেকে -- এরূপ ভাব। তাছাড়া ঈশ্বর তো আমাদের দিয়েছেন পরিবেশ বিশ্লেষণ করা ও পরিবর্তন করার সক্ষমতা। ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের দেবেন সৃজনশীলতা এবং নব উদ্যম।

স্বাধীন ও সচেতনভাবে যখন আমরা সংযমী জীবন যাপন করি তখন অন্তরে উপলব্ধি হয় গভীর আনন্দ -- *মঙ্গলবাণীর আনন্দ*। নতুন করে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা একে অন্যের জন্য প্রয়োজন, অন্যের প্রতি আছে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। ভালো হওয়া, ভাল করা ও ভালো থাকার একটা মূল্য আছে।

পোপ মহোদয় প্রতিদিনের খ্রিস্টীয় জীবন-সাধনায় নিয়মিত *মন-পরীক্ষার* সাথে আরেকটি মাত্রা যোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা যেন প্রতিদিন গভীরভাবে চিন্তা করি যে, আমরা ঈশ্বরের সাথে, নিজের ও অন্যের সাথে এবং সৃষ্টি ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলনসাধনায় জীবনযাপন করি। আসিসির *সাধু ফ্রান্সিস* আমাদের যাত্রাসঙ্গী হয়ে থাকুন, কেননা তিনি প্রকৃতিপ্রেম ও দরিদ্রদের প্রতি ন্যায্যতা, সামাজিক কর্তব্যনিষ্ঠা ও অন্তরীণ শান্তির আদর্শ। *কুমারী মারীয়া*, যিনি তাঁর সন্তানের যত্ন নিয়েছেন সেই একই মাতৃত্ব ও বেদনা নিয়ে তিনি আমাদের যত্ন নিন। *সাধু যোসেফ*, মণ্ডলীর যিনি প্রতিপালক, তিনি আমাদের শিক্ষা দিন যাতে আমরা উদারতা ও কোমলতার সাথে আমাদের হাতে ন্যস্ত এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারি।

পরিশেষে পোপ মহোদয়ের কথার সাথে একাত্ম হয়ে *প্রার্থনা* করি: “হে পবিত্র আত্মা, এই ধরণীকে পিতার ভালবাসায় পরিচালনা কর; প্রসববেদনাতুর সৃষ্টির সঙ্গে তুমি পথ চল; আমাদের হৃদয়ে স্থান নাও, যাতে যা কিছু মঙ্গল তা যেন আমরা করতে পারি। “তোমার প্রশংসা হোক”!

(২) লাউদাতো সি-এর আলোকে পর্যালোচনা

বিজ্ঞানের নানাবিধ আবিষ্কারের ফলে মানবজাতি যে সৃজনশীলতা ব্যবহার করে তা ঈশ্বর প্রদত্ত। বিজ্ঞান উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা অতি সাম্প্রতিককালে ডিজিটাল বিপ্লব আনতে সক্ষম হয়েছে। একদিকে, আমরা প্রতিদিন অসংখ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভর করি- বিদ্যুৎ, উড়োজাহাজ, যানবাহন, তথ্যপ্রযুক্তি, জীবপ্রযুক্তি, ইত্যাদি যা আমাদের জীবনমানে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। অন্যদিকে, আমরা যদি মানব ইতিহাস বিশ্লেষণ করি, তবে দেখতে পাই যে, আমাদের জীবনযাত্রা অনেক জটিল হয়ে গেছে, প্রযুক্তি-নির্ভর জীবনে আমরা অতি অভ্যস্ত এবং আসক্ত। মানুষের অতিমাত্রায় ভোগবাদী মনমানসিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা এবং উদাসীনতার কারণে সৃষ্টি-প্রকৃতি বন-বৃক্ষ নিধন, বাতাসে অতিমাত্রায় কার্বন ডাই

অক্সাইড, কালো ধোঁয়া, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ ও দুর্গন্ধময় জল, জলাবদ্ধতা, খাল-ডোবা নিশ্চিহ্ন হওয়া, শব্দ দূষণ, জীব বৈচিত্র্যহ্রাস, অনাবৃষ্টি, আবার কোন কোন স্থানে অতিবৃষ্টি-বন্যা, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব গোটা মানবজাতি ও প্রকৃতিকে বিপর্যয় ও অকল্পনীয় বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমন পরিত্যক্ত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধরিত্রী “যেন প্রসববেদনায় নিদারুণ কাতরাচ্ছে” (রোমীয় ৮:২২)।

গোটা বিশ্বে ধনী-গরীবের ব্যবধান, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দেখা যায় তার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জীবনমানে। সমাজে বেশীরভাগ মানুষই নিজেদের সুবিধার দিকে নজর দেয় বেশি এবং প্রযুক্তিগত আরাম-আয়েশ অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মানবের যে গুণাবলি ও আত্মসংযম লালন করা প্রয়োজন, আমরা তখন সেখান হতে দূরে সরে যাই। অন্যের প্রয়োজন, সুবিধা, বিপন্নতা দেখেও আমরা মুখ ফিরিয়ে নিই। প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের অন্তরে মানবিকতা, দায়বোধ, মূল্যবোধ ও বিবেকবোধকে জাহত করা, নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন যেন আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তার গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করতে পারি (ধারা ১০৫)। আমরা বিবেকবান, দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিশ্বাসী মানুষ হিসাবে যেন সৃষ্টি-প্রকৃতির সৌন্দর্য সংরক্ষণ ও সৃষ্টি-প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে সুরক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করি; কেননা সৃষ্টি-প্রকৃতি ঈশ্বরের অপরিমেয় ভালবাসার প্রকাশ।

যুগ যুগ ধরে কাথলিক চার্চ, বিশেষভাবে ধর্মগুরু পুণ্য পোপ মহোদয়গণের মাধ্যমে, সমসাময়িক বিষয় ও প্রশ্নের ওপর চার্চের চিন্তাধারা প্রকাশ করে থাকেন। “মানুষের প্রশ্ন - চার্চের ভাবনা” চলমান এই নীতিধারায়, ঐশ্বর্যপ্রতিবেশের আলোকে, মানুষ ও জগতের বিবেক হয়ে, বিভিন্ন সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে চার্চ তার শিক্ষা তুলে ধরেন। মানুষের সকল বিজ্ঞান ও বিদ্যার আপন স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা স্বীকার করে, চার্চ আশু ও জরুরী বিষয়ের উপর নৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সামাজিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চার্চ মূলতঃ মানুষের জন্য ‘চিন্তন-নীতি’, ‘কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা’ এবং ‘মূল্যায়নের মাপকাঠি’ তুলে ধরেন। একই ধারাবাহিকতায় আমাদের আবাস-গৃহ এই ধরিত্রীর যত্ন সম্বন্ধে পোপ ফ্রান্সিস চার্চের শিক্ষা সর্বজনীনপক্ষে তুলে ধরেছেন।

পরিবেশ সংক্রান্ত “হোক তোমার প্রশংসা” (*LAUDATO SI*) দলিলে দু’টো কেন্দ্রীয় বিষয় গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে: প্রথম: পরিবেশকে নানা দৃষ্টিকোণ বা আদর্শবাদ অনুসরণ করে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ-বিবেচনা করা সঠিক হবে না; তাকে সামগ্রিকভাবে অথবা “সমন্বিত পরিবেশ” হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে “বিশ্বব্যাপী পরিবেশ-পরিবর্তন” এর প্রয়োজনীয়তা জরুরী হয়ে পড়েছে।

পরিবেশ সমস্যা মানুষের কর্মকাণ্ডের ফল। পরিবেশের সমস্যা মূলতঃ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। পোপ ফ্রান্সিস বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের উপর ভিত্তি করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতাই তিনি এই দলিলে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, মানবজীবনের ভিত্তি হচ্ছে ত্রিমাত্রিক সম্পর্ক; সে সম্পর্ক সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে, প্রতিবেশী মানুষের সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কটা অবহেলার কারণে পরিবেশের আজ বিপর্যয়; এটাই মানুষের পাপ। এই পাপ শুধু সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে নয়, মানুষের বিরুদ্ধে পাপ - বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিরুদ্ধে পাপ। অতএব মানুষকে তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে, মন পরিবর্তন করতে হবে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং তার জন্য কৃচ্ছসাধন করতে হবে।

(গ) Pope Francis, *Fratelli Tutti* – “On Fraternity and Social Friendship”, 2020;

বাংলা অনুবাদ, *ভ্রাতৃ-সকল: ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব*, সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশন, ২০২৩ খ্রি.

“ভ্রাতৃ-সকল” (*Fratelli Tutti*) নামক বিশ্বজনীনপত্রটি, অক্টোবর ৩, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস প্রকাশ করেন। বিশ্বজনীন পত্রটি স্বরূপগত ভাবে সামাজিক যেখানে সাম্প্রতিক কালে মণ্ডলীর সর্বশেষ সামাজিক শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে “ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব”।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দলিলটির প্রেক্ষাপট: বিশ্বজনীনপত্র “লাউদাতো সি” (মে ২৪, ২০১৫ খ্রি.), আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত “বিশ্বশান্তি ও সমবেত বসবাসের জন্য মানব-ভ্রাতৃত্ব” শীর্ষক স্বাক্ষরিত চুক্তি” (ফেব্রুয়ারি ৪, ২০১৯ খ্রি.) এবং “কোভিড-১৯ এর বিশ্ব মহামারি” (২০১৯-২০২৩ খ্রি.)।

বিশ্বজনীনপত্রটির স্বরূপগত দিক হচ্ছে: ঐশতাত্ত্বিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক; এটি একটি আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সর্বজনীন দলিল, কাথলিক বিশেষজ্ঞ ছাড়াও অন্যের মতামত এখানে স্থান পেয়েছে এবং এর গ্রহণযোগ্যতা ধর্মসম্প্রদায়ের সীমানা পেরিয়ে গেছে। সংক্ষেপে পোপ ফ্রান্সিসের এই বিশ্বজনীন পত্রটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও স্বতন্ত্র।

বিশ্বজনীনপত্রে মূল প্রশ্ন হচ্ছে কী করে বিশ্বে আরও ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ব নির্মাণ করা যায়? বিশ্বজনীন পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক জাতি ও প্রতিষ্ঠানের অবদানে, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিশ্বচেতনা সৃষ্টি করা। এই পত্রে আছে নতুন পৃথিবীর একটি সমন্বিত দর্শন ও মিশন।

বিশ্বজনীনপত্রে অধিক আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে আছে: (ক) মানবব্যক্তির মর্যাদা: সৃষ্টিকর্তা এক, একটি পরিবার যার মধ্যে আছে সকলের সম-অধিকার, ইত্যাদি; (খ) ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সম্পর্ক: সংহতি, পারস্পরিক যোগাযোগ, ন্যায্যতা, শান্তি, সংলাপ, ভ্রাতৃত্ব, মানব-ভ্রাতৃত্ব, ইত্যাদি। (গ) নৈতিক বিষয়সমূহ: ন্যায় যুদ্ধ, সহিংসা, যুদ্ধবিগ্রহ, পারমাণবিক অস্ত্র, মৃত্যু-দণ্ডদেশ, গণমঙ্গল, বিশ্বের সম্পদের সর্বজনীন লক্ষ্য, দরিদ্রদের আত্মাধিকার, আত্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদ, আধুনিক দাসপ্রথা, সম্পদের প্রতি অধিকার, উদাসীনতার বৈশ্বায়ন, ইত্যাদি। (ঘ) সমাজ-বিজ্ঞান: রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজজীবন, প্রকৃতি ও পরিবেশ ইত্যাদি। (ঙ) ধর্ম: ভ্রাতৃত্বের সেবায় নিয়োজিত, উত্তম দয়ালু শমরীয়, ইত্যাদি। (চ) ভালবাসার আদেশ: ঈশ্বরের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা।

(ক) বিশ্বজনীন পত্রের সারসংক্ষেপ

পোপ মহোদয় মনে করেন যে, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্বের পথ ধরে চললে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব অবদান রাখলে, আরও উন্নততর, ন্যায্য এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্ব নির্মাণ করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন হবে যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক উদাসীনতাকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করা।

এই লক্ষ্যে পৌছানো কী সম্ভব? সাধু ফ্রান্সিসের চিন্তাভাবনা অনুসারে তা সম্ভব। কীভাবে? মানুষ এমন জীবন যাপন করবে যা মঙ্গলসমাপনার শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হবে। সেই কাজ করার জন্য পোপ মহোদয় পত্রের মধ্য দিয়ে সবার মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্বের প্রতি প্রত্যাশা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একা একা এই কাজ সম্ভব নয়, একই মানবপরিবারে সকল ভাইবোন একই স্বপ্ন দেখতে হবে।

১ম অধ্যায়: আবদ্ধ জগতের উপর কালো মেঘপুঞ্জ

সাম্প্রতিক জগতে অনেক বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি বিদ্যমান: (ক) গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, ন্যায্যতা সম্পর্কে শোষণাত্মক বিকৃত ধারণা; (খ) সামাজিক জীবন ও ইতিহাস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা; (গ) গণকল্যাণের প্রতি স্বার্থান্বেষী ও উদাসীন মনোভাব; (ঘ) অপচয়ের কৃষ্টি ও অধিক মুনাফা লাভের ওপর ভিত্তি করা বাজারচুক্তি; (ঙ) বেকারত্ব, জাতীয়তাবাদ, দারিদ্র; (চ) অধিকারের বৈষম্য: দাসত্ব, পাঁচার, নারীদের পরাধীন করে রাখা, ভ্রূণহত্যার জন্য চাপসৃষ্টি, দেহাঙ্গ পাঁচার, (ছ) “প্রাচীর গড়ার” কৃষ্টি, ইত্যাদি।

২য় অধ্যায়: পথের মধ্যে আগন্তুক (দয়ালু শমরীয়)

অন্ধকারময় মেঘাচ্ছন্ন আকাশে দেখা যায় আলোকোজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত যা অনেক আশা সঞ্চার করে। আর সেই দৃষ্টান্ত হচ্ছে মঙ্গলসমাপনের রচিত দয়ালু শমরীয়-র ঘটনা।

দয়ালু শমরীয় পথিমধ্যে একজন অচেনা ব্যক্তি। সমাজটা অসুস্থ, তারা কষ্টভোগী ও দুর্বল মানুষদের দেখেনা। কিন্তু আমরা দয়ালু শমরীয়র মতো অন্যের কাছে প্রতিবেশী হওয়ার জন্য আহ্বান পাই। সকল বন্ধমূল ধারণা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, অতীতের সকল বাঁধা ছিন্ন করে সমাজে যারা পিছিয়ে পড়েছে তাদের প্রতি আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে, তাদেরকে আপন করে নেওয়ার, সম্পৃক্ত করার এবং কষ্টযাতনা থেকে মুক্ত করার। ভালবাসা যোগসেতু নির্মাণ করে কেননা “আমরা ভালবাসার জন্য সৃষ্ট হয়েছি”। খ্রিস্টানদের কাছে পোপ মহোদয় আহ্বান করছেন যেন যারা নিগৃহীত তাদের মধ্যে আমরা যেন যিগুকে দেখতে পাই।

৩য় অধ্যায়: একটি উন্মুক্ত জগত মানসক্ষে দেখা ও রূপায়িত করা

এই অধ্যায়ে পোপ মহোদয় এমন একটি স্বপ্ন দেখেন যেখানে আছে একটি উন্মুক্ত জগৎ। তিনি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন যেন আমরা আমাদের “আমি” থেকে বের হয়ে “অন্যের মধ্যে” নিজেকে দেখে স্বপ্নের পূর্ণতা উপলব্ধি করি। আমাদের যে আধ্যাত্মিক সত্তা আছে তা একমাত্র ভালবাসা দ্বারাই পরিমাপ করা যায়। অপরের প্রতি ভালবাসাই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ, যা স্বার্থচিন্তা থেকে বিরত রেখে অন্যের মঙ্গল বাসনার দিকে নিয়ে যায়। এই একাত্মতাবোধ ও ভ্রাতৃত্ব পরিবার থেকেই জন্ম নেয়। পরিবারের এই মূল্যবোধগুলোকে প্রাথমিক ও প্রাণদায়ী শিক্ষার মাধ্যমে সুরক্ষিত করতে হবে।

মর্যাদা সহকারে জীবন যাপন করার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারেনা। এই অধিকারের কোন সীমানা নেই, কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না তা যেখানেই তার জন্ম হোক। এই মৌলিক অধিকারের ওপর ভিত্তি করেই “আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নৈতিকতা” প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রতিটি দেশে কেউ বিদেশী হয়ে থাকতে পারে না, কেননা দেশের সম্পত্তির উপর তার যে অধিকার তা অস্বীকার করা যাবে না। প্রত্যেকেরই প্রকৃতিগত ভাবে সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানা আছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঋণ-গ্রহীতা দেশগুলো অবশ্যই ঋণ পরিশোধ করার দায়বদ্ধতা আছে। তবে দরিদ্র দেশগুলোর জীবন ধারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে ঋণ-পরিশোধের বিষয়টা কোনভাবেই আপোষ করা যাবে না।

৪র্থ অধ্যায়: পুরো বিশ্বের প্রতি উন্মুক্ত এক হৃদয়

“পুরো বিশ্বের প্রতি উন্মুক্ত এক হৃদয়” শিরোনামে পোপ মহোদয় অভিবাসন বিষয়টি আলোচনা করেছেন। জীবনের সকল ঝুঁকি নিয়ে যারা যুদ্ধ, অত্যাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যায় মানবপাচার, তাড়িত হয়ে আপন শেকর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অভিবাসী বা শরণার্থী হয়েছে তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে, রক্ষা করতে হবে, উন্নতি করতে হবে এবং তাদেরকে সমাজে আপন করে নিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় অভিবাসন থেকে বিরত

থাকতে হবে যেন তারা নিজেদের দেশে মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বাস করতে পারে। যে দেশ অভিবাসীদের গ্রহণ করে তাদের নিজস্ব জনগণের অধিকার এবং অভিবাসীদের অধিকারের মধ্যে একটা ভারসাম্যতা বজায় রাখতে হবে। মানবিক কারণে যারা অভিবাসন করে ও শরণার্থী হয় তাদের প্রতি সহনশীল হওয়া একান্ত আবশ্যিক যেমন: ভিসা প্রদান, মানবতার কারণে বসবাসের জায়গা করে দেওয়া, খাওয়া-দাওয়া, নিরাপত্তা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী নিশ্চিত করা; কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, পরিবারের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিশুদের রক্ষা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, প্রভৃতি নিশ্চিত করা। যে বিষয়টা একান্ত প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রশাসন-ব্যবস্থা ও সহযোগিতা, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, ত্রাণসামগ্রী প্রদানের উর্ধ্বে গিয়ে জনগণের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫ম অধ্যায়: উন্নততর ধরনের রাজনীতি

বর্তমান বিশ্বে একটি উন্নত ধরনের রাজনীতি প্রয়োজন, যে রাজনীতির মধ্যে ভালবাসা ও দয়ার বিচিত্রভাবে প্রকাশ পাবে। এই ধরনের রাজনীতি গণকল্যাণের সেবার্থে নিয়োজিত, যা জনগণের গুরুত্ব দেয়, যা উদার ও উন্মুক্ত এবং যা সর্বদা জনগণের সাথে সংলাপ করতে উন্মুক্ত। পোপ ফ্রান্সিস এ ধরনের “জনগণমুখী” রাজনীতির কথা বলেন। এ ধরনের রাজনীতি “লোকরঞ্জনমূলক” রাজনীতি থেকে ভিন্ন কেননা “লোকরঞ্জনমূলক” রাজনীতি “জনগণ”-শূন্য রাজনীতি, যা জনগণের সমর্থন নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা করে। উন্নততর রাজনীতি সামাজিক জীবনের অপরিহার্য, অর্থাৎ মানুষের শ্রমকে রক্ষা করে। দারিদ্র বিমোচনের জন্য নতুন ধরনের রাজনীতি মানুষের মধ্যে একাত্মতা এবং অধঃস্তনদের স্বাধীনতার উন্নয়ন করে। উপরন্তু রাজনীতির কাজ হচ্ছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অবস্থার মধ্যে এমন এক সমাধান খুঁজে বের করা যেখানে সামাজ্য থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হবে না, দেহাঙ্গ, যুদ্ধান্ত্র ও মাদকদ্রব্য বাজারজাতকরণ থেকে রোধ করা হবে, দাস্যশ্রম, সহিংসতা, সংঘবদ্ধ অপরাধ থেকে সমাজকে মুক্ত করবে। “মানবতার কলঙ্কের উৎস” মানবপাঁচার বন্ধ করা এবং ক্ষুধা নিবারণ করা, কেননা তা হচ্ছে মানুষের “অলঙ্ঘনীয় অধিকার”।

এমন রাজনীতি প্রয়োজন যেখানে গুরুত্ব দেয়া হবে “মানবমর্যাদা কেন্দ্রিক রাজনীতি” — অর্থ-ভিত্তিক রাজনীতি নয়, কেননা বাজারমুখী রাজনীতি মানুষের সকল সমাধান দিতে পারে না। এ কারণে সাম্প্রতিককালে অনেক জনজাগরণমূলক আন্দোলন গড়ে উঠছে যা প্রণিধানযোগ্য কেননা সেখানে একটি নৈতিক শক্তির উদ্ভাবন দেখা যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে পোপ মহোদয় “জাতিসংঘের সংস্কারের” কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও প্রভাব থেকে জাতিসংঘকে মুক্ত করে “জাতিগণের পরিবার” স্বরূপ ধারণায়

প্রবুদ্ধ হয়ে গণমঙ্গলের জন্য, দারিদ্র বিমোচনের জন্য, মানবাধিকার রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘ কাজ করবে। অবিরাম “সমঝোতা, মধ্যস্থতা এবং সালিসি”-র মাধ্যমে, “শান্তির বিধান না হয়ে বিধানের শক্তি” হয়ে জাতিসংঘ কাজ করে যাবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়: সমাজে সংলাপ এবং বন্ধুত্ব

সমাজে সংলাপ ও বন্ধুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পোপ মহোদয় নতুন ধরনের জীবন-ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেকের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারা একটি শৈল্পিক বিষয়। যারা প্রান্তিক জগতে অবস্থান করছে এবং যারা আদিবাসী তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে, কেননা তাদের কাছ থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে। সমাজে কেউই অপ্রয়োজনীয় নয়, কাউকেই ফেলে দেওয়া যায় না। আদিম ও প্রান্তিক মানুষের মধ্যে আছে “দয়াশীলতার” অলৌকিক কীর্তি, যা আমাদের আবিষ্কার করতে হবে কেননা “অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল আলোর মত” তা কাজ করে এবং তা “জগতের সাম্প্রতিক সকল নৃশংসতা..., উদ্ভিগ্নতা..., কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত করতে পারে”।

৭ম অধ্যায়: পুনরুজ্জীবিত সাক্ষাতের পথসমূহ

এই অধ্যায়ের মধ্যে পোপ মহোদয় শান্তির মূল্যবোধ ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি গুরুত্বের সাথে বলছেন যে, “শান্তি আসলে সত্য, ন্যায্যতা ও দয়ার” সাথে সংযোজিত। শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে প্রতিহিংসা তো নেই-ই, বরঞ্চ ইতিবাচক একটা ভাব নিয়ে এমন সমাজ গড়ে তোলা যার ভিত্তি হবে অন্যের সেবা করা এবং পুনর্মিলন ও পারস্পরিক উন্নয়নের পথ অনুসরণ করা। শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এমন একটি শৈল্পিক কাজ যেখানে সবাই জড়িত, প্রত্যেকের কিছু না কিছু করার আছে এবং এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া যা কোন দিনই শেষ হবে না। ক্ষমা ছাড়া শান্তি সম্ভব নয়। আমরা সবাইকে ভালবাসব, তার কোন ব্যতিক্রম নেই; যারা নিপীড়ন করে তাদেরকে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে তার মধ্যে এমন একটি পরিবর্তন আনা যাতে সে তার প্রতিবেশীকে আর নিপীড়ন না করে। ক্ষমার অর্থ দণ্ড থেকে মুক্তি নয়, বরং ন্যায্যতার সাথে স্মরণ করা। ক্ষমার অর্থ এ নয় যে, সব ভুলে যাওয়া, কিন্তু মন্দের বিধ্বংসী ক্ষমতা ত্যাগ করা এবং প্রতিহিংসা বর্জন করা হচ্ছে ক্ষমা। নাৎসিদের দ্বারা “শোয়াহ” এর বিভৎসতা, হিরোশিমা ও নাগাসিকার পারমাণবিক আক্রমণ এবং আরও অনেক নির্যাতন ও জাতিগোষ্ঠীর বিলোপন, প্রভৃতি ঘটনা ভোলার নয়। এগুলো স্মরণ রাখতে হবে যাতে আমাদের স্মৃতির বিলোপ না ঘটে এবং যাতে সামগ্রিক বিবেক-শিক্ষা যেন সর্বদাই জীবন্ত থাকে।

“ন্যায় যুদ্ধ”

এ প্রসঙ্গে পোপ মহোদয় স্মরণ করেন যে, যুদ্ধের হুমকি সর্বদা চলছে, “যুদ্ধ মানুষের অধিকারের বঞ্চনা”, “রাজনীতি এবং মানবতার ব্যর্থতা”, এবং “মন্দ শক্তির সামনে পরাজয়” স্বীকার। পারমাণবিক যুগে আমরা আগের মতো ভাবতে পারি না যে, “ন্যায় যুদ্ধ” বলতে কিছু আছে। আমাদেরকে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে “আর নয় যুদ্ধ”। পারমাণবিক অস্ত্র পরিহার করা নৈতিক ও মানবিক নির্দেশ। যুদ্ধাশ্রের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা দিয়ে যেন “বিশ্ব ফান্ড” গঠন করা হয় যাতে জগত থেকে ক্ষুধা বিদূরিত হয়।

মৃত্যুদণ্ড

পোপ ফ্রান্সিস স্পষ্ট করে বলেছেন যে, “মৃত্যুদণ্ড গ্রহণযোগ্য নয়, বিশ্বব্যাপী তা যেন বাতিল করা হয়”। “মানব জীবন পবিত্র”, সবার জীবনের প্রতি সবার শ্রদ্ধা থাকতে হবে। কেউ যদি অন্যকে হত্যা করে তখনও কিন্তু সে তার ব্যক্তিজীবনের মর্যাদা হারায় না। কোন কারণে, যাদের জন্ম হয় নি, যারা দরিদ্র, যারা প্রতিবন্ধী এবং বৃদ্ধ তাদের জীবন কোনভাবে কেড়ে নেওয়া যাবে না।

৮ম অধ্যায়: এ জগতে ভ্রাতৃত্বের সেবায় ধর্মসমূহ

“আমাদের জগতে ভ্রাতৃত্বের সেবায় নিয়োজিত ধর্মসমূহ” এই বিষয়কে কেন্দ্র করে পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, জগতে যে সহিংসতা আছে তা ধর্মের কারণে নয় কিন্তু শাস্ত্রের কিছু ভ্রান্ত ব্যাখ্যার কারণে, আর রয়েছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অন্যায়তা এবং নিপীড়ন-নীতি। শান্তির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামর্থ্য আছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা সকল ধর্মবিশ্বাসীদের মৌলিক অধিকার সেই মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করতে হবে।

মণ্ডলীর ভূমিকার কথাও বিশ্বজনীনপত্রে বলা হয়েছে। মণ্ডলীর মিশন শুধু মণ্ডলীর অভ্যন্তরীণ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যদিও মণ্ডলী রাজনীতি করে না, তথাপি মঙ্গলসমাপচারের আলোকে মানুষের জীবনে রাজনৈতিক দিক, গণমঙ্গলের প্রতি মনোযোগ এবং সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয় অবহেলা করতে পারে না এবং এ ব্যাপারে তার ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না।

পরিশেষে পোপ ফ্রান্সিস, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে আবুধাবিতে, আল-আজারে গ্রান্ড ইমাম, আহম্মদ আল-তাইইবের সঙ্গে অনুষ্ঠিত “বিশ্বশান্তি ও সমবেত বসবাসের জন্য মানব-ভ্রাতৃত্ব” শীর্ষক চুক্তিটির কথা উল্লেখ করেন। এটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের একটি মাইলফলক হয়ে আছে। তিনি উক্ত চুক্তি অনুসরণের জন্য পুনরায় আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে, মানব-ভ্রাতৃত্বের নামে সংলাপ যেন আমাদের পথযাত্রা, আচরণে সমবেত সহযোগিতা এবং পারস্পরিক জ্ঞানের জন্য প্রধান পদ্ধতি ও নীতি হয়ে থাকে।

(খ) সামাজিক ন্যায্যতা বিষয়ে পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তাধারা

কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষার মধ্যে সামাজিক ন্যায্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই পোপ ফ্রান্সিস এই শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মণ্ডলীর এবং পোপ ফ্রান্সিসের সামাজিক ন্যায্যতার সম্বন্ধে মৌলিক কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

- (১) **মানব মর্যাদা:** কাথলিক মণ্ডলী তার শিক্ষায় মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত মর্যাদাকে অতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা দিয়ে থাকে। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসারে সামাজিক ন্যায্যতা হচ্ছে মানব ব্যক্তির প্রেক্ষাপট, সামাজিক অবস্থান অথবা আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে, মানবজীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে মর্যাদা স্বীকৃতি দেওয়া এবং তা অক্ষুণ্ণ রাখা।
- (২) **একাত্বতার বন্ধন:** পোপ মহোদয় একাত্বতার বন্ধন সম্পর্কে বার বার জোর দিয়ে থাকেন যার অর্থ হচ্ছে পরস্পরের সমর্থনের জন্য একসঙ্গে অবস্থান নেওয়া। তিনি কাথলিকদের এবং সকল বিশ্বাসী জনগণের উৎসাহিত করেন যাতে আরও ন্যায্য ও সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং যেখানে প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে।
- (৩) **দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের যত্ন নেওয়া:** কাথলিক মণ্ডলী শিক্ষা দেয় যে, সমাজ যেন দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়। এর মানে হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন, অভাবীদের প্রয়োজন মেটানো এবং ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা, যেমন খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসেবা, এবং শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়।
- (৪) **আর্থিক ন্যায্যতা:** পোপ মহোদয় ভোগবাদ এবং অসমতার “ছুড়ে-ফেলা-কৃষ্টি”কে অনেক সমালোচনা করেছেন। তিনি এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পক্ষে কথা বলেন যা হবে সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক, এবং সম্পদের সম-বন্টন মূলক।
- (৫) **পরিবেশ-ন্যায্যতা:** পোপ মহোদয় পরিবেশ-ন্যায্যতার বিষয়ক “লাউদাতো সি” নামক একটি মাইলফলক বিশ্বজনীনপত্র প্রকাশ করেছেন। এই পত্রটি পরিবেশ বিষয়ক অনেক সমস্যা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন যা বিশ্বের দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব ফেলেছে। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, পরিবেশের যত্ন নেয়া সামাজিক ন্যায্যতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, কারণ পরিবেশের অবক্ষয় ঘোরতর ভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছে।
- (৬) **শান্তির পক্ষ-সমর্থন:** পোপ ফ্রান্সিসসহ কাথলিক মণ্ডলী শান্তির পক্ষে এবং অহিংসামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সমাধান করেন। শান্তি প্রতিষ্ঠা সামাজিক ন্যায্যতার অবিচ্ছেদ্য একটি দিক কেননা যুদ্ধ ও সহিংসতা সাধারণ মানুষের কষ্ট-যন্ত্রণার কারণ হয়ে যায়।

(৭) অন্যায়তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ: কাথলিক মণ্ডলী ও পোপ মহোদয় প্রত্যেক ব্যক্তি ও সরকারের নিকট আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা সামাজিক ন্যায্যতার বিরুদ্ধে, অর্থাৎ সকল বৈষম্য, জাতীয়তাবাদ, মানব-পাঁচার, এবং শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। পোপ মহোদয় বলেন যে, এই সব বিষয়ে প্রতিকার করতে এবং আরও ন্যায্য এবং সহমর্মী সমাজ গড়ে তুলতে আমরা যেন তৎপর থাকি।

সংক্ষেপে, কাথলিক শিক্ষার মধ্যে সামাজিক ন্যায্যতা একটি অভিন্ন অংশ। পোপ মহোদয় এই বিষয়ে সোচ্চার ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজ, এবং জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তারা ন্যায্য, সম ও সহমর্মী জগত নির্মাণ করে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির আপন মর্যাদা সম্মানিত হয় এবং সুরক্ষিত হয়।

উপসংহার: পোপ ফ্রান্সিস – ন্যায্য, দয়া ও শান্তি

গত বছরে ইতালির “বিচার বিভাগের উচ্চ পরিষদ”-এর সভা-অনুষ্ঠানে পোপ ফ্রান্সিস যে সমস্ত কথা বলেছেন তার সবকিছু পুনরুল্লেখ না করে কয়েকটি উক্তির মাধ্যমে তার উপদেশ ও চিন্তাভাবনা অত্র প্রবন্ধের উপসংহারে উপস্থাপন করছি:

পোপ মহোদয় বলেন:

“বিচার ন্যায়নিষ্ঠ হতে হলে প্রয়োজন হবে সত্য, আস্থা, বিশ্বস্ততা ও উদ্দেশ্যের পবিত্রতা”।

“ন্যায়ের জন্য কাজ করা একদিকে একটি দান এবং অন্যদিকে দায়িত্ব – যা মানুষের মর্যাদা ও গণমঙ্গলের সেবায় নিয়োজিত”।

“যারা ন্যায্যতার জন্য কাজ করে তারা কণ্ঠহীনদের এবং অন্যায়ভোগীদের কণ্ঠস্বর হতে আহৃত।”

মণ্ডলীতে যারা ন্যায্যতার জন্য কাজ করে তাদেরকে, যখন মণ্ডলীর কোন ব্যক্তির অসদাচরণ ‘মণ্ডলীর শ্রীমুখ নষ্ট হয় এবং বিঘ্ন নিয়ে আসে’ সে বিষয়ে নিশ্চিত করতে হয়, সেখানে “ন্যায়বিচার ও দয়ার মধ্যে একটা ভারসাম্যতা আনতে হবে”। এ সবার মধ্যে “সুস্থ অবধারণ অনুশীলন” করতে হবে এবং ন্যায়পরায়ণতার নীতি, বিচক্ষণতার সাথে অনুসরণ করলে সেই ভারসাম্যতা অর্জন করতে সাহায্য করতে পারে।

ন্যায্যতার ঐতিহ্যগত সংজ্ঞা হল – যার যা প্রাপ্য তাকে তা দান করা। পোপ মহোদয়ের প্রশ্ন: “প্রাপ্য কীভাবে ব্যাখ্যা করব”, “বাস্তবে তাদের প্রাপ্য কী”। এরূপ প্রশ্ন করা হয় কারণ স্থান ও কাল ভেদে “প্রাপ্য”-এর অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে। পোপ মহোদয় বলেন যে, বাইবেলের আলোকে “প্রাপ্য হচ্ছে মানুষের মর্যাদাকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া”।

পোপ মহোদয় বলেন যে, ক্ষতিপূরণমূলক, পুনরুদ্ধারমূলক অথবা পুনর্মিলনাত্মক “ন্যায্যতা, যা পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়া, সেই ন্যায্যতাই হচ্ছে প্রতিশোধ ও স্মৃতিবিলোপনের খাঁটি প্রতিষেধক, কেননা এরূপ ন্যায্যতা বিচ্ছিন্ন

বন্ধনকে পুনর্গঠন করে এবং ভাইয়ের রক্তের দ্বারা রঞ্জিত ভূমি পুনরুদ্ধার করার সুযোগ করে দেয়।”

পোপ বলেন যে,

“দয়া এবং ন্যায্যতা পরস্পরের বিকল্প নয়, পক্ষান্তরে উভয়ে একই লক্ষ্যে একসঙ্গে যাত্রা করে, কেননা দয়া কোন সময় ন্যায্যতা রহিত করে না বরং পূর্ণতা দান করে”।

“সত্য ও স্বাধীনতার ওপর ভর করে ন্যায্যতা সব সময়ই শান্তির সন্ধানে সহযাত্রী হবে।” “ন্যায়ের পথ ধরে শান্তির অন্বেষণ” করতে হবে।

“যারা অন্যায়ের শিকার বা ভুক্তভোগী তাদের সঙ্গে একাত্মতা ন্যায্যতাবোধকে পরিপুষ্ট করবে এবং ন্যায় ও শান্তির রাজ্যে আগমনের প্রত্যাশা কোন সময় নির্বাপিত হবে না।”

“ন্যায্যতা বিহীন শান্তি কোন আসল শান্তি নয়”।

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, “শান্তির জন্য প্রচেষ্টার অর্থ হচ্ছে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা”।

“ন্যায্যতা এমনই একটি গুণ যা জীবনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অনুশীলন করতে হবে। অন্যান্য নৈতিক প্রধান গুণ, সন্ধিবেচনা, সংসাহস ও সংযম ন্যায্যতার দ্বারা অনুশীলন করতে হবে।”

Resources

- (1) *কাতলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা*, বাংলা-সম্পাদক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, সিবিসিবি, ২০০০ খ্রি.
- (2) *Compendium of the Social Doctrine of the Church*, Pontifical Council for Justice and Peace, 2004, খ্রিস্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার সারসংক্ষেপ, অনুবাদ ও সম্পাদনায়: সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশন, ঢাকা, ২০১০ খ্রি.
- (3) Pope Francis, *Evangelii Gaudium* – “The Joy of the Gospel” 2013, অনুবাদ: *মঙ্গলবার্তার আনন্দ*, অনুবাদ-সম্পাদক: সিস্টার শিখা লিটিশিয়া গমেজ, সিএসসি, ঢাকা, ২০১৪ খ্রি.
- (4) Pope Francis, *Laudato Si'* – “Praised Be to You” – Encyclical Letter on the Care for Our Common Home, 2015. অনুবাদ: *তোমার প্রশংসা হোক – আমাদের অভিন্ন বসবাটির যত্ন*, কারিতাস বাংলাদেশ, ২০১৬ খ্রি.
- (5) Pope Francis, *Fratelli Tutti* – “On Fraternity and Social Friendship”, 2020; বাংলা অনুবাদ *ভ্রাতৃ-সকল: ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব*, সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশন, ২০২৩ খ্রি.
- (6) কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, *শিক্ষা ও সেবা*, কার্ডিনাল-পরম্পরা প্রকাশনা, ২০২৩ খ্রি.

ব্রত্যা- ২: আশাময় ধরিত্রী নির্মাণে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও পোপ চতুর্দশ লিও “লাউদাতো সি সপ্তাহ ২০২৬” এবং দশক পূর্তি

“সিবিবিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশনের” এই বর্তমানের প্রশিক্ষণের আয়োজনের জন্য সাধুবাদ জানাই। কয়েকদিন আগে পোপ ফ্রান্সিসের দ্বারা রচিত “লাউদাতো সি” (২০১৫-২০২৫ খ্রি.) শীর্ষক বিশ্বজনীন পত্রটির একটি দশক পূর্তি উদ্‌যাপন করলাম। আবার এ বছর পোপ ফ্রান্সিসের দ্বিতীয় আরেকটি বিশ্বজনীনপত্র “ফ্রাতেল্লি তুত্তি”-এর পঞ্চম বার্ষিকী (২০২০-২০২৫ খ্রি.) স্মরণ করছি। আমি এই দুটো বিশ্বজনীনপত্রকে পৃথিবী বা ধরিত্রীর একই মানব-পরিবারের ভাই-বোন হিসেবে বিবেচনা করি।

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাপী মহামানব, মহান ব্যক্তিত্ব ও বরণ্য মানুষের বড় খরা। এই খরা এতই উত্তপ্ত ও প্রকট যে চারিদিকে দেখা যাচ্ছে দাবানল – প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যে দাবানল এবং মানবসমাজে যুদ্ধ-সংঘর্ষের দাবানল। এহেন পরিস্থিতিতে পোপ ফ্রান্সিস প্রতিক্রিয়া অর্থে দুটো দাবানল প্রতিপাদ্য করে দুটো বিশ্বজনীনপত্র প্রকাশ করেছিলেন: প্রথমটি হল “লাউদাতো সি” (প্রভুর প্রশংসা হোক) যেটি প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর রচিত হয়েছেন; যেখানে তিনি বলেছেন “ধরিত্রী আমাদের সর্বসাধারণের বসতবাড়ি”। আর দ্বিতীয় বিশ্বজনীন পত্রটি হচ্ছে “ফ্রাতেল্লি তুত্তি” “ভ্রাতৃ-সকল” বা “সকলে ভাইবোন” যেটি “সামাজিক বন্ধুত্ব” সম্পর্কে রচিত।

১ ॥ পোপের দায়িত্বভার – বিশ্বজনীন যৌক্তিকতা

কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ হচ্ছেন একজন ধর্মগুরু। পোপ ফ্রান্সিস কাথলিক তথা খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরুই হয়ে উঠেছিলেন। একযুগ (২০১৩-২০২৫ খ্রি.) ধরে তিনি পোপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শুধু কাথলিকদের ধর্মগুরু নন। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে ভাটিকান একটি ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘভুক্ত। এ দিক দিয়ে পোপ মহোদয় একজন রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানও বটে। এই দায়িত্ব বলে তিনি সকল রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যার ফলে তিনি সমগ্র বিশ্বের কাছে কথা বলার যৌক্তিকতা রাখেন।

কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে, পোপ এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বর দ্বারা আহূত, তাঁর দ্বারা মনোনীত এবং বিশ্বের কাজে তাঁর দ্বারা প্রেরিত। পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন প্রধান ধর্মগুরু, আবার একই সময়ে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে। এভাবেই তিনি মানুষের কাছে অভিহিত হয়েছিলেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে

পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশ সফরের সমাপ্তিতে একটি সংবাদপত্র উক্তি করেছিল: “আধ্যাত্মিকতা বলতে কী বুঝায় পোপ ফ্রান্সিস আমাদের কাছে তা দেখিয়ে গেলেন।”

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যারা তারা সাধারণত হয়ে ওঠেন সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন। অর্থাৎ তারা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর মধ্যে তারা সীমিত থাকেন না, সবার সাথে সংলাপ ও সম্পর্ক, সকলের সাথে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন অনুভব করেন। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নিজস্ব ধর্মকে ভর করে এমন উর্ধ্ব-শেখড়ে চলে যান সেখানে সবাই তার ভাইবোন, সকলে তার আপনজন। এ ভাবেই পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বমানুষের হৃদয় জয় করেছেন।

২ ॥ আশাময় ধরিত্রী নির্মাণে মানব-পরিবার ও মানব-দ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা ও প্রেরণা

এবারে আমাদের নির্দিষ্ট আলোচ্যবিষয়, অর্থাৎ “আশাময় ধরিত্রী নির্মাণে মানব-পরিবার ও মানব-দ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা ও প্রেরণা” সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি কথা বলি। “মানব-পরিবার ও মানব-দ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা ও প্রেরণা” খ্রিস্টবিশ্বাসের ভিত্তির উপরে গড়া এবং পোপ ফ্রান্সিস নিজে তাঁর ধারণা ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে আপন করে প্রকাশ করেছেন:

শিক্ষার ভিত্তি খ্রিস্টবিশ্বাস

প্রথমত, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এক। তিনি সমস্ত জগত ও সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তিনি পালনকর্তা এবং তিনি উদ্ধারকর্তা। ঈশ্বরের প্রেরিতজন হিসেবে সৃষ্টি: অর্থাৎ মানব ও ধরিত্রী রক্ষা, তা পালন ও তত্ত্বাবধান করা, এবং পতিত মানব-জাতিকে অধর্ম থেকে উদ্ধার করা পোপের দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করেছেন। আমরাও সবাই সেই একই দায়িত্বের অংশীজন: মানুষ ও ধরিত্রীকে রক্ষা করব, পালন ও তত্ত্বাবধান করব এবং পতিত মানবসমাজকে উদ্ধার করব। ঈশ্বর এক এবং আমাদের দায়িত্বও এক।

দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির সেরা মনুষ্য-জগত একটি পরিবারস্বরূপ, যাকে আমরা বলি মানব-পরিবার। মানব-পরিবারের সকলেই আমরা ভাইবোন। এই বিষয়টি তাঁর বিশ্বজনীনপত্র “ফ্রাতেল্লি তুত্তি”, “দ্রাতৃ-সকল”-এর মধ্যে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

তৃতীয়ত, আমাদের এই পৃথিবী/ধরিত্রী হচ্ছে মানব-পরিবারের “সর্বসাধারণের একটি বসতবাড়ি”; আমাদের বসত-বাড়িটাকে রক্ষা করা, ভালবাসা ও যত্ন নেওয়া সকল মানুষের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে বিশ্বজনীনপত্র “লাউদাতো সি” দলিলে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন ও তার কুফলের জন্য মানুষ দায়ী; এটা তার অনৈতিক জীবনেরই

ফল; স্বার্থপরতার জন্য ধরিদ্রী ও তার সামগ্রী ব্যবহৃত বা অপব্যবহৃত হচ্ছে। যার ফলে হয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তন। সর্বস্তরে দেখা যাচ্ছে দূষণ: বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, মাটি দূষণ, খাদ্য দূষণ, আরও কত দূষণ। মানুষের ভোগ-বিলাস, প্রতিযোগিতা, অর্থলিপ্সা, পদলিপ্সা, অনেকে বলে “অর্থ যেখানে দ্বন্দ্ব সেখানে”, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা, “ছুড়ে ফেলার সংস্কৃতি” ইত্যাদির জন্য মানুষ দায়ী। আফসোস করে পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন: “ধরিদ্রীটাকে তোমারা গলা টিপে মেরে ফেলছ”; তিনি বলেন, “ধরিদ্রীর আর্তনাদ তোমারা শুনতে পারছ না?” প্রশ্ন করেছেন তিনি: “কোন ধরনের পৃথিবী তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাবে?” তাই পোপ মহোদয়ের উদাত্ত আহ্বান: “মন ফেরাও” বা “লাইফ-স্টাইল” পরিবর্তন কর।

চতুর্থত, মানবজগত ও মানবপরিবারের প্রধান নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে: বিশ্বে “মানব-ভ্রাতৃত্ব” গড়ে তোলা; “মানব-ভ্রাতৃত্ব” হচ্ছে মানুষের সামাজিক ও জাগতিক জীবনের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, প্রধান চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড।

অন্তর্ভুক্তিবোধ বা অন্তর্ভুক্তিকরণ: মানুষের মধ্যে আশা সঞ্চর করে

পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষা অনুসারে মানবসমাজকে যদি পরিবার রূপে গড়ে তুলতে হয় এবং সেই সমাজে যদি মানব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে সকল চিন্তাভাবনা ও কার্যক্রমের জন্য একটি নীতি অনুসরণ করতে হবে। সেই নীতি হচ্ছে **অন্তর্ভুক্তিবোধ বা অন্তর্ভুক্তিকরণ**, অর্থাৎ সবাইকে সম্পৃক্ত করা, কাউকে বাদ নয়, বিচ্ছিন্নতা নয় বরং মিলন-সৃষ্টি করা। এই নীতির মধ্যে নিহিত পোপ ফ্রান্সিসের কয়েকটি ধারণা নিম্নে তুলে ধরা হল:

ধর্ম, দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, কৃষ্টি, শ্রেণি, বর্ণ, সংস্থা-প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সীমানা বা প্রাচীর বা দেয়াল গড়া নয়, বরঞ্চ সবার মধ্যে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা। ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা সকল বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতাহাস করা একান্ত জরুরী।

যুদ্ধ-সংঘর্ষ-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পোপ ফ্রান্সিস উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। যুদ্ধ-সংঘর্ষ মানব-পরিবারের সম্পর্ক ও মানব-ভ্রাতৃত্ব নস্যাত্ন করে দেয়। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন ইতোমধ্যে খন্ডাকারে তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশেষ করে গাজা, ইউক্রেন, মিয়ানমার, সাম্প্রতিক আমাদের দেশের সকল পায়তারা এবং মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় দেশের শান্তির জন্য তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে গেছেন।

মাঝে মাঝে পোপ ফ্রান্সিসকে বলা হয় “পেরিফারীর বা প্রান্তিক-জগতের পোপ”। এই পরিচয়ের দ্বারা মানুষের মধ্যে আশা সঞ্চরিত হয়েছে। যারা দূরের তাদেরকে তিনি কাছে নিয়ে এসেছেন, কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রান্তিক দেশ ও প্রান্তিক মানুষের কাছে গিয়ে তিনি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। যেমন: বাংলাদেশ থেকে একজনকে কার্ডিনাল মনোনয়ন; যারা ক্ষুদ্র ও দরিদ্র, শরণার্থী ও অভিবাসী, আদিম আদিবাসী, উদ্ভাস্ত, অসুস্থ, পথের মানুষ, প্রতিবন্ধী তাদের প্রতি মনোযোগ; তাদের সাথে একাত্মতা স্বীকার। এ কারণে পোপ ফ্রান্সিস “দরিদ্রদের পোপ” বলেও আখ্যায়িত হয়েছেন। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দীনমানুষের প্রতি ভালবাসা ব্যক্ত করেছেন ও তাদের অধিকারে পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

শিশু-কিশোর-যুবদের তাদের প্রতি সর্বদা তিনি মনোযোগ দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে, তাদের সঙ্গে থাকতে, তাদের কাছে তাঁর ভালবাসা ব্যক্ত করতে তিনি সুযোগ খুঁজতেন; তাদের হতাশার জীবনে আশা সঞ্চার করেছেন। তাই যুবরা তার কাছে যেতে আগ্রহী ছিল, তার জীবন প্রয়াণে মর্মান্বিত হয়েছে অনেক পরিমাণে। (উদাহরণ: চার বছর অন্তর বিশ্ব-যুবদিবস, বাংলাদেশে সফর কালে যুবদের সাথে নটর ডেম কলেজে সাক্ষাৎ, ইত্যাদি)

যারা পাপী (“তাদের বিচার করতে আমি কে?”) ও অপরাধী (কেয়দীদের ভালবাসা ও পা ধুইয়ে সেবা করা), যারা সমাজে পরিত্যক্ত বা চ্যুত, যারা অন্যায়ের শিকার (বিশেষ করে শিশু কিশোর ও নাবালক) তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন; যারা ভালবাসা পায় না তাদেরকে ভালবাসাই ছিল একমাত্র পরিত্রাণের পথ। এভাবে পোপ ফ্রান্সিস মানবিক ভ্রাতৃত্ব জোরদার করেছেন মানব পরিবারে। পোপ ফ্রান্সিসের অন্তর্ভুক্তিবোধের উপর অগ্রাধিকার মানুষকে আশান্বিত করেছে। বিশ্বের জনগণই তার সাক্ষ্য।

মানব-পরিবার ও ভ্রাতৃত্ব গঠনে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক ও সম্প্রীতি

পোপ ফ্রান্সিস তার কার্যকালে ৪৭ টি দেশে সফর করেছেন এবং সব দেশে তিনি অন্য ধর্মের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ, আলোচনা, সভা বা প্রার্থনায় মিলিত হয়েছেন। সফরের অন্যতম উদ্দেশ্যে সব ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের মধ্যে মানবিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা। এশিয়ার এগারোটি দেশে তিনি সফর করেছেন তার মধ্যে: বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলংকা প্রমুখ। মধ্যপ্রাচ্য: সংযুক্ত আরব-আমিরাত – আবুধাবি, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাক (বুঁকিপূর্ণ), প্যালেস্টাইন, ইস্রায়েল, লেবানন, ইত্যাদি দেশে সাক্ষাৎ ও সফর করেছেন যেখানে বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও একসঙ্গে প্রার্থনা এবং কোনো কোনো দেশে চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ছিল পোপ ফ্রান্সিসের রাষ্ট্রীয় ও পালকীয় সফর। সফরের উদ্দেশ্য ছিল: “শান্তি ও সম্প্রীতি”। নাগরিক সংবর্ধনা, স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন,

আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা, রোহিঙ্গাদের সাথে সাক্ষাৎ, ছাত্রদের সাথে সমাবেশ ছিল আন্তঃধর্মীয় কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম।

আয়োজিত আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের শেষান্তে পোপ মহোদয়ের একক পরিচালনায়, অপরিকল্পিতভাবে মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন; রোহিঙ্গাদের করুণকাহিনী তিনি শুনেছেন, নিরাপত্তা কর্মীদের বলেছেন: “তাদের কথা বলতে বাধা দিওনা, তাদের শ্রদ্ধা কর”; বিশ্ববাসীর কাছে উক্তি করে বলেছেন: “আজ রোহিঙ্গারা ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রকাশ করছে”; আবার বলেন: “যারা তোমাদের নির্যাতনের কারণ হয়েছে তাদের হয়ে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি”; আরও তিনি বলেন: “বাংলাদেশ যেমন হৃদয়-দ্বার খুলে তোমাদের গ্রহণ করেছে, তোমরাও আমাদেরকে গ্রহণ করো”। সতেরোজন ব্যক্তির কথা শোনার পর পোপ ফ্রান্সিস নিজেই রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে একজন ইমামকে বিশ্বমানবের সকলের জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানান। পোপ রোহিঙ্গাদের কথা শুনে ব্যথিত হয়েছিলেন, সেই দিন তিনি রাতে আর আহার করতে পারেননি। সোসাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে রোহিঙ্গাদের আত্ননাদ সম্প্রচারিত হল এবং মানব-ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে কতদেশ তাদের মানবিক প্রয়োজন মেটাতে পরবর্তীতে এগিয়ে এল।

পোপ ফ্রান্সিসের দেওয়া অর্থ সাহায্যে বাংলাদেশের বিশপগণ বিগত ৭ বছর ধরে কারিতাসের একটি কর্মসূচির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের পাশে থেকে কাজ করে আসছে আজ অন্ধি। এখানে উল্লেখ করতে দ্বিধা নেই যে একজন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান পোপ মহোদয়কে আট কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন চার্চের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের যেন সাহায্য করা হয় – অভাবনীয় নিদর্শন।

মানব-পরিবার ও মানব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা ও গঠন

আবুধাবির রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে, ২০১৯ খ্রি. কায়রোর আলহাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রান্ড ইমামের সাথে পোপ ফ্রান্সিস একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে “মানব-ভ্রাতৃত্ব” এবং তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রয়েছে ১১ টি দফা।

পোপ ফ্রান্সিসের ধারণা অনুসারে মানুষের শিক্ষা ও গঠন হবে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিতে, শিক্ষার লক্ষ্য “মানব-ভ্রাতৃত্ব”; আর শিক্ষাপদ্ধতি হবে ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের সাথে সংলাপ, সম্পর্ক ও সম্প্রীতি।

সকলের কাছে আমার আবেদন পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানবসমাজকে যেন সর্বদা একটি পরিবার হিসেবে গ্রহণ করি, পৃথিবী বা ধরিত্রীকে একটি আপন বসতবাড়ি হিসেবে বিবেচনা করি এবং প্রত্যেক মানবব্যক্তিকে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে, পরিবারের ভাইবোন হিসেবে জ্ঞান করে, একটি মানব-পরিবার ও মানবিক ভ্রাতৃত্বে গড়ে উঠি শিক্ষা ও গঠনের মাধ্যমে।

মণ্ডলীর আইন অনুসারে একটি খ্রিস্টান সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা সম্বন্ধে চলমান গঠন ও প্রশিক্ষণ দেওয়া। আমার বাসনা থাকবে এখানে উপস্থিত যারা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, পরিচালক ও নির্বাহী কর্মী হিসেবে সংশ্লিষ্ট তাদের আপন আপন প্রতিষ্ঠানে মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বিষয়ে নিয়মিত গঠনের যেন ব্যবস্থা থাকে।

পোপ লিও বর্তমান “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা” ও অন্যান্য শিল্প উন্নয়নের বিপ্লবের প্রেক্ষিতে কাথলিক সামাজিক শিক্ষার তিনটি মূল্যবোধের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন: শান্তি, ন্যায্যতা এবং সত্যতা।

সমাপ্তিতে স্মরণ করি যে, লাউদাতো সি সপ্তাহ – ২০২৫ এবং দশম বার্ষিকী মহান জুবিলীবর্ষ – ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষে পালিত হচ্ছে। এই জুবিলীবর্ষের মূলভাব হচ্ছে: “আশার তীর্থযাত্রী আমরা”। আমরা এ জগতে তীর্থযাত্রী; আশাহীন হয়ে আমরা তীর্থযাত্রা করছি না। একটা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রী আমরা। সাধু পলের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন: “আশা তোমাদের ছলনা করবে না”। এই বিশ্বাসে আমরা ভালবাসায় সকলের সাথে একসঙ্গে পথ চলি।

ৱচনা- ৬: শান্তি পথ : শিক্ষা, শ্রম ও সংলাপ

পহেলা জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. বিশ্বশান্তি দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, তাঁর শান্তি বার্তায় বলেছেন যে, বিশ্বে যদি স্থায়ীভাবে শান্তি নিশ্চিত করতে হয় তাহলে শিক্ষা, শ্রম ও আন্তঃপ্রজন্মের মধ্যে সংলাপের পথ ধরে চলতে হবে।

প্রবক্তা ইসাইয়া বলেছেন: “আহা, কত না সুন্দর পাহাড়-পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শান্তি ঘোষণা করে!” (৫২:৭)। ইস্রায়েল জাতির জন্য শান্তির বার্তাবাহকের আগমন ইতিহাসের ধ্বংস-স্তুপ থেকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নব সূচনারই ইঙ্গিত বহন করে।

সমন্বিত মানব-উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধ ও সংঘাতের প্রচণ্ড শব্দের কারণে মানুষ আর সংলাপের কথা শুনতে পাচ্ছে না; বর্তমান বৈশ্বিক মহামারি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল ও পরিবেশের বিপর্যয় মারাত্মক আকার ধারণ করছে; মানুষের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বেড়েই চলছে, সর্বজনের উন্নয়নের স্থলে ব্যক্তিগত স্বার্থ কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেন সর্বদাই চলমান থাকছে। ন্যায়বিচার ও শান্তির জন্য দীন-মানুষের কান্নাকাটি এবং পৃথিবীর আতনাদ সর্বদাই শোনা যাচ্ছে।

বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় তিনিটি পথের উল্লেখ করেনঃ

প্রথমটি হচ্ছে *সংলাপ*। এই সংলাপ বিভিন্ন প্রজন্ম অর্থাৎ, পুরাতন ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে সংলাপ। সংলাপের জন্য প্রথমেই চাই একে অন্যের কথা শোনা, বিভিন্ন মতামত শেয়ার করা, পারস্পরিক সমঝোতায় আসা এবং এক সঙ্গে পথচলা। আন্তঃপ্রাজ্ঞানিক অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন যেখানে নবীনরা প্রবীণদের কাছ থেকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং প্রবীণরা নবীনদের কাছ থেকে সমর্থন, ভালবাসা, সৃজনশীলতা এবং কাজে গতিশীলতা লাভ করতে পারবেন। এই সংলাপটি একদিকে হবে অতীতের স্মৃতি এবং অন্যদিকে ভবিষ্যৎ-স্বপ্নের মধ্যে সংলাপ।

শান্তি প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পথ হচ্ছে *শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান*। শিক্ষার জন্য কিছু খরচ করা আসলে ব্যয় করা নয় বরং এটা হচ্ছে বিনিয়োগ, সমন্বিত মানব-উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা। অথচ গোটা বিশ্বে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার বাজেট কমানো হচ্ছে আর সমরাস্ত্রের জন্য বাজেট বৃদ্ধিই পাচ্ছে। শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান হচ্ছে মিলনাত্মক সমাজ নির্মাণের ভিত্তি যা সমাজে সম্বলিত করে আশা, সমৃদ্ধি ও প্রগতি। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সমাজের বিচ্ছিন্নতা ও প্রতিষ্ঠানের অবহেলার মধ্যে সৃষ্টি করে “যত্নের কৃষ্টি”। বিভিন্ন কৃষ্টি যেমন, লোক-কৃষ্টি, বিশ্ববিদ্যালয়-কৃষ্টি, যুব-কৃষ্টি, চারপাশের

কৃষ্টি, প্রযুক্তিজাত কৃষ্টি, অর্থনৈতিক কৃষ্টি, পরিবার-কৃষ্টি এবং মিডিয়া কৃষ্টির মধ্যে শিক্ষা যেন একটি সংলাপ সৃষ্টি করে। আমাদের বর্তমান সমাজে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন “শিক্ষাদর্শন”-এর কৃষ্টি সৃষ্টি করতে হবে যেখানে, পরিবার, ক্ষুদ্রসমাজ, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মসমূহ, সরকারসমূহ এবং গোটা মানব-পরিবারের নারী-পুরুষের পরিপক্ব গঠন অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে।

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয় অপরিহার্য পথ হচ্ছে শ্রম। শ্রম মানবব্যক্তির প্রকাশ ও তার আপন দান; একই সময়ে শ্রম হচ্ছে আমাদের নিজস্ব কর্তব্যনিষ্ঠা, আত্ম-বিনিয়োগ ও অপরের জন্য সহযোগিতা। কভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি শ্রম বাজারকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করেছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে: বহু অর্থনৈতিক ও উৎপাদনক্ষম কার্যক্রমের বিফলতা, কর্মসংস্থানের অভাব অথবা সাময়িক কর্মসংস্থান, স্বল্প আয়কারী মানুষের অবনমন, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবহারের ফলে নানাবিধ ক্ষতি ও লক্ষ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি, যুবাদের বেকারত্ব বৃদ্ধি তার সংশ্লিষ্ট পার্শ্ব কুপ্রভাব, সামাজিক নিরাপত্তার অপ্রতুলতা, শ্রম শঙ্কার ফলে সহিংসতা ও সংগঠিত অপরাধ বৃদ্ধি, ইত্যাদি।

শ্রম হচ্ছে এমন এক ভিত্তি যার ওপর নির্মিত হয় প্রতিটি সমাজের ন্যায্যতা ও মানব-সংহতি। প্রযুক্তির অধিকতর উন্নয়ন ক’রে মানবশ্রমের প্রয়োজনীয়তাহ্রাস করা সঠিক পথ হবে না; বরং তাতে মানবতার ক্ষতিসাধন করা হবে। শ্রম মানুষের জীবনকে অর্থপূর্ণ করে, জীবনের বিকাশ সাধন করে, মানব উন্নয়ন ও ব্যক্তির পূর্ণতা দান করে। গণমঙ্গলের লক্ষ্যে এবং সৃষ্টির সুরক্ষার জন্য মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান এবং শ্রম-পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্প্রতিকালে খুবই জরুরী।

পরিশেষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তাদের প্রতি যারা বৈশ্বিক মহামারির বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সকল প্রতিকূল পরিবেশে সক্রিয় শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। সকল রাষ্ট্রপ্রধান, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, যাজক, পালকীয় কর্মী এবং সদিচ্ছাপূর্ণ সকল নারী ও পুরুষের কাছে তিনি এই আবেদন জানাচ্ছেন: “আসুন আমরা, সাহস ও সৃজনী শক্তি নিয়ে শিক্ষা ও শ্রম ও আন্তঃপ্রজন্মের সাথে সংলাপ বরে একসঙ্গে পথ চলি”।

ৱক্তা- ৪: REFLECTION : GOLDEN JUBILEE OF JUSTICE & PEACE COMMISSION

I. Personal Interest: In my Academic Studies and Teaching ministry in Moral Theology, the Social Teachings of the Church played a very Important role. Some highlights

1. Teaching in the Major Seminary: Justice and Peace Course and Collaborator Fr. W. Timm, csc including Social Doctrine of the Church (1976-1990)
2. At the background of two Synods of the Bishops on “Justice in the World” (1971) and *Evangelii Nuntiandi* (1975), with endorsement of the CBCB, I was involved in organizing a National Seminar for five full days on “Justice and Evangelization” in 1978 for Bishops and Priests of Bangladesh of whom 90% were present.
3. Dissemination of Social Doctrine of the Church as presented in Papal Encyclicals and Apostolic Exhortations, Compendium of the Social Doctrine of the Church and FABC Documents received special attention and priorities in Bangladesh Church.
4. My special interests on Social Doctrine of the Church have been expressed in the work of translations, presentations, pastoral planning and communication through writings, teachings, talks and lectures. This work still continues.
5. Following the Bishop Chairman of the Justice and Peace Commission, we can identify Four Periods in the last fifty years: Bishop Joachim Rozario, csc (1974-1981), Bp. Michael D’Rozario, csc. (1982-1989) Bp. Patrick D’Rozario (1990-2008) and Bp. Gervas Rozario (2009---

II. Chairman of the Episcopal Commission for Justice and Peace, CBCB. (1990-2008).

Immediately before me was Bp. Michael D’Rozario as Chairman and Fr. R. W. Timm, csc. as Executive Secretary: Main issues were: Rights of Garment Workers, Just Salary in the Church, Domestic workers, Migrant Workers, Rights of the *Adibashis*, etc.

1. Commission Members were increased to 20-25 persons representing all the Dioceses and Desks. Secretaries: Fr. R. W. Timm, csc, Dr. Lawrence Das, and Fr. Albert Rozario)
2. During this period the most important activities were:
 - (a) Shifting of focus from National to grass-roots level. Awareness programs for education in justice and Peace, called *Chetonayan*, was developed and activities planned, providing also Legal assistance to the victims of injustice.
 - (b) Separation of Justice and Peace Commission from (East Asian People's Organization), HOTLINE (Hongkong), known as human rights activists took place.
 - (c) Activities to bring the Social Teachings of the Church through Formation programs at Diocesan and Parish levels with financial subsidies from projects funded by some Church Development Agencies.
 - (d) Planning and Working in close Cooperation with Caritas Bangladesh in order to have its own ad-intra ongoing formation as well as ad-extra mission and activities of Caritas Bangladesh.
 - (e) Translation of "Compendium of the Social Doctrine of the Church" by a Team of Translators was done and published by the Commission for dissemination of the social teachings.
 - (f) In the light of new issues of Social Teachings of the Church, the philosophy of and mandate for Caritas Bangladesh were updated.
 - (g) Concerns for Migrants and Refugees.

II. Justice and Peace Commission (2008-2025): Bishop Gervas Rozario as Chairman and Secretaries– Sharing may be done by them.

III. Suggestions for Future Orientation of the Commission.

- a) I appreciate the contributions that the Commission has been making in the fields of: Climate change, Safeguarding, Ecological and environmental concerns (Laudato si); Prison ministry, Migrants and Refugees, Trafficking, etc.

- b) I suggest some areas of considerations for future engagement of the Commission :
- Develop some modular courses for regular training on specific issues of the Social Teachings of the Church.
 - Formation of Leaders of the Christian Lay Organizations and Associations in the Social Teachings of the Church.
 - Priority of Human (moral) Formation for those who are engaged in human development. Modular courses for training should be developed including subjects like: human dignity and rights, ethical formation of the human person who has fourfold relations: to Individuals, to Communities, to Creation and to God (Creator, Protector and Savior).

রচনা- ৬ : সবুজ বিশ্বায়নে ও সমাজে ব্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় যুবাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা

উপরোক্ত বিষয়বস্তুটি অনেকটা বিশাল ও ব্যাপক। বাংলাদেশের জন্য যদিও প্রাসঙ্গিক তথাপি যারা বিশেষজ্ঞ নয় তাদের জন্য বিষয়টা অনেক কঠিন ও সহজে বোধগম্য নয়। বাংলাদেশের যুবারা বিষয়বস্তুর সাথে হয়তো সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, ফলে তাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করাটাও ততো সহজ হবে না। তথাপি বিষয়বস্তু ওপর সাধারণ কিছু তথ্য দিয়ে প্রাসঙ্গিক ও প্রায়োগিক কিছু ধারণা তুলে ধরছি।

৥ ক ৥ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা

বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন একটা প্রক্রিয়া। বিশ্বের বড়ো বড়ো উন্নত দেশ থেকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, বিশ্ব-দর্শন, ভাবনা ও কৌশল-পদ্ধতি বিশ্বের সবদেশে ছড়িয়ে যায় তা বুঝার জন্য বিশ্বায়ন একটি ধারণা রূপে পরিচিত। এর ফলে যে জিনিসটা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে যে, পৃথিবীর নানা জায়গায় যা কিছু হয় তা যেন নিজ ঘরে বসে যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে সব জানা যায়, পাওয়া যায়, এমন কি গ্রহণ করা যায় এবং তার দ্বারা অনায়াসে উন্নয়নের আদর্শ ও চিহ্ন হিসেবে প্রভাবিত হয়।

কিন্তু উন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন যা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তা কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিকট সবকিছু গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তাদের নিজস্ব কৃষ্টিগত ভাবে সঠিক ও সমন্বিত উন্নয়নের মডেল নয় বলে উপলব্ধি করছে। তাদের ধারণা উন্নয়নশীল দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থী হয়ে প্রবেশ করছে, যার ফলে উন্নত বিশ্বের সমস্যা দ্বারা উন্নয়নশীল দেশগুলোও জর্জড়িত হচ্ছে, উন্নত বিশ্বের অশুভ শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো একদিকে চাচ্ছে উন্নয়ন, আবার অন্যদিকে বিশ্বের সমস্যা সমাধানে জন্য বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার চাপ সর্বদাই অনুভব হচ্ছে অথবা বিশ্বায়নের অশুভ শক্তি, যেমন বিশ্বের ক্রমাগত উষ্ণতা, হ্রাস করার জন্য উন্নত বিশ্বের ভূমিকা খুবই যৎসামান্য এবং তাদের উন্নয়ন চালিয়েই যাচ্ছে, অথচ ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে উন্নত বিশ্ব থেকে প্রয়োজন অনুসারে সহযোগিতা পাচ্ছে না। যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাবে অন্যায্যতা।

সবুজায়ন

উপরোক্ত কারণে বিশ্বের অর্থনীতিতে একটা নতুন ধারণা এসেছে যাকে বলা হয় “সবুজ অর্থনীতি”। এই ধারণায় বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, এই সবুজ অর্থনীতিতে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সত্যিকারের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

সবুজ অর্থনীতি তিনটি নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই নীতিগুলো হল:

প্রথম: সকল উন্নয়ন হবে “পরিবেশ-কেন্দ্রিক”; অর্থাৎ প্রকৃতি ও পরিবেশ হবে সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু এবং মূল্যায়নের মাপকাঠি। উন্নয়নের জন্য পরিবেশকে নষ্ট করা কোনভাবেই ন্যায্য হবে না।

দ্বিতীয়: বিশ্বের মধ্যে উন্নয়নের একটি সীমা আছে। উন্নয়ন অপরিসীম বা সীমাহীন নয়; জগতের প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত এবং তার ব্যবহারে সম্পদকে নিঃশেষ করা যাবে না; তাতে আমাদের সাধারণের বসতবাটি এই পৃথিবীটাই শেষ হয়ে যাবে।

তৃতীয়: উন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া স্বরূপ আমদানী করে উন্নয়ন করা ঠিক হবে না। এ বিষয়ে প্রতিটি রাষ্ট্র ও দেশ আপন গণতান্ত্রিক পর্যায়ে, টেকসই উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত নেবে এবং কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

সামাজিক ন্যায্যতা

এ প্রসঙ্গে সমাজের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গটি আসে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ন্যায্যতা হচ্ছে: “যার যা প্রাপ্য তা তাকে দেওয়া”। এই নীতি অনুসারে মানুষের যা প্রাপ্য তা হচ্ছে মৌলিক অধিকার, আরও ব্যাপকভাবে বলা যেতে পারে: মানবাধিকার। উদাহরণ স্বরূপ মৌলিক মানবাধিকারগুলো হচ্ছে: বেঁচে থাকার অধিকার, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার এবং আরও অনেক। এই সব অধিকার লাভ করা মানুষের প্রাপ্য; আর তা থেকে বঞ্চিত হওয়া হচ্ছে অন্যায়তা। এই অন্যায়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা

বিশ্বের সবুজায়ন ও সমাজের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ যে সামাজিক জীব। সব মানুষের মধ্যে একটা বন্ধন আছে, সম্পর্কিত তার জীবন, এ বিশ্বটা সবার। সুতরাং মঙ্গল প্রতিষ্ঠা ও অমঙ্গল দূর করার দায়িত্ব সবারই। এ দায়িত্ব সমন্বিত। ইদানিং পোপ মহোদয় দুটো বিশ্বজনীন পত্র লিখেছেন: “লাউদাতো সি” (২০১৫ খ্রি.) এবং “ফ্রাতেল্লি তুত্তি” (২০২২ খ্রি.) যেখানে তিনি বলেছেন: এই বিশ্বটা বা পৃথিবীটা আমাদের সবার বসতবাটি, আমরা এই জগতে

একটি পরিবাররূপে বসবাস করি, আমরা সকলে ভাইবোন। এই ভাবনা নিয়ে একসঙ্গে, ঐক্যবদ্ধভাবে জগতের সমস্যা সমাধান ও উন্নয়ন করতে হবে। যুবাদের কাছেও ঠিক একই আহ্বান আসে। একা একা নয়, তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সামাজিক ব্যাপারে, সমাজবদ্ধ হয়ে, সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

॥ খ ॥ সবুজ বিশ্বায়নে ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা

সবুজ বিশ্বায়নে ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য মূল ও কেন্দ্রীয় বিষয় হলো: প্রকৃতি ও পরিবেশের যত্ন ও সুরক্ষা।

এই পৃথিবীতে আমাদের নিবাস। যে এলাকায় আমাদের অবস্থান, যে বসতবাড়িতে আমরা বাস করি সেখানকার প্রকৃতি কত অপব্যবহার, কত দুর্ব্যবহারে আক্রান্ত। আমাদের আশেপাশের প্রকৃতি আজ চিৎকার করে বিলাপ করছে; সৃষ্টি “প্রসবদেনায় গুমড়ে মরছে” (রোমীয় ৮:২২)। প্রকৃতির মধ্যে দেখি বায়ু দূষণ; বন-বৃক্ষ নিধনে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড; ত্রুটিপূর্ণ ও মাত্রাতিরিক্ত যানবাহন এবং নির্গত হচ্ছে কালো ধোঁয়া। পানি দূষণের ফলে পানীয় জলের অভাব; পানি যতটাই দুর্গন্ধ ততটাই বিবর্ণ; অন্যদিকে গৃহস্থালী বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, মাত্রাতিরিক্ত সার ব্যবহার, জলাবদ্ধতা, প্রয়োজন মতো পয়গনিষ্কাশন ও বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থাপনার অভাবসহ নানাবিধ কারণে প্রতিনিয়ত পানি দূষিত হচ্ছে। খাল-বিল-ডোবা-নালা ও জলাশয় দিন দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে; ফলে পানি-ধারণের ক্ষমতা ধরণী হারিয়ে ফেলছে; অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, তাপ-খরা, ঝড়-বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ চরম আকার ধারণ করছে। প্রকৃতিতে জীব-বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে; ঘরে-ঘরে, কলকাতানা-প্রতিষ্ঠানে, হাট-মাঠ-বাজারে, গ্রামে-শহরে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে শব্দ দূষণ; অপরিবর্তিত নগরায়ন, আবাসিক এলাকায় শিল্পের প্রবেশ, সুন্দর বসতবাড়ি বস্তিতে পরিণত হচ্ছে। মৃত্তিকা দূষণ, দেহ দূষণ ও মাদকাসক্তি, ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসন, ইত্যাদির মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে পরিবেশের বিপর্যয়। তাই প্রকৃতি কাঁদছে, সজোরে আত্ননাদ করছে।

(১) প্রকৃতি ও পরিবেশ: “লাউদাতো সি” বিশ্বজনীনপত্রে পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষা

সৃষ্টি ঈশ্বরের মঙ্গলবাণী। এ প্রসঙ্গে পোপ মহোদয় বলেন যে, ঈশ্বর আমাদের মুক্তিদাতা ও পরিব্রাতা; আবার তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আদিপুস্তকে সৃষ্টির বিবরণীতে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের জীবন ঈশ্বর, প্রতিবেশী ও প্রকৃতির সাথে সম্পর্কময় জীবনের উপর ভিত্তি করে গড়া। (দ্র: আদিপুস্তক ১-৩ অধ্যায়)

পোপ মহোদয় বলেন যে, আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী আমাদের আছে ত্রিমুখী খ্রিস্টীয় দায়িত্ব : সৃষ্টি ও প্রকৃতির প্রতি, সৃষ্টিকর্তার প্রতি এবং মানুষের প্রতি, বিশেষভাবে দরিদ্র মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আমাদের বিশ্বাস-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঈশ্বরপ্রেম ও প্রতিবেশী প্রেমের সাথে প্রকৃতি প্রেম দশ আজ্ঞারই অবিচ্ছেদ্য দাবি। প্রকৃতির উপর যে কোন ধরনের আক্রমণ মানব-মর্যাদার পরিপন্থী। আবার অন্যদিকে প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের হৃদয়ে যদি না থাকে মমতা, কোমলতা ও ভাবনা, তাহলে প্রকৃতিকেও আমরা প্রকৃত অর্থে ভালবাসতে পারি না।

পরমেশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি বললেন: “তোমরা বশীভূত কর।” এ কথা দিয়ে ঈশ্বর মানবজাতিকে আহ্বান করলেন যেন মানুষও ঈশ্বরের মতো সৃষ্টিকে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করে। ঈশ্বর আমাদের হাতে সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যেন আমরা বিশ্বস্ত কর্মচারী হয়ে সেই দায়িত্ব পালন করি।

পোপ মহোদয় আরও বলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনেকভাবে মানুষের উন্নয়ন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা যদি সকল ব্যক্তি ও প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর সম্পদ বিনিয়োগ না করা হয়, তাহলে সেই ব্যবসা অযৌক্তিক, অন্যায় ও মানবতার পরিপন্থী।

বর্তমান পরিবেশের দূরাবস্থা ও বিপর্যয়ের মূল কারণে রয়েছে মানুষ। পরিবেশের কথা না ভেবে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির কথা ভেবেছে। যার ফলে এসেছে প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে মারাত্মক বিপর্যয়। মানুষকে এর বিরুদ্ধে বিবেকী সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিকার করতে হবে।

পরিবেশ রক্ষার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি হিসেবে পোপ মহোদয় “সমন্বিত পরিবেশ”, অর্থাৎ পরিবেশকে সামগ্রিক বা অখণ্ডভাবে দেখার নীতির বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশকে মানবতা, পরিবার ও নগরায়ন, প্রভৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল মাত্র বাসের স্থান বলে বিবেচনা করা যাবে না। “সমন্বিত পরিবেশ” ভাবনা হতে হবে ন্যায়বিচারের নতুন নীতি।

মানব পরিবেশ “গণমঙ্গল” নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে যারা দরিদ্র অবস্থায় পড়েছে তাদের প্রতি আমাদের ভালবাসায় অগ্রাধিকার দেওয়া ন্যায্যতার দাবি।

“সমন্বিত পরিবেশ” নীতি নিত্যদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটা বিরাট সামর্থ্য মানুষের আছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি, বিভিন্ন দল ও সংস্থার সৃজনশীলতা ও উদারতা লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয়। তারা প্রকৃতির বিরূপ আচরণ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে, উৎপাদনশীল

হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে, অনেক অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সফল-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পোপ মহোদয়ের লেখা প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক সর্বজনীন পত্রটি অধ্যয়ন করতে হবে। এই পত্রের আলোকে পরিবেশ বিপর্যয়ের সঠিক অবস্থা জানতে ও তার লক্ষণগুলো বুঝতে এবং তার মূল কারণগুলো আবিষ্কার করতে হবে। বিভিন্ন সফলতার উদ্যোগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং সচেতনতা ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিবেশ বিপর্যয়ের অবস্থা জানা ও বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের প্রয়োজন আলাপ-আলোচনা, ঐকমত্য পোষণ ও বাস্তব কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা যেখানে আমরা ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে প্রত্যেকে জড়িত হব। এ ব্যাপারে আমাদের সদিচ্ছা ও নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে পোপ মহোদয় নির্দেশ দেন।

পোপ মহোদয় নির্দেশ দিয়ে আরও বলেন যে, পরিবেশ রূপান্তরের জন্য প্রথমত প্রয়োজন অন্তরের পরিবর্তন। তাই অন্তরের পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে আর তার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিটি শিক্ষালয় জড়িত থাকবে, যেমন পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ মাধ্যম, ধর্মশিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

পরিবর্তনের সূচনা হবে “নতুন জীবনযাপন পদ্ধতি” গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। প্রতিদিনের জীবন-অভ্যাসে আসবে পরিবর্তন, যেমন: জল ব্যবহারে পরিমিতি, বায়ু ও শব্দ দূষণের বিপরীতে কার্যকরী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ; বৃক্ষরোপন ও যত্ন, যত্রতত্র বর্জ্য না-ফেলানো, জৈবসারের ব্যবহার, অপচয় ও ‘ফেলে-দেওয়ার’ আচরণ বর্জন; বাড়ি ও জমির সীমানা-নির্ধারণ, গৃহ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং জমিজমা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পরিবেশবান্ধব মনোভাব এবং প্রতিবেশীর প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ প্রেম; প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ, ভোগ ও গচ্ছিত করার অভ্যাস বর্জন; জিনিসপত্রের সঠিক ব্যবহার, পুনঃব্যবহার ও নতুনভাবে ব্যবহারের অভ্যাস; বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও অপচয়রোধ।

পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, আমাদের থাকবে একটা ধ্যানী মনোভাব: প্রকৃতির সবকিছুকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার মনোভাব; আমার নয়, সবই পেয়েছি পরমেশ্বরের কাছ থেকে -- এরূপ ভাব। তাছাড়া ঈশ্বর তো আমাদের দিয়েছেন পরিবেশ বিশ্লেষণ ও পরিবর্তন করার সক্ষমতা। ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের দেবেন সৃজনশীলতা এবং নব উদ্যম।

স্বাধীন ও সচেতনভাবে যখন আমরা সংযমী জীবন যাপন করি তখন অন্তরে উপলব্ধি হয় গভীর আনন্দ -- মঙ্গলবাণীর আনন্দ। নতুন করে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা একে অন্যের জন্য প্রয়োজন, অন্যের প্রতি আছে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। ভালো হওয়া, ভাল করা ও ভালো থাকার একটা মূল্য আছে।

পোপ মহোদয় প্রতিদিনের খ্রিস্টীয় জীবন-সাধনায় নিয়মিত মন-পরীক্ষার সাথে আরেকটি মাত্রা যোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা যেন প্রতিদিন গভীরভাবে চিন্তা করি যে, আমরা ঈশ্বরের সাথে, নিজের ও অন্যের সাথে এবং সৃষ্টি ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলনসাধনায় জীবনযাপন করি। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস আমাদের যাত্রাসঙ্গী হয়ে থাকুন, কেননা তিনি প্রকৃতিপ্রেম ও দরিদ্রদের প্রতি ন্যায্যতা, সামাজিক কর্তব্যনিষ্ঠা ও অন্তরীণ শান্তির আদর্শ। কুমারী মারীয়া, যিনি তাঁর সন্তানের যত্ন নিয়েছেন সেই একই মাতৃত্ব ও বেদনা নিয়ে তিনি আমাদের যত্ন নিন। সাধু যোসেফ, মণ্ডলীর যিনি প্রতিপালক, তিনি আমাদের শিক্ষা দিন যাতে আমরা উদারতা ও কোমলতার সাথে আমাদের হাতে ন্যস্ত এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারি।

ধরিত্রীমাতার বন্দনাগীতি

সবাই মিলে আমরা এই ধরনীতে পথ চলি
সবাই মিলে আমরা করি তার বন্দনাগীতি
সবাই মিলে আমরা তাকে ভালবাসি
সবাই মিলে আমরা তার ক্ষত নিরাময় করি
আপন অন্তরে ধরিত্রীমাতার হৃদয় স্পন্দিত ॥
সবাই মিলে যুক্ত আমরা ধরিত্রীমাতার সাথে
সবাই মিলে শ্রবণ করি অন্তরে তার পুণ্যগান
সবাই মিলে করি তাকে স্পর্শ
সবাই মিলে সারিয়ে তুলি তার যত ক্ষত
আপন অন্তরে ধরিত্রীমাতার হৃদয় স্পন্দিত ॥

Original: *Mother Earth Song*: Artist Denean (Native American)

পরিশেষে পোপ মহোদয়ের কথার সাথে একাত্ম হয়ে প্রার্থনা করি: “হে পবিত্র আত্মা, এই ধরণীকে পিতার ভালবাসায় পরিচালনা কর; প্রসববেদনাতুর সৃষ্টির সঙ্গে তুমি পথ চল; আমাদের হৃদয়ে স্থান নাও, যাতে যা কিছু মঙ্গল তা যেন আমরা করতে পারি। “তোমার প্রশংসা হোক”!

(২) সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পরিবেশ উদ্‌যাপন কাল

পোপ ফ্রান্সিসের “লাউদাতো সি” (২০১৫ খ্রি.) প্রকাশের পর, প্রতি বছর পত্র-প্রকাশের বার্ষিকীতে, ৭ বছরের মেয়াদপূর্তিতে এবং প্রতিবছর একমাসের বেশী সময় ধরে (১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর) সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পরিবেশের উদ্‌যাপন কাল পালিত হয়ে আসছে। আসছে ৪ অক্টোবর “লাইদাতো সি” বার্ষিকীতে পোপ মহোদয় আরেকটি পত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছেন।

এই উদ্ব্যাপন কালে আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর বিশপগণ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে একটি পালকীয় পত্র প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন, যার উল্লেখ নিম্নে করা হল। আবার এবারেও সিবিসিবি-এর “শান্তি ও ন্যায্যতা কমিশন” এ বছরের আন্তর্জাতিক উপাত্ত বিষয় “ন্যায্যতা ও শান্তি প্রবাহিত হোক” উপর ভিত্তি করে আজ, ১৭ সেপ্টেম্বর “লাউদাতো সি সানডে” পালিত হচ্ছে এবং বিশেষ উপদেশসহ খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৩) বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর নির্দেশনা: সৃষ্টি-প্রকৃতির যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের করণীয়

- (ক) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : নিজের দেহ থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, উপাসনালয়, স্কুল-কলেজ ও ক্লাসরুম, অফিস-আদালত, রাস্তাঘাট, কর্মস্থল, সমাবেশস্থল, ইত্যাদি সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- (খ) অপচয়রোধ প্রয়োজন : অতিরিক্ত খরচপাতি, জিনিসপত্র ও দ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহার, পানি ও বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার, ভোজনবিলাস ও ভোগের মানসিকতা বর্জন করা, ফেলে দেয়ার সংস্কৃতি পরিহার করা, জিনিসপত্রের সঠিক ব্যবহার, পুনঃব্যবহার ও নতুনভাবে ব্যবহারের অভ্যাস করা, মিতব্যয়ী ও ত্যাগী মনোভাব অনুশীলন করা।
- (গ) দূষণযুক্ত পরিবেশ হ্রাস করা : বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করা, শব্দ, বায়ু ও জল - সকল প্রকার দূষণমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা, নিজে এবং অন্যদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করা।
- (ঘ) প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহারে সচেতন হওয়া : প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যাদি (যেমন- প্লাস্টিক ব্যাগ ও প্যাকেট) ব্যবহার না করা, এখানে সেখানে প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যাদি ছুঁড়ে ফেলে মাটি, জলাশয় ও পরিবেশ নষ্ট না করা।
- (ঙ) স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ : প্রকৃতিজাত, বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু খাদ্য আহার ও পানীয় পান করা, পরিমিত পানি ব্যবহার করা। সহভাগিতার আলোকে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে পারি; এতে পরিবার, পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রতি আরও বেশি যত্নবান ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠার সুযোগ থাকবে।
- (চ) বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম : প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষায় স্কুল-কলেজ, গির্জা প্রাঙ্গণ, কনভেন্ট, হাসপাতাল ও অন্যান্য খালি জায়গায় ফলজ, ঔষধি ও টেকসই বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে প্রকৃতিকে আরো সবুজ ও সতেজ করা, ছেলেমেয়েদের/ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃক্ষরোপণ ও সামগ্রিক পরিবেশ ও প্রকৃতির

যত্নে আরো সচেতন ও মনোযোগী করে তোলা, বাড়ির আশেপাশে, ছাদে সবজি বাগান করা।

(ছ) প্রকৃতি-পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষাদান ও সম্মিলিত কার্যক্রম : ছেলেমেয়ে/ছাত্র-ছাত্রী ও আগামী প্রজন্মকে বিশ্ব-প্রকৃতির বিপর্যয় ও নানাদ্রবের সমস্যা-সংকট সম্পর্কে অবহিত করা ও সচেতন করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে আন্দোলন সৃষ্টি করা। পরিবেশবাদীদের সাথে যুক্ত হওয়া, আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয় গ্রুপ তৈরি ও নেটওয়ার্কিং করা। প্রতিবেশীদের প্রতি, বিশেষভাবে দরিদ্র, অসহায় বা বিপদাপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহনশীল আচরণ ও মনোভাব গঠনে নিয়মিত শিক্ষাদান।

পোপ ফ্রান্সিস স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন- মানুষ প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রতিবেশীদের প্রতি অনেক ক্ষতি করে চলেছে। তিনি আরও বলেছেন ‘পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে মন পরিবর্তন’ অপরিহার্য, যাতে চতুর্দিকের জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপসংহার: যুবাদের করণীয়

সবুজ বিশ্বায়নে ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় যুবাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বিষয়ে তোমার সম্মেলনে যোগ দিয়েছো। তোমাদের কাছে আমার আহ্বান নিম্নরূপ:

প্রথম: তোমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবুজ বাংলাদেশ গড়ার জন্য এবং এভাবে সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদের জীবন-সম্পর্কিত এবং সমাজ-সম্পর্কিত এবং তোমাদের সামর্থ অনুসারে দু’টি/একটি বিষয় তোমরা চিহ্নিত কর। (চিহ্নিত করার জন্য সিবিসিবি-এর প্রস্তাবিত করণীয় থেকে বেছে নিতে পার)।

দ্বিতীয়: “লাউদাতে সি”-বর্ণিত পোপ মহোদয়ের শিক্ষা থেকে উপরোক্ত বিষয়ে কিছু করার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করে পরস্পরের সাথে পর্যালোচনা করে এবং কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা ও প্রার্থনার মাধ্যমে, তোমার কাছ থেকে পবিত্র আত্মা কী চান তা শ্রবণ কর।

তৃতীয়: ঐক্যবদ্ধ হয়ে, একসঙ্গে করার জন্য বাস্তব কর্মসূচী বেছে নেও। এর জন্য জ্যেষ্ঠদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পার।

চতুর্থ: তোমাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তোমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে করার প্রক্রিয়া গ্রহণ কর।

যুবাদের মঙ্গল কামনা করি; সম্মেলনের সফলতার জন্য আশীর্বাদ করি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. *Laudato Si*: Praise be to you My Lord – On Care for our Common Home, বাংলা অনুবাদ: “তোমার প্রশংসা হোক”, Pope Francis, May 24, 2015
২. পালকীয় পত্র, সি.বি.সি.বি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
৩. সি.বি.সি.বি-এর “ন্যায় ও শান্তি কমিশনের নির্দেশনা, “লাউদাতো সি” রবিবার পালনের নির্দেশনা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি.।

ৱচনা- ৬: কাথলিক মণ্ডলীতে শিক্ষাদাতের সেবাকর্ম

(১) কাথলিক মণ্ডলীর মূল মিশন: “মঙ্গলসমাচার ঘোষণা কর” (মথি ১০:৭-৮; মার্ক ১৬:১৫)

- > “মঙ্গলসমাচার ঘোষণা কর” – এটাই হচ্ছে মণ্ডলীর মিশনের জন্য যিশুর প্রধান আদেশবাণী।
- > কাথলিক মণ্ডলী যা-কিছু বলে, যাকিছু করে তার সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে মণ্ডলী তার দায়িত্ব পালন করে।

(২) মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করার জন্য কাথলিক মণ্ডলী কী করে?

(ক) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে একাত্ম হয়, (খ) দূরত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে, (গ) প্রয়োজনে মানুষের মাঝে নেমে এসে তাদের জীবন বাস্তবতার সাথে একাত্ম হয়, (ঘ) অপরের মধ্যে যিশুর যন্ত্রণাময় দেহকে স্পর্শ করে। (কাউন্সিলিং-এর মধ্যে উক্ত বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে)

(৩) কাথলিক মণ্ডলীর ভক্তবিশ্বাসী/সদস্য কারা ?

- > দীক্ষাপ্রাপ্ত সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী: ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী নারী-পুরুষ ও যাজক/বিশপ
- > কাথলিক মণ্ডলী “মিলন-সমাজ”: পবিত্র ত্রিত্বের সঙ্গে মিলন; বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের মধ্যে মিলন-সমাজ;
- > একসঙ্গে পথচলা, সহযাত্রী; যারা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত (শিষ্যচরিত ২:৪২)।
- > যারা সন্ন্যাসব্রতী ও অভিষিক্ত সেবাকর্মী তারা ই শুধু মিশনারি নয়। প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসী দীক্ষান্নানের গুণে একজন মিশনারি; “যখন সে যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালবাসা উপলব্ধি করে”।

(৪) কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষার সেবাকর্ম

শিক্ষার মূল লক্ষ্য: (ক) খ্রিস্টীয় নৃতাত্ত্বিক ভাব ধারায়,
(খ) মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন করা,
(গ) যাতে খ্রিস্টীয় শিষ্যত্ব গঠনের জন্য অবদান রাখতে পারে।

(ক) খ্রিস্টীয় নৃতাত্ত্বিক দর্শন: মানবব্যক্তি কে?

সত্তা-বিশিষ্ট সংজ্ঞা: যে প্রাণীর যুক্তিসত্তা আছে: বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি বিশিষ্ট প্রাণী;
শিক্ষা হচ্ছে: বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশ সাধন করা;
মন ও হৃদয়ের গঠন করা;
জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা।

সম্পর্ক-বিশিষ্ট সংজ্ঞা: সম্পর্ক-বিশিষ্ট প্রাণী; মানবব্যক্তি হচ্ছে সম্পর্ক-বিশিষ্ট সত্তা।

শিক্ষা হচ্ছে: সম্পর্কময় সত্তার বিকাশ সাধন করা এবং সংশ্লিষ্ট
মূল্যবোধ অর্জন ও বিকাশ সাধন

ক) অপর ব্যক্তির সাথে সম্পর্কময় সত্তা : সম্পর্ক থেকে ব্যক্তিক
মূল্যবোধের উৎপত্তি

খ) অপর দলের সাথে সম্পর্কময় সত্তা : সম্পর্ক থেকে সামাজিক
মূল্যবোধের উৎপত্তি

গ) জগৎ-প্রকৃতির সাথে সম্পর্কময় সত্তা: সম্পর্ক থেকে পরিবেশগত
মূল্যবোধের উৎপত্তি

ঘ) “পরম”এর সাথে সম্পর্কময় সত্তা: সম্পর্ক থেকে
আত্মিক/আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উৎপত্তি।

**(খ) মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন: মূল্যবোধ-শিক্ষাদানের সেবাকর্মঃ মঙ্গলসমাচার
ঘোষণা করা**

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজের দিকে তাকিয়ে যা কিছু অশুভ দেখছি, তার মূল
কারণ হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা ও চর্চার অভাব ও ঘাটতি।

প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমের মধ্যে মানবব্যক্তির সামগ্রিক দিক,
অর্থাৎ: ব্যক্তিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, আবেগিক, বৌদ্ধিক, আচরণিক, সামাজিক,
প্রকৃতি-পরিবেশিক, কৃষ্টিক ও রুচিসম্পন্ন, প্রভৃতি দিকসমূহে, কী কী মূল্যবোধ শিক্ষা
নিতে ও দিতে হবে তা শিক্ষা দেওয়া।

মানবিক মূল্যবোধ উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে: শিক্ষার্থীরা কীভাবে আরও ভাল মানুষ
হতে হয়, তা যেন তারা নিজেরা জানবে এবং তারা এমন সমাজ গঠন করবে যেখানে
থাকবে: সমতা, ন্যায্যতা, স্বাধীনতা, সততা, শান্তি, “পরম”এর প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি
ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা, মানবিক ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক বন্ধুত্ব।

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়: “আমাদের সুন্দর জগৎ”: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

বাড়িতে খুশি থাকা, দয়াশীল হওয়া, স্কুলের বাগানের যত্ন নেওয়া, দেশীয়
প্রতীকগুলো জানা, শিক্ষকদের সম্মান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সময়ের গুরুত্ব,
উৎসবাদি, খাওয়া-দাওয়ার সময়ে শিষ্টাচার এবং কৃতজ্ঞতা।

নিজস্ব স্কুল সম্বন্ধে ধারণা, প্রার্থনা, ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টি বলে নিজেকে জানা,
কথা/অঙ্গীকার রক্ষা করা, ভাল অভ্যাস গড়ে তোলা, শিশুদিবস পালন করা, সততা,
মনোযোগ, চিড়িয়াখানার মধ্যে পশু-পাখিদের আচরণ, ধন্যবাদ দিবস পালন।

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, পিতামাতার প্রতি সম্মান, ভাল দিক দেখা, সুবর্ণ-নীতির তালিকা, আমাদের জাতীয় পতাকার অর্থ ও কেন? ক্ষমা, একতা ও দলবদ্ধতার শক্তি, আশান্বিত, সংসাহসী ও সহযোগী হওয়া, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

ঈশ্বর আমাদের রক্ষাকর্তা, আমাদের প্রতিবেশী কে?, শেয়ার করা, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, প্রতিদিনের খাদ্য-আহার কে দেয়?, সময়ানুবর্তিতা, কয়েকটি ধর্মীয় উৎসব, খনিজ সম্পদ: পানি; দলের নেতার মধ্যে যে মূল্যবোধগুলো ভাল লাগে, দৃঢ়তা এবং ইচ্ছাশক্তি, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

(খ) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়: “আমরা পরিবার স্বরূপ”: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ঈশ্বর যে শক্তিগুলো আমাদের দিয়েছেন তা দেখা, জ্যেষ্ঠদের ও অসুস্থদের সম্মান করা, আশা সঞ্চর করা, জাতির পিতা এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের স্মরণ, খনিজ সম্পদ: বৃক্ষ ও বন রক্ষা করা, ক্রীড়া-প্রমোদ, আত্ম-সংযম, পড়াশুনার অভ্যাস গড়ে তোলা, আনন্দিত হওয়া, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের দেহ পবিত্র, কর্তব্যনিষ্ঠ, দেশ-বরেণ্যদের স্মরণ, আত্ম-শৃঙ্খলা। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দাদা-দাদি ও নানা-নানীদের সম্মান, আনুগত্য, অভিবাসীদের সাহায্য করা, একাগ্রতা ও কঠিন শ্রম, শান্তি।

ঈশ্বরের দানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, ধৈর্য্য, খাঁটি বন্ধুত্ব, দেশ-বরেণ্যদের স্মরণ করা, প্রকৃতি ও প্রাণিকুলের প্রতি সম্মান ও যত্ন, অনাথ শিশুদের সাথে দিন কাটানো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সংযম, সুস্থ প্রতিযোগিতা, ক্লাশের ক্যাপ্টেন/লিডারদের মধ্যে গুণাবলি, একসঙ্গে কাজ করার শক্তি, সততা।

ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন, অন্যকে বুঝা, মমতাবোধ, অর্জন, সং ও সাধারণ জীবনযাপনের উদাহরণ, দেশ-নির্মাণকারী, পৌরসভার কর্মীবৃন্দ, সমাজকর্মীবৃন্দ, অন্যের প্রয়োজনে দান করা, ন্যায্যতা, কৃষকদের স্বীকৃতি, দায়িত্বশীলতা।

(গ) উচ্চ বিদ্যালয়: “শিখনীয় মূল্যবোধ ও জীবন-কৌশলসমূহ”

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জীবন-কৌশল সম্পর্কে সক্ষম করা, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের মধ্যে আছে: মনোভাব, আবেগিক পরিপক্বতা, আত্ম-সম্মান, আত্ম-বিশ্বাস এবং আত্ম-প্রেরণা।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জীবন-কৌশল সম্পর্কে সক্ষম করা; জীবন-কৌশলের মধ্যে আছে: আত্মচেতনা, আত্ম-মূল্যায়ন, চিন্তা, সৃজনশীল চিন্তা, যুক্তি-বাগিতা, সমস্যা সমাধান, পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, প্রকৃতিগত যোগাযোগ, আত্ম-নির্ভরশীলতা, আত্ম-ব্যবস্থাপনা কৌশল, দলগত ব্যবস্থাপনা, দৃষ্টিভঙ্গি-ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব।

(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়: “সফল জীবন”: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যসমূহ, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা এবং আচরণের অপ্রাসঙ্গিকতা, হতাশা ও প্রতিকার, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, যৌনজীবন, যৌনরোগ, দ্রুতহত্যা, সত্তা-প্রকৃতির অপব্যবহার, মানবাধিকারসমূহ।

(গ) শিক্ষার প্রত্যাশা: যাতে খ্রিস্টীয় শিষ্যত্বে গঠনের জন্য অবদান রাখতে পারে।

(৫) শিক্ষা সেবাকর্মে কাউন্সেলিং

- > সংকীর্ণ অর্থে: সংকটাপন্ন, সমস্যা-জড়িত ব্যক্তির সাথে সংলাপ: সম্পর্ক স্থাপন করা, কথা শ্রবণ করা, বিশ্লেষণ করা, আলো দান করা, পরামর্শ দান;
- > ব্যাপক অর্থে: ব্যক্তির সঙ্গে যাত্রা করা: কারো সহযাত্রী হওয়া, জীবনের সাথী/সঙ্গী হওয়া; সংসঙ্গ দান করা।
- > ব্যাপকতর অর্থে: মূল্যবোধ শিক্ষাদানের সেবাকর্ম: মানবিক মূল্যবোধের দিকে চালিত করা: স্বাভাবিক পরিবেশে, মূল্যবোধের দিকে নিয়ে যাওয়া।

(৬) বাংলাদেশে শিক্ষা সেবাকর্ম : সমাজের “লবন”, “আলো” ও “খামি” স্বরূপ:

- > বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজে মণ্ডলী ক্ষুদ্র; সংখ্যা বিবেচনায়, বাহ্যিকতা বিবেচনায়, বলশক্তি বিবেচনায়, ইত্যাদি।
- > বৃহত্তর মাঝে ক্ষুদ্রের ভূমিকা: যিশুর নির্দেশনা: “লবন”, “আলো” ও “খামি” এবং “সর্বদানা”-র মতো ঐশ্বরাজ্যে নিদর্শন।
- > প্রতিযোগিতায় বৃহৎ না হয়ে বরং আপন সত্তায় শক্তিশালী, দক্ষ, সুদৃঢ়প্রসারী, দীর্ঘকালীন ও স্থায়ী হওয়া।

Sources:

1. Pope Francis, *Apostolic Constitution: Preach the Gospel*, Vatican, March 19, 2022
2. Catholic Bishops Conference of India (CBCI): *National Curriculum on Value Education*, India, 2022

ৱচনা- ৭: মূল্যবোধ-শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম

ভারতের কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিসিবিআই) **মূল্যবোধ-শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম** প্রস্তুত করেছে সাথে সাথে পুস্তকও রচনা করা হয়েছে। ইংরেজীতে রচিত, এবং সিসিবিআই দ্বারা ২০২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তালিকা থেকে নিম্নে বাংলায় অনুবাদ করে নিম্নে পাঠ্যসূচির কেবলমাত্র বিষয়গুলো প্রকাশ করছি। কোন কোন ক্ষেত্রে দেশোপযোগী করে মূল্যবোধগুলোর নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

ছোট থেকে ধাপে ধাপে কোন্ কোন্ মূল্যবোধ শিখতে হবে, চর্চা করতে হবে, জানতে হবে, মূল্যায়ন করতে হবে, ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য, পিতামাতা ও অভিভাবকদের জন্য, শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের জন্য অনেক সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজের দিকে তাকিয়ে যাকিছু অশুভ দেখছি, তার মূল কারণ হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখিত মূল্যবোধগুলোর শিক্ষা ও চর্চার ভীষণ অভাব ও ঘাটতি রয়েছে।

প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমের মধ্যে মানবব্যক্তির সামগ্রিক দিক, অর্থাৎ: ব্যক্তিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, আবেগিক, বৌদ্ধিক, আচরণিক, সামাজিক, কৃষ্টিক ও রুচিসম্পন্ন, প্রভৃতি দিকসমূহে, কী কী মূল্যবোধ শিক্ষা নিতে ও দিতে হবে তা তুলে ধরা হয়েছে।

এই পাঠ্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে: শিক্ষার্থীরা কীভাবে আরও ভাল মানুষ হতে পারে তা যেন তারা নিজেরা জানতে পারবে এবং তারা যেন এমন সমাজ গঠন করবে যেখানে থাকবে: সমতা, ন্যায্যতা, স্বাধীনতা, সততা, শান্তি, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতা।

এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে আছে: সাংবিধানিক মূল্যবোধ, মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার এবং শিশু অধিকার। এগুলো শিক্ষার্থীদেরকে অর্থবহ জীবনের জন্য ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তাদেরকে গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

১ম শ্রেণি থেকে ৪র্থ শ্রেণি: “আমাদের সুন্দর জগত” (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

১ম শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

বাড়িতে খুশি থাকা, দয়াশীল হওয়া, স্কুলের বাগানের যত্ন নেওয়া, দেশীয় প্রতীকগুলো জানা, শিক্ষকদের সম্মান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সময়ের গুরুত্ব, উৎসবাদি, খাওয়া-দাওয়ার সময়ে শিষ্টাচার এবং কৃতজ্ঞতা।

২য় শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

আমাদের স্কুল সম্বন্ধে ধারণা, প্রার্থনা, আমি ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টি বলে জানা, কথা/অঙ্গীকার রক্ষা করা, ভাল অভ্যাস গড়ে তোলা, শিশুদিবস পালন করা, সততা, মনোযোগ, চিড়িয়াখানার মধ্যে আচরণ, ধন্যবাদ দিবস পালন।

৩য় শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, পিতামাতার প্রতি সম্মান, ভাল দিক দেখা, সুবর্ণ-নীতির তালিকা, আমাদের জাতীয় পতাকার অর্থ ও কেন? ক্ষমা, একতার ও দলবদ্ধতার শক্তি, আশান্বিত হওয়া, সংসাহস, আমাদের সহযোগী, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

৪র্থ শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ঈশ্বর আমাদের রক্ষাকর্তা, আমাদের প্রতিবেশী, শেয়ার করা, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, প্রতিদিনের খাদ্য-আহার কে দেয়, সময়ানুবর্তিতা, কয়েকটি ধর্মীয় উৎসব, খনিজ সম্পদ: পানি, দলের নেতার মধ্যে যে মূল্যবোধগুলো ভাল লাগে, দৃঢ়তা এবং ইচ্ছাশক্তি, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

৫ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি: “আমরা পরিবার স্বরূপ”: (নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়)

৫ম শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ঈশ্বর যে শক্তিগুলো আমাদের দিয়েছেন, জ্যেষ্ঠদের ও অসুস্থদের সম্মান করা, আশা সঞ্চয় করা, জাতির পিতা এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের স্মরণ, খনিজ সম্পদ: বৃক্ষ ও বন রক্ষা করা, ক্রীড়া-প্রমোদ, আত্ম-সংযম, পড়াশুনার অভ্যাস গড়ে তোলা, আনন্দিত হওয়া, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

৬ষ্ঠ শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের দেহ পবিত্র, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশ-বরেণ্যদের স্মরণ, আত্ম-শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দাদা-দাদি ও নানা-নানীদের সম্মান, আনুগত্য, অভিবাসীদের সাহায্য করা, একাত্মতা ও কঠিন শ্রম, শান্তি, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

৭ম শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ঈশ্বরের দানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, ধৈর্য্য, খাঁটি বন্ধুত্ব, দেশ-বরেণ্যদের স্মরণ করা, প্রকৃতি ও প্রাণিকুলের প্রতি সম্মান ও যত্ন, অনাথ শিশুদের সাথে

দিন কাটানো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সংযম, সুস্থ প্রতিযোগিতা, ক্রাসের ক্যাপ্টেন/লিডারদের মধ্যে গুণাবলি, একসঙ্গে কাজ করার শক্তি, সততা, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

৮ম শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন, অন্যকে বুঝা, মমতাবোধ, অর্জন, সং ও সাধারণ জীবনযাপনের উদাহরণ, দেশ-নির্মাণকারী, পৌরসভার কর্মীবৃন্দ, সমাজকর্মীবৃন্দ, অন্যের প্রয়োজনে দান করা, ন্যায্যতা, কৃষকদের স্বীকৃতি, স্কুল লিডারদের গুণাবলি, দায়িত্বশীলতা, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

৯ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি: “মূল্যবোধ ও জীবন-কৌশলসমূহ”: (উচ্চ বিদ্যালয়)

৯ম শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জীবন-কৌশল সম্পর্কে সক্ষম করা, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের মধ্যে আছে: মনোভাব, আবেগিক পরিপক্বতা, আত্ম-সম্মান, আত্ম-বিশ্বাস এবং আত্ম-প্রেরণা।

১০ম শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জীবন-কৌশল সম্পর্কে সক্ষম করা; জীবন-কৌশলের মধ্যে আছে: আত্মচেতনা, আত্ম-মূল্যায়ন, চিন্তা, সৃজনশীল চিন্তা, যুক্তি-বাগ্মিতা, সমস্যা সমাধান, পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, প্রকৃতিগত যোগাযোগ, আত্ম-নির্ভরশীলতা, আত্ম-ব্যবস্থাপনা কৌশল, দলগত ব্যবস্থাপনা, দুশ্চিন্তা-ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব।

১১শ শ্রেণি থেকে ১২শ শ্রেণি: “সফল জীবন”: (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়)

১১শ শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

যুবাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত অথচ অনালোচিত অনেক বিষয়, এই পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে যার মধ্যে আছে: বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যসমূহ, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা এবং আচরণের অপ্রাসঙ্গিকতা, হতাশা ও প্রতিকার, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, যৌনজীবন, যৌনরোগ, জ্ঞানহত্যা, সত্তা-প্রকৃতির অপব্যবহার, মৌলিক অধিকার, অন্যান্য মানবাধিকারসমূহ, এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ শুভজগতের নির্মাতা যুবাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা।

১২শ শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

এই পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে: বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যসমূহ, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা এবং আচরণের অপ্রাসঙ্গিকতা, হতাশা ও প্রতিকার, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, যৌনজীবন, যৌনরোগ, দ্রুণহত্যা, সত্তা-প্রকৃতির অপব্যবহার, মৌলিক অধিকার, অন্যান্য মানবাধিকারসমূহ, এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যত শুভ-জগতের নির্মাতা যুবাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা।

চরিত্র- ৮: ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল: ইতিবৃত্ত

এই লেখার শিরোনামটা দেখে খানিকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আসলে সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, আবার সেই প্রতিষ্ঠান যদি বড়ো হয়, তাহলে তার জন্মের সঠিক ক্ষণটাও বলা যায় না আর জন্মের স্থানটাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। ডিভাইন মার্সি হাসপাতালের ব্যাপারেও বিষয়টা তাই।

বিভিন্ন জনার কাছে বর্তমান ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল-এর স্বপ্নটার শুরু বিভিন্ন স্থানে ও কালে হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি হাসপাতালের বিষয় অবগত হলাম সম্ভবতঃ ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে যখন ঢাকা ক্রেডিট তাদের এজিএম-এ প্রধান অতিথি হিসেবে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তৎকালীন ঢাকার আর্চবিশপ রূপে। তখন মাত্র দু'বছর পূর্বে ঢাকা আর্চডায়োসিসের দায়িত্বে নিয়োজিত হলাম। উক্ত এজিএম-অনুষ্ঠানে রিপোর্ট ও নানা বক্তব্যের মধ্যে শুনতে পেলাম যে, ঢাকা ক্রেডিট মেয়েদের জন্য একটা হোস্টেল এবং একটি হাসপাতাল শুরু করার পরিকল্পনা করছে। তাত্ক্ষণিকভাবে আমি অবাক হলাম এই ভেবে যে, হোস্টেল করা বা হাসপাতাল করার চিন্তা ও পরিকল্পনা সাধারণতঃ এ যাবৎ মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ করে থাকেন। আর আমি একজন কর্তৃপক্ষ হয়ে বসে বসে শুনছি যে, মণ্ডলীর ভক্তজনগণ হোস্টেল ও হাসপাতাল নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

ঢাকা ক্রেডিটের পরিকল্পনা শুনে আমি একদিকে অবাক ও বিস্মিত হলাম এবং আমার মধ্যে সৃষ্টি হল মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তাদের পরিকল্পনা শোনার সাথে সাথে আমি ভাবলাম মণ্ডলী আজ পরিপক্ব, ভক্তজনগণ নতুন স্বপ্ন দেখছে – কীভাবে তারা মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করবে, কী ভাবে মণ্ডলীর মিশন সম্পন্ন করবে। আমি অভিভূত হলাম এ কারণে যে, ওরা মণ্ডলীর প্রচলিত চিন্তাধারাকে পাল্টে দিল। আমার নিজের চিন্তাধারার মধ্যে আসল নতুন পরিবর্তন, মণ্ডলীতে নতুনভাবে স্বপ্ন দেখার একটি আবেদন অনুভব করলাম। সাথে সাথে ঐ অধিবেশনে বসে এটাও আমার ভাবনায় আসল ভক্তজনদের কী আশ্বর্ষা! কী সাহস! মনে মনে প্রশ্ন করলাম মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ ছাড়া ওরা এই চিন্তা করতে পারল? প্রধান অতিথির বক্তব্যের সময় যখন আসল তখন আমি আমার কিছু উপলব্ধি উপস্থিত হাজারো সদস্যের সঙ্গে শেয়ার করলাম। মনে হচ্ছে পবিত্র আত্মা যেন আমাকে বলে দিল আমাকে কী বলতে হবে। যা সবার উদ্দেশ্যে বললাম তা আজও আমার কানে বাজছে: “হোস্টেল ও হাসপাতাল নিয়ে তোমাদের স্বপ্নকে আমি সাধুবাদ জানাই। তোমরা মণ্ডলীর সম্পদ: তোমাদের আছে অর্থবল আর আছে জনবল। মনে রেখো, মাণ্ডলিক কর্তৃপক্ষের আছে আরেকটি বল। সেটা হচ্ছে খ্রিস্টীয় অভিজ্ঞতার বল যা তোমাদের অর্থবল ও জনবলের সঙ্গে সংযুক্ত করে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

সেই শক্তি নিয়ে তোমরা একসঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যাও।” সেই দিন থেকে যারা ঐ সময়ে ঢাকা ক্রেডিটে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাদের দিকে তাকিয়ে ও তাদের প্রতি ঘনিষ্ঠ নজর রেখে আমি পরবর্তী বছরগুলোর পথ চলতে শুরু করলাম। ঐ সময় থেকে আমার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, মণ্ডলীর সম্পদ কিন্তু ভক্তজনগণের মধ্যে; তারাই সেই সম্পদের মালিক। তারা পারবে আধুনিক যুগে সেই সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে। আমরা যারা কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে আমাদের পথ চলতে হবে।

ইতোমধ্যে আবেদন আসল আসাদগেটে খ্রিস্টান হোস্টেলটির সংস্কার প্রয়োজন, বর্ধিত ও উপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন। ভূ-সম্পত্তির আরও যোগ্য ব্যবহার নিয়ে ঢাকা আর্চডাইয়েসিসের পক্ষে আমরা চিন্তাভাবনা শুরু করলাম। আমার পূর্বসূরী আর্চবিশপ পৌলিনিস কস্তাও খ্রিস্টান ছাত্রাবাসটি নিয়ে পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু তা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। খ্রিস্টান হোস্টেলের উন্নয়নের লক্ষ্য মাথায় রেখে, প্রায় তিনশত বিশ্ববিদ্যালয়ে-পড়া ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত করে ৮ তলা বিশিষ্ট একটি হোস্টেল তৈরী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। ঢাকা আর্চডাইয়েসিসের মন্ত্রণা-পরিষদে আলোচনা করে আসাদগেটে অবস্থিত মূল্যবান জমি থেকে দুই-তৃতীয়াংশ হোস্টেলের জন্য বরাদ্দ রেখে, দশ শতাংশ জমি খ্রিস্টিনা প্যারিশের সাথে সংযুক্ত করা এবং আরেক দশ শতাংশ মণ্ডলীর ব্যবহারের জন্য একটি মাল্টিপারপাস দালান করার পরিকল্পনা অনুমোদিত হল।

এদিকে একটি বিদেশী দাতা-সংস্থা খ্রিস্টান হোস্টেল নির্মাণের জন্য অর্থ যোগান দিতে রাজি হল। তবে সংস্থাটি শর্ত দিয়েছিল যে, স্থানীয় একটি সংস্থা যেন তাদের সাথে সহযোগী হিসেবে সম্পৃক্ত হয়। ডাইয়েসিসের অনুরোধে ঢাকা ক্রেডিট সহযোগী সংস্থা হওয়ার জন্য রাজি হল এবং ইতোমধ্যে হোস্টেল জন্য নির্ধারিত পরিমাণের টাকাও জমা দিল। ঢাকা আর্চডাইয়েসিস এবং ঢাকা ক্রেডিটের সঙ্গে সমঝোতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হল এই শর্তে যে, ঢাকা ক্রেডিট-মাল্টিপারপাস বিল্ডিংটি নির্মাণ করবে তাদের নিজেদের অর্থায়নে এবং বিনিময়ে সেই বিল্ডিংটি একটি ক্ষুদ্র হাসপাতাল হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তারা ব্যবহার করবে। উক্ত হাসপাতালের নাম আমি প্রস্তাব করেছিলাম “ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল” কেননা ঐ বছর (২০১৬ খ্রি) গোটা মণ্ডলীতে “ডিভাইন মার্সি” বা “ঐশ্বর্যের বর্ষ” হিসেবে পালন করা। ইতোমধ্যে ঢাকা ক্রেডিট কিন্তু পূর্বেই পরিকল্পনা করেছিল যে, কয়েক বছরের মধ্যে মঠবাড়িতে আরও বড়ো আকারে হাসপাতালসহ নার্সিং কলেজ ও মেডিকাল কলেজ নির্মাণ করবে।

ঢাকা ক্রেডিটের সাথে আমি সহযোগিতা করতে চেয়েছিলাম প্রধানতঃ হোস্টেলের উন্নয়নের জন্য, দ্বিতীয়তঃ ঢাকা শহরে মণ্ডলীর নিজস্ব জমির আরও উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য এবং তৃতীয়তঃ মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের সম্পদকে আরও অর্থপূর্ণ ও উপযুক্ত

ব্যবহার করার জন্য। তবে ডাইয়োসিসের এই পরিকল্পনায় কিছু সংখ্যক লোক একমত হতে পারেননি। হোস্টেলের সম্ভাব্য দাতা-সংস্থাও অপারগ হয়ে সরে গেল। আসাদগেটে হাসপাতাল করার স্বপ্ন থেকে ঢাকা ক্রেডিট দূরত্ব নিল। এ সবকিছুতে মণ্ডলীর সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য তা আমি জানি না। তবে এটা এখন সত্য যে, “ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল” আজ মঠবাড়িতে স্থাপিত। স্বপ্ন একটি সময়ে হয় এবং একটি নির্দিষ্ট জায়গা ঘিরেও তা হতে পারে কিন্তু তার বাস্তবায়ন সেই ক্ষণে বা সেই স্থানে নাও হতে পারে।

পরম করণাময়ের পরিকল্পনা অনুসারে “ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল” আমরা পেয়েছি। আজ আমাদের সকল প্রশংসা পরম করণাময়ের নিকট নিবেদিত। শ্রদ্ধেয় ফাদার ইয়াং, সিএসসি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড, সংক্ষেপে ঢাকা ক্রেডিটের নিকট – তাদের সকল সদস্য ও কর্মকর্তাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ এবং তাদের জন্য আমরা গর্বিত। ঢাকা ক্রেডিট ও তাদের সহযোগী ব্যক্তিবর্গ যারা স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্ন বাস্তব করে তুলতে যারা তাদের মেধা, সময়, শ্রম, অর্থ ও ত্যাগ নিবেদন করেছেন এবং আমাদের কাছে তা দৃশ্যমান করে তুলেছেন তাদের সকলের প্রতিও রইল আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন।

যে সৎ সাহস ও বলিষ্ঠতা নিয়ে “ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল” নির্মাণ করার যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, মণ্ডলীর নামে ও খ্রিস্টীয় আদর্শ অনুসরণে এবং ভালবাসা-যত্ন-মমতা-র মূল্যবোধে ব্রতী হয়ে আসুন, আমরা সকলে মিলে “ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল”টিকে পরম করণাময়ের নিদর্শন করে আমাদের সেবাকাজে নিজেদেরকে নিবেদন করি।

কথা- ২: IDENTITY AND VALUES OF CARITAS BANGLADESH

SOME REFLECTIONS, OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS

A. NATURE OF CARITAS BANGLADESH

1. Caritas Bangladesh is the Social Arm of the Catholic Church in Bangladesh. It functions according to the vision, values, mission and mandate given by the Catholic Bishops Conference of Bangladesh (CBCB).
2. Caritas Bangladesh is a National NGO, registered under the Society Registration Act of 1860 and approved by the Government of Bangladesh as a Local NGO.
3. Caritas Bangladesh is a Faith-based NGO with emphasis on human, ethical, spiritual values amidst modern trend of secularization. This shall be mutually understood by Caritas and the donor agencies.
4. The Vision, Mission and Values of Caritas Bangladesh are founded on the Social Teachings of the Universal Catholic Church, which is regularly updated because of the changes occurring in the social realities of the people and the society. The Social Teachings of the Church lays down for Caritas the Principles of: (a) Thinking, (b) Actions and (c) Evaluation.
5. Caritas Bangladesh has its own Organogram with specific roles and functions, governed by the principle of subsidiarity in accordance with its identity and values.
6. The Caritas Bangladesh is for “Integral Human Development with task of promoting the human person and God-given dignity of all, together human rights, health, justice and peace. It is principally concerned with matters relating to the economy and work, the care of creation and the earth as our “common home”, migration and humanitarian emergencies”. (AC. no. 163.1). The service of

charity with compassion and the promotion of human person are the two sides of the same coin that Caritas Bangladesh is.

7. Building of Fraternal Humanity with inter-religious and with inter-ethnic and cultural approach should be the cherished goal of Caritas Bangladesh.

B. SOME OBSERVATIONS JUSTIFYING RATIONALE FOR CHANGE

1. An attempt was initiated before the Golden Jubilee of Caritas Bangladesh to propose a revision of Caritas Philosophy and Mandate and its Focus and Values. It had been a long delayed project. Has the task been completed?
2. Sometimes praxis in Caritas over-rides the vision and mission of Caritas Bangladesh, causing multiplying of projects which are not all in conformity with the Philosophy of Caritas and the priorities identified.
3. There is a trend in Caritas to increase projects in order to satisfy the demands of the Local Church and to respond to the needs of the Caritas personnel. This may lead Caritas to multiplication of projects which are not effective, not manageable in terms of personnel, finance, structures, and sometimes they even counter against Caritas Philosophy.
4. It is remarked quite often that Caritas tends to be more project-oriented than love-service-commitment driven. The Pre-occupation of Caritas and its personnel should be SHEBA imbued with love, Caritas-mindedness, and not mainly efficiency in management, reporting excellence, compliances to rules, regulations and authorities.
5. Before initiating any new policy or changing the present one, formal study be done on the issue in question before decision is taken. This will avoid irregularity and confusion in the protocols to be maintained.

6. Emphasis should be given in the personalization of values more than job-oriented, or/and performance-oriented or/and report-oriented activities in Caritas.
7. Integration and integral development should receive renewed emphasis in the light of the present Social Teachings of the Church.
8. Initial and on-going formation in the Philosophy of Caritas and the CBCB Mandate is a must on regular basis for the CBCB, GB, EB Members, Caritas Directors, Caritas employees and partner groups.

C. NEW PATHS FOR THE JOURNEY FORWARD

1. The CBCB may form a “CBCB Surveillance Committee” headed by the President of Caritas, who will work under the direction and jurisdiction of the CBCB, particularly with tasks of: assisting in the assessment and evaluation of Caritas, suggesting revision of the Philosophy of Caritas in accordance with the updated Social Teachings of the Church, assisting in developing principles of reflections, actions and evaluation of Caritas, promoting studies on current issues, arranging on-going thinking and formation, assisting to search for and provide assessment of the candidates for the key positions entrusted to the CBCB for appointment, and/or any other matters that the CBCB may request.
2. “Journeying Together” should be the constant process in all levels and structures of Caritas Bangladesh with a view to building communion, promoting participation and fulfilling its vision and mission.
3. In journeying together, human and spiritual discernment of common good be searched, dialogue be promoted, misuse of power be avoided, competent authority be respected. For good and better governance, professionalism, responsibility, accountability and transparency should be ensured at all levels.

4. In the light of the renewed philosophy (Identity) of Caritas, values and priorities are to be identified, new strategies be selected and new methods of evaluation be adopted.
5. Some of the important values and priorities are cited below:
 - a) Promotion of Human Person and Family as the subject of all development programs.
 - b) Education to Fraternal Humanism with emphasis to promote human dignity and rights, social and civic responsibilities, and communion and fraternity in the society.
 - c) Formation to Peace and Harmony through building bridges and reconciliation in the situation of conflicts and violence.
 - d) Care of Creation and Care of our Common Home.
 - e) Safeguarding Policy: protection of minors and the vulnerable; eradicate child abuses in the families and society.
6. Besides the existing qualifications required for appointment of Caritas Employee, other requirements be developed which will safeguard the identity and the spirit of Caritas. Every new employee may be required to make a formal commitment before he or she is appointed as Employee.
7. Among Caritas Employees, provision for appointment of one or two Priest and Religious in every region and in the head office for a fixed tenure of five years may be introduced. For their appointment, Bishop of the Diocese shall present the possible candidate who has to fulfill required qualifications which are mandatory for other employees and work under the rules and regulations of Caritas Bangladesh.

Conclusion

The contents of the presentation under three sections of (A) Nature of Caritas Bangladesh, (B) Some Observations Justifying Rationale for Change and (C) New Paths for the Journey Forward, are my personal reflections, observations and recommendations. They remain so until and unless pertinent authority make appropriate decisions.

ପ୍ରତିଭା- ୨୦: PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR A SUSTAINABLE CHRISTIAN SOCIETY: An Initial Concept Paper

EXPRESSED CONCERNS

1. Resources of the Christian community:
 - Human resources are not developed enough to serve the Christian community
 - Material Resources of the Christian community are under-utilized
 - Wastage of resources of the community
2. Youth of the Society:
 - Youth are discouraged, dis-oriented, dis-satisfied, frustrated and suffer from hopelessness
 - Lack of dream and hope among the youth
 - Brain-drainage with departure of youth for abroad
3. Leadership in the Society
 - Stereotyped and traditional leadership in the community
 - Present Leadership, in most part, has become matters of negative criticisms
 - Lack of positive thinking and of action planning for the development of the Christian community
 - Lack of promotion of new leadership which is vision oriented
 - Promotion of good governance and servant-like-leadership in view of sustainability of the society
4. Vision of Christian society:
 - Every Christian is a missionary disciple of Jesus
 - Journeying together with reflective and prayerful discernment in the Spirit.
 - Synodal Vision of the Church with Unity, Participation and Mission

VISION: To build a Sustainable Christian Community of Communion, developing skillful and professionals for servant-like-leadership with participation of the Youth in view of the Mission of the Church (draft)

OBJECTIVES

To connect and united Christian individual living in Bangladesh

To identify influential professions and positions in Bangladesh

To assist Christian Youths to be capable for competitive job environment

To groom, assist and job placement

To make dignified society for assuring youths to stay in country

To promote purpose driven leadership

To ensure sustainable society

STRENGTHS

- Big organizations
- Property (Church, CUs & Church driven organizations)
- Abundant Liquidity; almost all Credit Union have excess liquidity which is kept in Different Organization which is merely used for community development
- Educational Institutes
- Young People
- Numbers of youth organization across the country
- Strong Community presence in different Countries
- Relatively strong database considering other community

CHALLENGES

- No Leadership Development program for running so much of organizations
- Lack of professionals
- We like to remain in comfort zone
- No systematic professional Development program
- Lack of Job placement in Government Job
- Too much execution power with lay/cooperative Leaders which attracts opportunist to leadership
- Professionals are not fully authorized so are not responsible

- Youths are not career focused
- Easy loan leading us to be delinquent society
- Lack of purpose driven leadership
- Unwillingness to accept positive criticism and or Criticism is widely practice rather than positive criticism

WHAT MIGHT BE DONE

- Comprehensive Leadership development program
- Career Development program for Youth
- Helping Youths for getting professional degrees specially on ICT, Lawyer, Barrister, Engineer, Doctor, Professor, Economist, CA, CMA, Banker, International Relationship, Philosophy etc.
- Placing youths in influential position including Government Jobs
- Career development plan can be implemented by Peris (advocacy), by educational institution (career guidelines) & Credit Unions (Financial service)
- Making cooperative leadership less lucrative aloofing/detaching leadership from execution
- Community Database should be developed

SEARCHING FOR NEW PATHWAYS

We may have a brain storm session among Christian leaders from Church, Credit Unions and Educational institutes Coordinating by CACCO/FCJYF to draw a roadmap.

LEADERSHIP DEVELOPMENT

- With the leadership of CACCO and advocacy of Church a leadership development program will be designed promptly.
- Development program will be shared with influential Credit Union leaders and their respective PARISH PRIEST in separate workshops as they can be aware and motivated to implement the program.
- Every Christian Cooperative will be asked to conduct leadership development program designed by CACCO for existing and potential leaders.

- A GAP ANALYSIS has to be conducted by stakeholders for specifying the role of leaders and professionals in Credit Union.
- Accountable culture should be created. For accountability, Employees have to be given authority for doing their job as they can hold responsible for accomplishing their role and target achievement
- Promoting PURPOSE DRIVEN LEADERSHIP and motivating our leaders to enjoy VISION RELATED ROLE rather than execution.
- Listing and connecting all youth organizations of Christian Society.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

- From every Credit Union we can ask few young professional to go for higher study
- Organization should allow higher study leave 2-3 years and give them easy loan for study and maintaining minimum family expense if necessary.
- Completing the study the individual will bound to work with that Credit Union for a minimum time. After the commitment they can stay in that organization or can join in other organization.

YOUTH DEVELOPMENT

IMMEDIATE

- Duration 1-2 years
- CACCO will lead the program with the moral support of Church
- A program will be designed and will be implemented by every credit union.
- Youth who have completed or going to complete their education very soon working with them in workshops for placing them suitable jobs according their interest.
- Coaching them for BCS and other government jobs
- Placing them suitable job
- Helping them to get professional degrees

LONG TERM PLAN

- Duration 10-12 years; SSC 2 Years, HSC 2 Years, Graduation 4 Years, Masters 2 Years, Professional Degree 2 Years
- Target with in next 12 Years we will encourage 2000 youth to become professional and get job placement in nationally important positions.
- Working with 3000 youths connecting through CACCO member Samity having target to furnish 200 doctors, 100 Economist, 200 CA/CMA, 500 ICT professionals, 200 other engineer, 100 Barrister, 200 Lawyer, 500 Teachers of whom 100 Professor, 200 ARMY/Police, 200 BCS, 100 management specialists.
- Stakeholders; CACCO, FCJYF, Parents, Parish, Credit Union and Educational Institutions.
- Advocacy by Parish, Extra care by educational Institute, Finance by Credit Union (if necessary) and coordination by CACCO/FCJYF.
- All Parish Priest will provide advocacy through their sermon at least once in a month in Sunday mass and every parish council will monitor the development quarterly and coordinate with other stakeholders.
- All educational institute will maintain Christian student development database which will be shared with CACCO/FCJYF to take necessary steps.
- Quarterly education seminar will be arranged in educational institute for Christian students at local & national level.

Note: We will maintain a database of CHRISTIAN PEOPLE. An app will be designed and develop by DHAKA CREDIT OR CACCO OR CATHOLIC CHURCH which will be used by all Church, Credit Unions and Educational institutes. Church will enroll our name in this app during baptism, update our status when any sacrament is given, educational institutions will update students' educational information and Credit Union will update financial information. Exploring the information, all stakeholders will be able to know about the students' interest, development and needs. It can also be used for other purposes.

By this app we will be able to know how many of our youths are not going school, how many are going, what are their development, what are their interest, what are the challenges. According their needs action can easily be taken. Christian individual will also be able to use this app to know his family's update.

Budget for 2000 Students				
Level	Time	Cost	Total Cost	
SSC	2 Years	2500X12X2	12 Crore	
HSC	2 Years	5000X12X2	24 Crore	
Graduation	4 Years	20000X12X4	192 Crore	
Masters	2 Years	30000X12X2	144 Crore	
Grand Total			372 Crore	
20% Supported by Family			74 Crore	Which is MERELY A FIGURE for our Credit Unions
Rest will be needed for implementing the Plan			298 Crore	
Average Investment in Each Year 300:-10			30 Crore	

Return in Next 30 Years from 2000				
Investment	Per Person Average Investment	Total	Cumulative Return	Revenue Gain
Average loan expected to be taken	2 Crore	4000 Crore Average 2000 Crore	5406 Crore	1406 Crore

INITIAL STEPS TOWARDS THE NEW PATHWAYS

1. Initial sharing of Ideas
 - With whom?
 - What content?
 - What mode?
2. Initially Responsible persons
3. Initial responsibility of Financing
4. Time-frame of the Initial process.

N.B. The above Paper has been written by a Team: Mr. Thomas Liton Rozario, Mr. Babu Markus Gomes and Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

ৱচনা- ১১: টেকসই খ্রিস্টীয় সমাজ নির্মাণ

সাম্প্রতিককালে বিশেষভাবে ঢাকা অঞ্চলে বেশ কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মধ্যে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে। বিষয়টি হচ্ছে : বর্তমানকালের প্রেক্ষাপটে এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশে কীভাবে টেকসই খ্রিস্টান সমাজ নির্মাণ করা যায়?

এই প্রশ্নটির আলোচনা প্রসঙ্গে খ্রিস্টানদের মধ্যে যে উদ্দিগ্নতা ও উৎকর্ষা প্রকাশ পায় তার কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করছি :

- ১) আমাদের খ্রিস্টান সমাজে অনেক সম্পদ আছে: তবে সেই সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে না। খ্রিস্টান-সমাজের উন্নয়নের জন্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না; অথবা সম্পদকে পরিকল্পিত লক্ষ্যে বিনিয়োগ না করে সম্পদের প্রচুর অপচয় হচ্ছে।
- ২) দ্বিতীয়ত, যুব সমাজ সম্পর্কিত: দেশের মধ্যে যেমন, খ্রিস্টান সমাজের মধ্যেও তেমনি যুবসমাজ আদর্শ ও লক্ষ্যবিহীন; নিরাশা ও হতাশায় তারা ভুগছে; ভবিষ্যৎ জীবন ও স্বপ্ন সম্পর্কে তারা সন্দেহান; জীবনের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ না পাওয়ায়, যাদের সামর্থ্য আছে অথবা অনেকে আবার ঋণ করে, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও উন্নততর জীবন-অনুসন্ধানের জন্য দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। যার ফলে দেশ ও খ্রিস্টান-সমাজ হচ্ছে মেধাশূন্যতা ও যোগ্য-নেতৃত্বের শূন্যতা অনুভব করছে।
- ৩) তৃতীয়ত, খ্রিস্টান সমাজের মধ্যে আছে সেকেলের প্রচলিত নেতৃত্ব যা আধুনিক সমাজে অনেকসময় গ্রহণযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ইতিবাচক চিন্তা এবং পরিকল্পিত গঠনসূচির অভাব রয়েছে; ভবিষ্যৎ রূপরেখা মাফিক, নারী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রে নেতৃত্বের উন্নয়ন এখনও বিকাশ লাভ করেনি; প্রো-একটিভ নেতৃত্বের স্থলে প্রায়ই দেখা যায় রি-অ্যাক্টিভ লিডারশিপ। সত্য-সন্ধান না করে মিথ্যা গুজব ও অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে; তাতে বিরূপ সমালোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে; ফলে স্বচ্ছ, ভাল ও অভিজ্ঞ লিডারগণ অসুস্থ নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করছেন। যার ফলে খ্রিস্টান সমাজ সুযোগ্য নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
- ৪) চতুর্থত, খ্রিস্টান সমাজে সুযোগ ও সম্পদ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের মেধার চর্চা প্রত্যাশা অনুসারে হচ্ছে না; তাছাড়া শিক্ষার মান এবং দক্ষ পেশাজীবীদের বড়োই অভাব রয়েছে খ্রিস্টান সমাজে।

এমনতর অবস্থায় আমাদের প্রশ্ন: টেকসই খ্রিস্টান সমাজ কীভাবে নির্মাণ করা যায়?

খ্রিস্টান সমাজের শক্তি ও চ্যালেঞ্জ

- (১) খ্রিস্টবিশ্বাসের চেতনা ও মন্ডলীতে একসঙ্গে পথচলার বাসনার জাগরণ, কিছুটা হলেও, পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা আমাদের একটা শক্তি। এক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে: খ্রিস্ট-আদর্শে ও ভাবনায় জীবনযাপন করার জন্য এবং গঠন-প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- (২) খ্রিস্টান সমাজে তিনটি বড় শক্তি আছে: (১) সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান (জনশক্তি), (২) সমবায় সমিতি (অর্থ-শক্তি) আর (৩) মন্ডলীর সেবা (আধ্যাত্মিক/শিক্ষাদান/পরিচালন) - (প্রেরণা/উদ্বুদ্ধকরণ শক্তি)। এক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে: এই তিন শক্তির সমবায়/মিলনসমাজ/সমন্বয় করা, একসঙ্গে পথচলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সংলাপ ও সম্পর্কের উন্নয়ন করা।
- (৩) আমাদের খ্রিস্টান সমাজের বর্ণিত শক্তিগুলো শতভাগ বিনিয়োগ করা। কোন ক্ষেত্রে? (১) শিক্ষা ও মেধা উন্নয়নের জন্য, (২) পেশাজীবীদের দক্ষতা অর্জনের জন্য, (৩) সমভাবে নারী ও পুরুষের নতুন নেতৃত্ব গঠনের জন্য।
- (৪) সম্পদ ও শক্তিগুলো বাস্তবায়নের জন্য যে প্রয়োজনটা অনুভব করা হচ্ছে তা হল খ্রিস্টান সমাজে একটি কেন্দ্রীয় রিসার্চ সেন্টার: যেখানে থাকবে ডেটা-বেইজ সঠিক তথ্য, যেখানে অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হবে, যেখান থেকে আসবে বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশনা ও পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ।

চরিত্র- ১৩: ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসা

এসো আমরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসাগুলোর জন্য প্রার্থনা করি: যাতে তারা বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মধ্যে, ব্যবসা করার এবং তাদের তৃণমূল সমাজকে সেবা করার জন্য পথ খুঁজে পায়।

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। একমাত্র মুনাফা লাভের কারণে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো আরো বড়ো হয়, ধনীরা আরো ধনী হয়। বিত্তবানরা ক্ষুদ্রদের সম্পদ কেড়ে নেয়। এ ধরনের ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় ছোট ও ক্ষুদ্রদের ব্যবসা তেমন একটা স্থান থাকে না।

বাংলাদেশে ইদানিং, করোনা মহামারির কারণে, জীবন ও জীবিকা-নির্বাহের তাগিদে, অনেক ছোট ছোট ব্যবসা শুরু করা হয়েছে; নতুন নতুন উদ্যোক্তা, এমনকি নারী উদ্যোক্তারাও অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেছে। এ উদ্যোগ খুবই শুভ লক্ষণ। নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে জাগ্রত হয়েছে অনেক গণমঙ্গলের চিন্তাধারা। এই গণমঙ্গলের উদ্ভাবন কোন সময়ই মহামারি চলাকালের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। মহামারি খুবই মারাত্মকভাবে শিথিয়ে দিয়েছে যে, অতীতের নীতির অযৌক্তিকতা -- যা-কিছু বিশ্বকে করেছে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত; বর্তমানে প্রয়োজন নতুন পথের সন্ধান। পোপ মহোদয় তাই এ বিষয়ে প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা যায় সৃজনশীলতা, আত্ম-কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় সমাজের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র মাঝারি ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ও সংগঠনের ভারবোঝা খুবই কম। স্থানীয় সমাজের উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং সরাসরি উক্ত কাজে অংশগ্রহণ করছে।

ক্ষুদ্রকে বলা হয় সুন্দর; আবার বলা হয় ক্ষুদ্র বেশ শক্তিশালী। এও শোনা যায়, “বড়ো বড়ো চিন্তা কর, আর ক্ষুদ্রাকারে শুরু কর”। যিশুও তো ক্ষুদ্র শিষ্যদলকে বললেন: “তোমরা জগতের লবণ”, “তোমরা জগতের প্রদীপ”। ব্যবহারের দিক থেকে লবণের পরিমাণ ক্ষুদ্র ও আলোকজগতে প্রদীপ খুবই ক্ষুদ্র; যিশুর কথা অনুসারে ক্ষুদ্র সর্ষেদানাই তো একদিন বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেও খুবই শক্তিশালী, সম্প্রসারণের অনেক সম্ভাবনাময় ক্ষমতা ধারণ করে।

আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে, বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজে সূচনা হয়েছিল ক্ষুদ্রের একটি বিরাট বিপ্লব -- ক্ষুদ্র সমবায় সমিতি, ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের সমষ্টি ও সমবায়, ক্ষুদ্র সম্পদের সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র সম্পদের সহভাগিতা। এই প্রচেষ্টা খ্রিস্টান সমাজের আর্থিক ও সামাজিক অবকাঠামো মজবুত করেছে এবং উন্নয়নের জন্য রেখেছে সর্বোত্তম অবদান।

বর্তমানে খ্রিস্টান সমাজের তৃণমূল স্তরে প্রতিটি গ্রাম-পল্লী পর্যায়ে রয়েছে ক্ষুদ্র সমিতিগুলোর অবস্থান। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিগুলো তাদের ক্ষুদ্রত্ব হারিয়ে ফেলছে খুবই পরিকল্পিত ভাবে, বৃহৎ হবার প্রতিযোগিতায় তারা নামছে, বড় বড় ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে, ক্ষুদ্রের আমানত থেকে বিরাট পরিমাণে লোন নিয়ে বড়োরা ঋণখেলাপি হচ্ছে। তাছাড়া সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সামাজিক চিন্তাবিনোদন এবং যত অপরাধ ও অপচয়জনিত কাজে তা ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমাদের এই ক্ষুদ্র সমিতিগুলো আবার ফিরে আসুক আদি প্রেরণায়। আমাদের এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, নীতি প্রণয়ন করে এবং শতকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উৎপাদনশীল প্রকল্পে ঋণ প্রদান করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও যেন উৎপাদনশীল ব্যবসার জন্যই প্রথমত ঋণ গ্রহণ করে। ঋণ গ্রহণ করার লক্ষ্য হবে যেন আমাদেরকে ভবিষ্যত আর ঋণ করতে না হয়। ঋণগ্রহণ হওয়ার জন্য ঋণ গ্রহণ করা সঠিক নয়। আর যদি তাই হয়, তাহলে সমবায় ও ঋণদান সমিতির গোড়ায় কুঠারাঘাত করা হবে।

নারী-পুরুষ সবাই মিলে, শুধু চাকরির সন্ধান না করে, স্বাবলম্বী ও সৃষ্টিশীল হয়ে, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং স্থানীয় সমাজের চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তরা যেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসায় আত্মনিষ্ঠ হতে পারেন সেটাই হোক তাদের প্রচেষ্টা।

পোপ মহোদয় নিজেও, খ্রিস্টীয় ভাবনায় বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্যিক কৃষ্টির মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসাগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রার্থনার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন যেন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কাজ করা ও সমাজকে সেবা করার পথ খুঁজে পায়।

ৱচনা- ১৬: সাম্প্রতিক বাংলাদেশ এবং স্থানীয় মণ্ডলীর ভাবনা

খ্রিস্টমণ্ডলী বিশ্বজনীন। বিভিন্ন দেশ ও জাতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে মণ্ডলী স্থানীয় হতে হতে খ্রিস্টমণ্ডলী বিশ্বজনীন রূপে প্রতিভাত হয়। যুগ যুগ ধরে এই ধারা সর্বদাই চলমান ছিল। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেই পরিবর্তনের মাঝে বাংলাদেশ মণ্ডলীর অবস্থান অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। এই কারণে মণ্ডলীর সত্তাগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে মণ্ডলীকে হতে হবে স্থানীয় বা স্থানিক। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

ক ৯ দেশে নতুন সময় ও নতুন বিষয়

গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রি. তারিখে অতি প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত নির্বাচন ও গণভোট সম্পন্ন হল। অনেক শিক্ষা-উদ্বিগ্নতা, ভয়-ভীতি-সন্দেহ, হিসাব-নিকাশ, জল্পনা-কল্পনা, সম্ভব-অসম্ভব, নিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তার পরও মোটামুটি স্বতঃস্ফূর্ত, শান্তিপূর্ণ ও আনন্দের সাথেই নির্বাচন ও গণভোট সম্পন্ন হয়েছে বলে সবার ধারণা। স্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি কাটিয়ে ৬০% জাতির ভোটাররা ভোট দিয়ে তারা প্রায় (ক) বিএনপি ৭০% (খ) জামায়াত ২০%, এনসিপি ২% এবং অন্যান্যদের বাকী শতাংশ আসনে বিজয়ী করেছে। গণভোটে ভোটাররা সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংস্কারের পক্ষে ৭০% “হ্যাঁ” এবং ৩০% “না” ভোট প্রদান করেছে। ৬০% শতাংশ ভোটারদের মধ্যে ১৫% ছিল তরুণরা, যাদের মধ্যে অধিকাংশই জীবনে প্রথমবার ভোট প্রদান করতে পেরেছে।

২০২৪-এর জুলাই ছাত্র আন্দোলন ও বিপ্লবের পরে বাংলাদেশে এসেছে নতুন সময় এবং উৎসারিত হয়েছে নতুন বিষয়, যার ফলে এসেছে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন: ছাত্র সমাজ দেশের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছে। এই জাগরণের সাথে পরবর্তীতে একাত্ম হয়েছে দেশের আরও অনেক জনগণ। এই ছাত্র-অভ্যুত্থান বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটিয়েছে, তরুণদের মধ্যে নতুন দেশ গড়ার চেতনা ও নিষ্ঠা জাগ্রত হয়েছে। এই বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে, যেমন ইতিবাচক তেমনি অনেক নেতিবাচক ঘটনা ঘটেছে যা মানুষকে অনেক হেনস্থা ও কষ্ট দিয়েছে; ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের জন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও হয়রানি ঘটিয়েছে ও মানবাধিকারে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো, বিচার ব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। মবতস্ত্রের সূত্রপাত হয়েছে, ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ লুটপাট ও ধ্বংস করা হয়েছে। দেশের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি আঘাত করা হয়েছে যা ছিল পূর্ব-প্রজন্মের জন্য অনেক

বেদনাদায়ক। নিরাপত্তার অভাব ও অনিশ্চয়তা ছিল ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে প্রতিদিনের উদ্দিগ্ধতা।

জাতি ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয় ৮ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে। বিগত ১৮ মাস ধরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণার পর অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সাথে অনেক বাক-বিতণ্ডা, আলোচনা-পর্যালোচনা, দর-কষা-কষি ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে তিনটি বিষয়ে ঐকমত্য অর্জন করেছে: (ক) দেশের বিচার-ব্যবস্থা, সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও কার্ঠামোর যৌক্তিক সংস্কার করা; (খ) ফ্যাসিবাদী অপরাধীদের বিচার করা এবং (গ) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে “জুলাই সনদ” অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সংস্কার বিষয়ে গণভোট ব্যবস্থা করা। এই কার্যক্রম যতটুকু সম্ভব ছিল তা সম্পাদন করে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার ফলাফল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

গণ-অভ্যুত্থানের উত্তরকালে বিগত আঠারো মাস ধরে বাংলাদেশে যে সমস্ত নতুন চিন্তাভাবনা ও মন-মানসিকতার উদ্ভাবন হয়েছে তা মোটা দাগে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করছি:

- (১) তরুণদের মধ্যে ভবিষ্যতের সমাজ ও দেশ নির্মাণে চেতনা, আগ্রহ, জাগরণ ও গণ-অভ্যুত্থান। এখানে জেন-জেড প্রজন্মের স্বপ্ন, চিন্তাভাবনা ও দর্শনের প্রতিফলন অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে।
- (২) রাজনীতিতে ও সমাজ পরিচালনায় সংস্করণ ও রূপান্তরের দাবি-দাওয়া: মানবাধিকার, ন্যায্যতা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রবল ইচ্ছা।
- (৩) সমাজে, দেশে ও সকল প্রশাসনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
- (৪) অপরাধীদের সঠিক বিচার করা এবং তাদেরকে বিচার-দণ্ড দেওয়া।
- (৫) নৈতিকতার অবক্ষয়ের মধ্যে নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ প্রকাশ।
- (৬) নৈতিক ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে এবং বাংলাদেশে অধিকাংশ জনগণ (৯১%) ইসলাম ধর্মের অনুসারী বিধায়, ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও আইন দ্বারা সমাজ ও দেশ পরিচালনা করার দায়িত্ববোধের উন্মেষ ও চেতনা এবং বাস্তবায়নের জন্য কথা ও কাজে পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।
- (৭) অন্য গোষ্ঠী, দেশ ও আন্তর্জাতিক শক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং অন্যায় সম্পর্কের অবসান করা।

(৮) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অনেকটাই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

(৯) অনেক ইতিবাচক ও নেতিবাচক ঘটনা জনগণকে একত্রিত করেছে, সংলাপে মিলিত হয়েছে এমন কি অনেক কল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত একত্রে গ্রহণ করার প্রবণতা ও সফলতা দেখা গেছে।

(১০) লক্ষণীয় একটি বিষয় যে, যা-কিছু মন্দ তা প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেরাই সেই মন্দগুলো অনেক সময় আপন করে নিয়েছে এবং অন্যের ওপর জুলুম চালানো হয়েছে। ভালো করার উদ্দেশ্যে মন্দের আশ্রয় নিয়েছে।

এই যুগলক্ষণগুলো দেখা ও শোনার পর এ সম্বন্ধে ইতিবাচক মাপদণ্ডে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন এবং এর যৌক্তিকতা কতটুকু তা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা সমাজ ও দেশের কাজ।

খ ॥ মণ্ডলীতে নতুন সময় ও নতুন বিষয়

বেশি অতীতে না গিয়ে বিগত একটি যুগ ধরে, প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এবং বর্তমান পুণ্যপিতা পোপ লিও'র শাসনামালে বিশ্বমণ্ডলী জুড়ে আমরা নতুন সময় ও নতুন বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছি। এখানে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করছি মাত্র।

(১) খ্রিস্টমণ্ডলীর নবায়নের জন্য দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিগত শতাব্দীর ষাট দশকে। পোপ ফ্রান্সিস ৪ বছর আগে বলেছিলেন যে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা থেকে পাওয়া খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান এবং পালকীয় সংবিধানের আদর্শ ও নির্দেশনা এখনাবধি বাস্তবায়ন হয়নি। নতুনভাবে সংবিধানের বাস্তবায়ন মণ্ডলীতে নিয়ে আসবে নবায়ন।

(২) মণ্ডলীর শিক্ষাদাত্রী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছে যে, মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করাই হচ্ছে মণ্ডলীর মৌলিক মিশন – এই মিশনকাজে সকল ভক্তজন, সন্ন্যাসব্রতী, যাজক ও বিশপগণের সম্পৃক্ত ও তার মিশনকাজে নিয়োজিত। মঙ্গলবার্তা জীবনে ধারণ করে যে সাক্ষ্য দান করা হয় তাই হচ্ছে মঙ্গলবার্তার আনন্দময় ঘোষণা। খ্রিস্টীয় জীবনে মঙ্গলবার্তার আনন্দময় সাক্ষ্যদানই মানুষকে আকর্ষণ করে, আর সেটাই হয়ে ওঠে স্বার্থক মঙ্গলবার্তা ঘোষণা।

(৩) নতুনভাবে ও নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলীকে গড়ে তোলার জন্য মণ্ডলীতে এসেছে “সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী” সম্বন্ধে ধারণা এবং প্রক্রিয়া।

- সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর ধারণার মধ্যে আছে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য: (ক) মিলন ও মিলন-সমাজ (খ্রিস্টদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ: বিশপ/যাজক/সন্ন্যাসব্রতী এবং ভক্তজনগণের মধ্যে মিলন ও ঐক্য); (খ) মণ্ডলীতে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও (গ) যিশুর মঙ্গলবার্তা ঘোষণার মিশন ও দায়িত্ব।

- পদ্ধতি-১: মণ্ডলীর সত্তাগত ধারণা বাস্তবে দৃশ্যমান করার জন্য একসঙ্গে যাত্রা করা ও পথচলা একান্ত অপরিহার্য; যিশুর সঙ্গে পথচলা ও অপরের সঙ্গে একসঙ্গে খ্রিস্টীয় পথচলা (খ্রিস্টদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপে, সমবেতভাবে পারস্পরিক সহভাগিতা, একত্রিত ও সম্মিলিতভাবে পথ চলা) প্রথম পদ্ধতি। এখানে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- পদ্ধতি-২: পারস্পরিক সহভাগিতায় অপরের কথা শ্রবণ করা এবং পবিত্র আত্মা কী বলেন তা ঐশবাণী, ধ্যান ও প্রার্থনায় শ্রবণ করা হচ্ছে দ্বিতীয় পদ্ধতি। ঈশ্বরের ইচ্ছা অবধারণ করার পদ্ধতিতে সবারই সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- পদ্ধতি-৩: আর তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিজন খ্রিস্টের বিশ্বাসীকে হতে হবে মিশনারি। “যারা দীক্ষিত তারাই প্রেরিত”। মণ্ডলীর কাজে সবারই অংশগ্রহণ।

- (৪) মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বর্তমান জগতে মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করার প্রধান মাধ্যম। সামাজিক শিক্ষা ও কর্মকাণ্ডে যে বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পাবে তা হচ্ছে: * মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা, * মানবজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, * মঙ্গলবার্তার আলোকে মানব সংগঠনগুলোর রূপান্তর: (পরিবার, সমাজ, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান), * সামাজিক ক্ষেত্রে সবার অংশগ্রহণ, * শিশু, দরিদ্র ও দুর্বলদের প্রতিরক্ষায় অগ্রাধিকার, * মানব-ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা, * সৃষ্টির বিশ্বস্ত কর্মচারী হওয়া, * অধস্তনদের প্রতি সহযোগিতার জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন, * মানবীয় সমতা স্থাপন, * গণমঙ্গল বা জনমঙ্গলের অগ্রাধিকার, ইত্যাদি।
- (৫) খ্রিস্টমণ্ডলীর সংস্করণ ও নবায়ন: মিলনসমাজ, অংশগ্রহণ ও মিশন সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মণ্ডলীতে প্রয়োজন আদর্শগত পরিবর্তন ও কাঠামোগত রূপান্তর। মণ্ডলীতে সবার যাজকীয় ভূমিকা, শিক্ষা ও সাক্ষ্যদানের ভূমিকা এবং পরিচালনা ও প্রশাসনিক ভূমিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে, সকল বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের মধ্যে সংস্করণ ও নবায়ন একান্ত প্রয়োজন।
- (৬) মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ যুবসমাজ বা তরুণদের প্রতি বিশেষ নজর ও মনোযোগ দিচ্ছে; তাদের কথা শুনবার চেষ্টা করছে এবং তাদের সৃজনশীল ধারণা ও সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। মণ্ডলীতে তরুণদেরকে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে; মণ্ডলীর মিশন কাজে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তরুণরা নতুনের ডাক দিচ্ছে, তারাই মণ্ডলী হওয়ার নতুন পথ প্রদর্শন করছে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট এবং মণ্ডলীর নিজস্ব প্রেক্ষাপট — এ দু'য়ের মধ্যে আমরা অনেক সামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছি। দেশ ও মণ্ডলীর পরিস্থিতি আমাদের কাছে

কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে খুবই স্পষ্ট ধারণা প্রকাশ করছে। সংক্ষেপে বলা যায়:

- (১) উভয়ের মধ্যে দেখা যায় যে, আমরা নতুন সময়ে বাস করছি এবং নতুন নতুন বিষয় আমাদের নজরে আসছে। কালের চিহ্ন বা নিদর্শনগুলো পরিবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছে এবং আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে।
- (২) নতুন প্রজন্ম নতুন চিন্তা ও ভাবনা করছে। তারা চায় ন্যায্যতা, সমতা, স্বচ্ছতা, দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ, কথা বলার স্বাধীনতা, আত্মত্ব, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, ইত্যাদি।
- (৩) পুঞ্জীভূত অনুভূতিগুলো যখন স্বাভাবিকভাবে প্রকাশের সুযোগ পায় না, তখন সেগুলো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ও বিস্ফোরণ ঘটায়।
- (৪) মানুষ চায় পরিবর্তন, ব্যবস্থাপনার সংস্করণ, উত্তমের দিকে পরিবর্তন, দেখতে চায় নতুন সমাজ যেখানে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকবে, সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, সক্রিয় হবে তাদের কর্মকাণ্ডে ও দায়-দায়িত্ব পালনে।

গ ॥ নতুন সময়ে ও নতুন বিষয়ের আহ্বানে সাড়া দান

দেশ ও সমাজে এবং মণ্ডলীতে যে নতুন সময় ও নতুন বিষয় উদ্ভাবিত হয়েছে তা মণ্ডলীর নিকট নিয়ে আসছে নতুন ডাক এবং সে ডাকের প্রতি সাড়া দান। সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে :

- (১) বর্তমানকালের নিদর্শনগুলো অতি গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং কোন দিকে এবং কোন বিষয়ে আমাদের আহ্বান আসছে তা পবিত্র আত্মার শক্তিতে নিরূপণ করা। নিদর্শনগুলো কোনভাবে অস্বীকার বা বর্জন করা ঠিক হবে না।
- (২) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতির বিষয়গুলো হতে হবে মণ্ডলীর ভাবনা, সাম্প্রতিক বিষয়গুলো কোনভাবেই মণ্ডলীর ভাবনার বাইরে নয়। মণ্ডলীকে এই অবস্থাতেই খ্রিস্টের মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করতে হবে, প্রেরিতিক কাজে নিয়োজিত হতে হবে এবং তাঁর মিশন সম্পন্ন করতে হবে।
- (৩) বর্তমান যুগলক্ষণের প্রেক্ষাপটে নতুন কোন্ কোন্ বিষয় আমাদের মনোযোগ দিতে হবে তা একসঙ্গে চলার নীতি অনুসরণ করে, সমবেতভাবে চিহ্নিত করা এবং নির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও প্রক্রিয়া গ্রহণ করা।
- (৪) সাম্প্রতিক পোপ মহোদয়গণ “মন-পরিবর্তন”-এর উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। এই মন-পরিবর্তন বিভিন্ন বিষয়ে ও ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে: মণ্ডলীর সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন, মাণ্ডলিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ও সংস্করণ, মণ্ডলীর কাঠামোগত পরিবর্তন, পরিবেশ বিষয়ক মন-পরিবর্তন, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও

পালকীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন, যাজকতান্ত্রিক মনোভাব ও কর্মকৌশলের পরিবর্তন।
সব পরিবর্তনের মূলে থাকবে জাগতিকতা থেকে মঙ্গলবার্তার দিকে পরিবর্তন বা
রূপান্তর।

উপসংহারে বলা যায় যে, বিশ্বমণ্ডলী বিশ্বের দিকে এবং বিশ্বজনীন মণ্ডলীর দিকে
তাকিয়ে নতুন দিক নির্দেশনা দিচ্ছে যেন বর্তমান জগতে মণ্ডলী অর্থবহ হয়ে সাক্ষ্য
দিতে পারে এবং তার মিশন দায়িত্ব পালন করতে পারে। ইদানিং বাংলাদেশে
আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বাংলাদেশের
মণ্ডলীকে অর্থবহ, স্থানিক ও দেশীয় রূপ নিতে হলে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার দিকে
তাকাতে হবে এবং নতুন চিন্তা ও প্রক্রিয়ায় মণ্ডলীকে নির্মাণ করতে হবে এই দেশীয়
মানুষ ও মাটিতে। বিশ্বজনীন মণ্ডলী ইতোমধ্যে সেই নির্দেশনা বাংলাদেশসহ সকল
স্থানীয় মণ্ডলীকে দিয়েছে। পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা সম্মিলিতভাবে একসঙ্গে
অবধারণ করি, পবিত্র আত্মা বাংলাদেশ মণ্ডলীকে কী বলেন। এ কাজ শুধু মণ্ডলীর
কর্তৃপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মণ্ডলীর সকল যাজক, সন্ন্যাসব্রতী সংঘ ও
ভক্তজনগণের সংগঠন এবং মণ্ডলীর সকল প্রৈরিতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, সিনড-বিশিষ্ট
মণ্ডলীর প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মা কী বলেন তা অবধারণ করতে হবে, সকলের অংশগ্রহণ
নিশ্চিত করতে হবে এবং মণ্ডলীর মিশন আরও জোরদার করতে হবে।

তৃতীয় ভাগ: খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐক্য ও আন্তঃমণ্ডলিক সংলাপ

রচনা— ১: মণ্ডলীতে খ্রিস্টীয় ঐক্য সম্পর্কে মৌলিক ধারণা এবং বাংলাদেশে আন্তঃমণ্ডলিক পরিবেশ ও বাস্তবতা

৥ ক ৥ খ্রিস্টীয় ঐক্য (ইকিউমেনিজম) সম্পর্কে মৌলিক ধারণা

পোপ দ্বিতীয় জন পল ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে, “তারা যেন এক হয়” (*UT UNUM SINT*) শীর্ষক বিশ্বজনীনপত্রটি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার কর্তৃক রচিত “খ্রিস্টীয় ঐক্য-প্রচেষ্টা” *Unitatis Redintegratio* ঐক্যের পুনরুদ্ধার বিষয়ক নির্দেশনামার অনুসরণে রচিত হয়। এই প্রবন্ধে পোপ দ্বিতীয় জন পলের বিশ্বজনীনপত্রের মৌলিক ধারণাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরাছি।

গুরুত্বই উল্লেখ করা প্রসঙ্গত যে, প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলো ১৯৫০ দশকে একসঙ্গে খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য প্রার্থনা অষ্টাহ পালন করে থাকে এভাবে প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলো খ্রিস্টীয় ঐক্যের প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কাথলিক মণ্ডলী ভিন্নভাবে প্রার্থনা করে আসছিল যেন সকল মণ্ডলী রোমান কাথলিক মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে “মণ্ডলীসমূহের বিশ্বপরিষদ” “World Council of Churches” (WCC) প্রতিষ্ঠিত হয়। পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী “দ্বিতীয় ইকিউমেনিকাল ভাটিকান মহাসভা” আহ্বানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহাসভায় অন্যান্য মণ্ডলীর পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদেরকে মহাসভায় স্থান করে দিলেন এবং একটি “খ্রিস্টীয় ঐক্য-প্রচেষ্টার সচিবালয়” স্থাপন করেন যেন অর্থডক্স ও প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলী যথার্থভাবে বিশ্বজনীন মহাসভায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয় ভাটিকান ইকিউমেনিকাল মহাসভা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান দিয়ে বলেছিলেন: “তারা যেন এক হয়”। তৃতীয় সহস্রাব্দে প্রবেশ-ক্ষণে মণ্ডলীজুড়ে এই আহ্বানটি প্রচুর সাড়া যুগিয়েছে। যিশু তো নিজেই তাঁর সকল শিষ্যদেরকে ঐক্যের উদ্দেশ্যে আহ্বান করেই বলেছিলেন: “তারা যেন এক হয়”।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে সকলেই সচেতন। এটি কঠিন পথ কিন্তু অর্জনটি খুবই আনন্দময়। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা দীর্ঘকালীন অসমোঝোতার ভারবোঝা বহন, ভুলবুঝাবুঝি ও বন্ধমূল ধারণা, আপনাতে আপনি তৃপ্ত, উদাসীনতা, একে অন্যের বিষয়ে অজ্ঞতা, ইত্যাদির চলার পথ আরও কঠিন করে তুলেছে। অতএব খ্রিস্টীয় ঐক্যের ভিত্তি হতে হবে হৃদয়ের পরিবর্তন এবং প্রার্থনা।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় মণ্ডলী উপলব্ধি করেছে যে, মণ্ডলীর সভাগত পরিচয় ও মিশনের জন্য ঐক্য একান্ত প্রয়োজন ও তার জন্য মণ্ডলী অঙ্গীকারবদ্ধ। এ কারণেই বিশ্বজনীনপত্র রচনার যৌক্তিকতা নিহিত।

পিতরের উত্তরাধিকারী হিসেবে এবং রোমের বিশপ হিসেবে, পোপ দ্বিতীয় জন পল অনুভব করেছেন যে, খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য কাজ করার প্রথম দায়িত্ব মূলত তাঁর নিজেরই। যিশুর প্রার্থনা তো হতে হবে পোপের নিজের প্রার্থনা ও কর্তব্য।

১ ॥ খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা কাথলিক মণ্ডলীর দায়িত্বভার

মানুষের মধ্যে ঐক্য ও মিলন হচ্ছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং তাঁরই ইচ্ছা: এর জন্যই স্বর্গীয় পিতা যিশুকে জগতে পাঠিয়েছিলেন। জগত ছেড়ে চলে যাবার আগে তাই তিনি প্রার্থনা করলেন: “তারা যেন এক হয়”।

খ্রিস্টীয় ঐক্যের পথ হচ্ছে মণ্ডলীর পথ: কাথলিক মণ্ডলীর মধ্যে খ্রিস্টমণ্ডলীর সভাগত বিশেষত্ব নিহিত আছে, কারণ কাথলিক মণ্ডলী বিশপদের সংযোগে পিতরের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত, এবং কাথলিক মণ্ডলী স্বীকার করে যে, পবিত্র হওয়ার অনেক উপাদান এবং সত্য কাথলিক মণ্ডলীর দৃশ্যমান কাঠামোর বাইরেও বর্তমান। সেই উপাদান ও সত্য কাথলিক মণ্ডলীর ঐক্য সাধন করে। এ কথার মানে হচ্ছে অন্যান্য মণ্ডলী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলো, আংশিকভাবে অপূর্ণ হলেও, পরিত্রাণ-রহস্যের অংশীদার। পবিত্র আত্মা ঐ মণ্ডলীগুলোকে পরিত্রাণের উপায় থেকে বঞ্চিত করেন নি, বরঞ্চ কাথলিক মণ্ডলীর অনুগ্রহের পূর্ণতা এবং ফলপ্রসূতার সাথে তারা অবিচ্ছিন্ন।

অন্যান্য মণ্ডলী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলোর ঐতিহ্যগত সম্পদ: তাদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের নীতি হিসেবে, তারা পবিত্র শাস্ত্রের বাণী শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে; তারা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর এবং খ্রিস্টকে ঈশ্বরের পুত্র এবং মুক্তিদাতা হিসেবে বিশ্বাস করে; তারা বাপ্তিস্ম সংস্কার দ্বারা উৎসর্গীকৃত হয়ে খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত। তারা তাদের মণ্ডলীর বিশ্বাস অনুসারে সংস্কারের স্বীকৃতি দেয় ও সংস্কার গ্রহণ করে। অনেক মণ্ডলী বিশপীয় পদ আনন্দের সাথে গ্রহণ করে, পবিত্র খ্রিস্টযজ্ঞ উৎসর্গ করে এবং ঈশ্বরের জননী কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে। তারা আমাদের সাথে প্রার্থনা ও

অন্যান্য আধ্যাত্মিক সম্পদের অংশীদার। আমরা আরও দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, তারা পবিত্র আত্মায় আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত, একই পবিত্র আত্মা তাদের আত্মিক দান ও অনুগ্রহ প্রদান করেন এবং ফলে তাঁর পবিত্রীকরণের ক্ষমতায় তিনি তাদের মধ্যে সক্রিয় আছেন। এমন কি নিজের রক্তপাত করে জীবন সমর্পন করতে পবিত্র আত্মা তাদের শক্তি দিয়ে থাকেন। খ্রিস্টের সকল শিষ্যের মধ্যে, খ্রিস্টের ইচ্ছা অনুযায়ী, পবিত্র আত্মা একই মেসপাল এবং একই মেসপালকের ধারণায় শান্তিপূর্ণ ঐক্যের বাসনা জাগ্রত করেন।

নবায়ন ও পরিবর্তন: বাস্তবে যদি খ্রিস্টীয় ঐক্য স্থাপন করতে হয় তাহলে প্রয়োজন অন্তরের পরিবর্তন। অন্তরের পরিবর্তন ছাড়া কোন খ্রিস্টীয় ঐক্য কল্পনা করা যায় না। এই পরিবর্তন উভয় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। অন্তরের এই পরিবর্তন হচ্ছে প্রথমত মঙ্গলসমাচারের প্রতি আমূল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের সাথে জড়িত পাপের জন্য বিনশ্রু অনুতাপ এবং সংস্কার গ্রহণ।

ধর্মতত্ত্বের সর্বপ্রধান গুরুত্ব: ধর্মতত্ত্বের পুনঃব্যাক্ষ্য খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য একান্ত আবশ্যিক। এর অর্থ এ নয় যে, বিশ্বাস-ভান্ডার পরিবর্তন বা বিশ্বাস-নীতি পরিবর্তন করা, জগতের সাথে সত্যের পরিবর্তন করা, আপোষ মিমাংসা করা, বা কোন কোন বিশ্বাসমন্ত্র বাদ দেওয়া কেননা আধুনিক মানুষ তা বুঝতে অক্ষম। ঈশ্বর যে ঐক্য চান তা হল যে সমস্ত সত্য প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি আনুগত্য।

প্রার্থনার প্রধান গুরুত্ব: অন্তরের পরিবর্তনের সাথে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রার্থনা হচ্ছে খ্রিস্টীয় ঐক্য আন্দোলনের প্রাণ স্বরূপ। তাই ঐক্য আন্দোলনকে বলা যাবে “আধ্যাত্মিক”। অন্তরের পরিবর্তন ঈশ্বরের প্রতি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা দ্বারা উদ্বুদ্ধ। ভালবাসা মিলনের বাসনা জাগায়, যে-বাসনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে পবিত্র ত্রিত্বের মধ্যকার মিলন। ভালবাসার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে সমবেত প্রার্থনায়। প্রার্থনা ঐক্যের প্রসাদ, প্রার্থনা মিলনের বন্ধন, প্রার্থনা ঐতিহ্যের মিলন, প্রার্থনা লক্ষ্যের মিলন, প্রার্থনা মিলনের সহভাগিতা, প্রার্থনা খ্রিস্টীয় মিশন ও তার বিশ্বাসযোগ্যতার প্রকাশ, প্রার্থনা মিলনের যথার্থতার প্রকাশ।

আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপ: খ্রিস্টীয় ঐক্যের প্রাণ হিসেবে প্রার্থনা হচ্ছে সকল “সংলাপ”-এর ভিত্তি। সংলাপ শুধু দ্বিপাক্ষিক কথোপকথন নয়। সংলাপ মানুষের প্রকৃতি ও মর্যাদার থেকে উৎসারিত। সংলাপ হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে মানবিক আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সংলাপ কেবলমাত্র “ধারণার সহভাগিতা” নয় বরং “দানের সহভাগিতা”; উভয় পক্ষের পারস্পরিকতা, পুনর্মিলনের বাসনা এবং সত্যের ঐক্য। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় অন্যান্য মণ্ডলী এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপস্থিতি এবং সত্যের সহভাগিতা বিশ্বজনীন

বিশপসংঘ, মণ্ডলীর প্রৈরিতিক ধর্মানসন সম্পর্কে সংলাপের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করেছে।

সংলাপের জন্য স্থানীয় মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনা: সংলাপ শুধু পোপের প্রৈরিতিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নয় বরং সকল স্থানীয় মণ্ডলীরও দায়িত্ব। বিশপদের সম্মিলনী, কমিশন এবং সিনডের নিকট সেই দায়িত্ব অর্পিত। তবে এই দায়িত্ব পালনের জন্য রয়েছে খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক ডিরেক্টরি বা নীতিমালা। নীতিমালার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যের সন্ধান করা এবং আবিস্কৃত সত্যের সহভাগিতা করা যাতে ব্যক্তি সত্যের-অনুরাগী হতে পারে।

বিবেক-পরীক্ষার জন্য সংলাপ: সত্য বিবেককে গঠন করে এবং ঐক্যের কাজকে অনুপ্রাণিত করে। সংলাপ ও প্রার্থনা একে অন্যের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিবেকী প্রার্থনা সংলাপকে ফলপ্রসূ করে। সাধু যোহন বলেন: “আমি যদি বলি আমার কোন পাপ নেই, তাহলে আমি প্রতারণা করছি, সত্য আমার মধ্যে নেই।” যদি পাপ স্বীকার করি তাহলে ঈশ্বর বিশ্বস্ত ও ন্যায্য তাও স্বীকার করি। ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করেন। খ্রিস্টীয় ঐক্য সম্ভব যদি স্বীকার করি ঐক্যের বিরুদ্ধে আমরা পাপ করেছি। সংলাপ হচ্ছে “মন পরিবর্তনের সংলাপ” – ঈশ্বরের নিকট আমাদের মন পরিবর্তনের সংলাপ এবং পরস্পরের নিকট আমাদের মন-পরিবর্তনের সংলাপ।

সংলাপের মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির উপশম: সংলাপের সময় সত্যকে আংশিকভাবে নয়, পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপন করতে হবে। দ্রুতভাবে ও ভাসাভাসা জ্ঞান দিয়ে সমঝোতা করা সঠিক নয়। পবিত্র আত্মা পূর্ণ সত্যকে দেখতে সাহায্য করে। সংলাপের অভিজ্ঞতায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে-কথা দ্বারা অনৈক্য এসেছে তা সংলাপের মাধ্যমে দূর হয়ে গেছে। ঐক্য পুনরায় উদ্ধার করা হয়েছে। এই সংলাপে দুটো আবশ্যকীয় নীতি হচ্ছে: পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বরের বাণী এবং মণ্ডলীর শিক্ষা-পরম্পরা।

বান্ধবক্ষেত্রে আন্তঃমণ্ডলীর মধ্যে সহযোগিতা: পরস্পরের সাথে সহযোগিতা অন্তর্নিহিত ঐক্যকে দৃশ্যমান করে তুলে। বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করা সহযোগিতা খ্রিস্টীয় ঐক্যের বিদ্যালয় হয়ে কাজ করে। খ্রিস্টানদের সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড জগতের কাছে খ্রিস্টানদের সম্মিলিত সাক্ষ্য বহন করে এবং বাণীপ্রচারের যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

২ ॥ সংলাপের ফলাফল

সংলাপের ফলে কী প্রাপ্তি ঘটে? আত্মত্বের পুনঃআবিষ্কার হয়; মানবসেবায় একাত্মতা সৃষ্টি হয়; ঐশ্বরবাহী এবং উপাসনার মাধ্যমে পরস্পরের কাছে যাওয়া হয়; অপর খ্রিস্টানদের মধ্যে ঐতিহ্যগত সম্পদ স্বীকৃতি লাভ করে; মিলন বৃদ্ধি হয়; প্রাচ্য মণ্ডলীর সাথে সংলাপ সম্ভব হয়েছে; যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে; ভগ্নি-মণ্ডলী হিসেবে গ্রহণ

করা হয়েছে; সংলাপের উত্তরোত্তর অগ্রগতি হয়েছে; প্রাচ্যে প্রাচীন মণ্ডলীর সাথে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে; অন্য মণ্ডলী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে সংলাপ করার প্রেরণা এসেছে; মাণ্ডলিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে; সহযোগিতার মাধ্যমে অনেক অর্জন লাভ হয়েছে।

৩ ॥ কোন দিকে আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রা

সংলাপ অব্যাহত রাখা ও তা গভীরে নিয়ে যাওয়া; ইতোমধ্যে অর্জিত ফলাফল গ্রহণ করা; খ্রিস্টীয় ঐক্যের সন্ধানে কাথলিক মণ্ডলীর অবদান সম্পর্কে অবহিত হওয়া; ঐক্যের উদ্দেশ্যে রোমের বিশপের সেবাদানের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা; রোমের মণ্ডলীর সাথে স্থানীয় মণ্ডলীর মিলন রক্ষা করা কেননা ঐক্যের জন্য তা আবশ্যিক শর্ত; পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ও মঙ্গলসমাচার ঘোষণায় তৎপর হওয়া; খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রেরণা ও সাধুবাদ সম্বন্ধে অবগত হওয়া।

১১ খ ॥ খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টায় (ইকিউমেনিকাল) পোপ ফ্রান্সিসের উদ্যোগসমূহ

পোপ ফ্রান্সিস আস্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্ক উন্নয়নে, পূর্বসূরী পোপ বেনেডিক্টের দ্বারা অর্জিত সকল অর্জনের উপর ভিত্তি করে, তারই ধারাবাহিকতায় অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যেমন: বিভিন্ন মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে সভা এবং বিভিন্ন চার্চের সঙ্গে সংলাপ করেছেন। ঐক্য ও “সাক্ষাতের কৃষ্টি” উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় তিনি বড়ই উদ্যোগী ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সব কাথলিক, অর্থডক্স, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের (ডিনোমিনেশন) খ্রিস্টানুসারীদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পায়। পোপের নেয়া উদ্যোগসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে তুলে ধরিছি:

(১) সভা-সাক্ষাৎ ও সংলাপ: পোপ ফ্রান্সিস প্রাচ্য অর্থডক্স মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে বিশেষভাবে কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক বার্থলমিয়ারের সাথে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎ করেছেন। একই বছর কিউবাতে রাশিয়ার অর্থডক্স প্যাট্রিয়ার্ক কিরিলের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল যাতে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার হয় এবং উভয়ের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি সম্বন্ধে ঐকমত্য অনুসন্ধান করা হয়। পোপ ফ্রান্সিস লুথেরান মণ্ডলীর সাথে সুইডেনে, ২০১৬ খ্রি. প্রোটেস্ট্যান্ট বিপ্লবের ৫০০ বছরের পূর্তি যৌথভাবে পালন করেছেন এবং লুথেরান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটি সমঝোতার বিবৃতি যৌথভাবে স্বাক্ষরিত হয়। দলিলে প্রকাশ করা হয় যে, এই দুই মণ্ডলীর মধ্যে অনৈক্যের চাইতে ঐক্য অনেক বেশি। অ্যাংলিকান মণ্ডলীর সভায় তিনি যোগদান করেছেন এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন অনেকবার। তিনি অ্যাংলিকান মণ্ডলী এবং প্রাচীন কাথলিক মণ্ডলীসমূহের সাথে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আলাচনায় লিপ্ত

ছিলেন তাঁর পুরো কার্যকালে। বিশেষ প্রয়োজনে সুদান সফরকালে আর্চবিশপ অব ক্যান্টোরবারি তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন।

- (২) **সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনা:** পোপ ফ্রান্সিস খ্রিস্টীয় ঐক্য এবং সমঝোতার জন্য, বিভিন্ন খ্রিস্টান ঐতিহ্যের মন্ডলীর সদস্যদের সাথে সমবেতভাবে প্রার্থনা ও উপাসনার গুরুত্ব অনুভব করে তিনি নিজে তাতে যোগদান করতেন। পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং পোপ চতুর্দশ লিও'র উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে প্রাচ্য মণ্ডলীর প্রধানদের অংশগ্রহণ।
- (৩) **“সাক্ষাতের কৃষ্টি”:** পরস্পরের মধ্যে “সাক্ষাতের কৃষ্টি” গড়ার জন্য পোপ ফ্রান্সিস নিজেই উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে যায় এবং ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত দলগুলোর মধ্যে যোগসেতু নির্মাণ করা হয়। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দর্শন করা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সংলাপের একটি কার্যকরী পদ্ধতি। পোপ ফ্রান্সিস অন্য ধর্মের এবং অন্য মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে “সাক্ষাতের কৃষ্টি” গড়ে তুলেছেন।
- (৪) **যৌথ বিবৃতি ও উদ্যোগ:** অন্যান্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন এবং যৌথভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যেন সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন ২০২৫ খ্রি. একসঙ্গে পুনরুত্থান পর্ব পালন করার জন্য প্রাচ্য অর্থডক্স মন্ডলী ও কাথলিক মণ্ডলীর যৌথ ঘোষণাপত্র। কপ্টিক চার্চের ২৮ জন ধর্মশহীদকে কাথলিক মণ্ডলীর দ্বারা স্বীকৃতি।
- (৫) **“রোমের বিশপ সম্পর্কে আন্তঃমন্ডলিক আলোচনা”:** পোপ ফ্রান্সিসের সমর্থনে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক পোপের মন্ত্রণালয় থেকে একটি দলিল প্রকাশিত হয়। দলিলের নাম ছিল: “বিশ্বজনীনপত্র *Ut Unum Sint* (তারা যেন এক হয়) অনুসারে রোমের বিশপ: প্রাধান্য ও সিনড-প্রক্রিয়া” বিষয় নিয়ে আন্তঃমন্ডলিক পর্যালোচনা এবং মতামত প্রকাশ করা হয়। আন্তঃমন্ডলিক পর্যালোচনায় পোপের প্রাধান্য সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই দলিলে স্থান পেয়েছে এবং আগামী পুনর্মিলিত মণ্ডলীতে কীভাবে পিতরের ভূমিকা, রোমের বিশপ বা পোপ পালন করতে পারেন তার সম্ভাবনাও যাচাই করা হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে সুপারিশও করা হয়েছে। রোমের বিশপের প্রধান কাজ হল ভালবাসা ও ঐক্যের উপর সভাপতিত্ব করা।
- (৬) **“সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী”:** পোপ মহোদয় মণ্ডলীতে সিনড-প্রক্রিয়া বা অপরের কথা শোনা এবং মাণ্ডলিকভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার প্রক্রিয়ার গুরুত্বের ওপর বেশ জোর দিয়েছেন, যার মাধ্যমে ঐক্য অর্জন এবং আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্কের উন্নতি

সাধন করা যায়। পোপ ফ্রান্সিস খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, কাথলিক মণ্ডলীর সিনড-প্রক্রিয়া খ্রিস্টীয় ঐক্য আরও ফলপ্রসূ ও বেগবান করবে।

- (৭) **অনুতাপ ও ক্ষমা:** পোপ ফ্রান্সিস কাথলিকদের আহ্বান করেছেন যেন তারা অতীতের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা যাচনা করে এবং তাদেরকে ক্ষমা দান করে যারা অতীতে নির্যাতিত হয়েছেন; এভাবে পুনর্মিলন ও নিরাময় সাধন করা হবে।
- (৮) **নিসীয় বিশ্বাস মন্ত্র:** পোপ ফ্রান্সিস জীবদ্দশায় বাসনা করেছিলেন যে, নিসীয় ইকিউমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি অনুষ্ঠান তিনি অর্থডক্স মন্ডলী ও অন্যান্য মণ্ডলীর সাথে একত্রিত হয়ে পালন করবেন ইরাকের প্রাচীন নিসীয় নগরে (বর্তমানে ইজদিক নামক এলাকায়)। পোপ ফ্রান্সিসের এই পরিকল্পিত ঘটনা আন্তঃমণ্ডলিক সংলাপ ও ঐক্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র: আন্তঃমণ্ডলিক সম্পর্কের ভিত্তি

- (ক) মণ্ডলীর প্রথম নিসীয় ইকিউমেনিকাল ("oikoumene") মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে। উক্ত সভায় বিশ্বজনীন বিশ্বাসমন্ত্র সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। ইকিউমেনিকাল মহাসভা কাথলিক মণ্ডলীতে, পোপের সভাপতিত্বে, বিশ্বের সকল বিশপদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।
- (খ) নিসীয় মহাসভার বার্ষিকী উপলক্ষে পোপের “আন্তর্জাতিক ঐশতাত্ত্বিক কমিশন” একটি দলিল প্রকাশ করেছে। দলিলটির নাম: “যিশু খ্রিস্ট, ঈশ্বরের পুত্র, ত্রাণকর্তা: মণ্ডলীর নিসীয় ইকিউমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছর পূর্তি”। পোপ ফ্রান্সিস এই দলিলটিকে অনুমোদন করেছেন।
- (গ) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র হচ্ছে খ্রিস্ট সম্বন্ধে মণ্ডলীর বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকারোক্তি। পবিত্র ত্রিত্ব এবং যিশুর ঈশ্বরত্বের উপর বিশ্বাস সম্বলিত খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্র আমাদের বিশ্বাসের “পরিচয়পত্র” বলে বিবেচিত।
- (ঘ) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সমস্ত খ্রিস্টান মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যের চিহ্ন। এ বছর কাথলিক ও অর্থডক্স মণ্ডলী ও অন্যান্য মণ্ডলী একই দিনে পুনরুত্থান উৎসব পালন করেছে। নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। পোপ মহোদয় বাসনা করেছেন যে, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা বিভিন্ন মন্ডলীকে একত্রিত করবে এবং কাথলিক বিশ্বাসীবর্গকে অনুপ্রাণিত করবে সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য।
- (ঙ) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের বার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং সেই উপলক্ষে প্রকাশিত দলিলটি খ্রিস্টীয় ঐক্য স্থাপনে এবং চার্চের মিশনকে আরও জোরদার করবে। নিসীয়

সম্মেলন এবং চার্চের চলমান সিনড-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত কারণ এই প্রক্রিয়া “একসঙ্গে চলার” গুরুত্ব আরোপ করছে। এই গুরুত্ব মঙ্গলসমাচার অনুসারে জীবনযাপন করার প্রতি একনিষ্ঠতার আহ্বান।

(চ) আন্তর্জাতিক ঐশতত্ত্ব বিষয়ক কমিশন বিগত মে ২০, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে দলিলটির ওপর একটি অধ্যয়ন দিবস আয়োজন করা হয়। দিবসটি রোমে পন্টিফিকাল উরবানিয়ানা নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে অনেক ঐশতত্ত্ববিদ ও বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থেকে দলিলটির বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। পোপ লিও’র মতে: নিসীয়া বিশ্বাসমন্ত্র, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী ও পুনরুত্থান দিবস উদ্‌যাপন – তিনটি অধ্যয়নের বিষয়। যা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে তার চেয়ে যা একত্রিত করে তার পরিমাণ বহুগুণ বেশি।

মন্ডলীর আদি পিতৃগণের একটি কথা উল্লেখ করতে চাই: “আমরা যেভাবে দীক্ষিত সেভাবে আমরা বিশ্বাস করি; এবং আমরা যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে আমরা প্রার্থনা করি।” সুতরাং খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য অপরিহার্য: পবিত্র ত্রিত্বের নামে দীক্ষান্নান, বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং প্রার্থনা।

(৯) যিশুখ্রিস্ট-২০৩৩ (জেসি-২০৩৩): কাথলিক, অর্থডক্স, ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চ, অ্যাভাঞ্জেলাকাল সম্প্রদায়, প্রমুখ কর্তৃক একটি মুভমেন্ট শুরু হয়েছে। প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যিশুর পুনরুত্থানের ২০০০ বর্ষের পূর্তি উদ্‌যাপন করা এবং এ উদ্দেশ্যে একসঙ্গে ইকিউমেনিকাল মহাযাত্রার আহ্বান জানানো হয়েছে। উদ্যোগের মূলবাণী হচ্ছে: “আমাদের পরিচয় খ্রিস্ট, কোন সম্প্রদায় নয়।” এই উদ্যোগকে পোপ ফ্রান্সিস স্বাগতম ও সমর্থন জানিয়েছেন।

৥ গ ৥ বাংলাদেশে আন্তঃমাণ্ডলিক পরিবেশ ও বাস্তবতা

বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য ও ভিন্নতা

- ১) বাংলাদেশে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন মিশনারী দল ও সংগঠন এসেছে মূলতঃ খ্রিস্টবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন মণ্ডলী বা মণ্ডলীর মধ্যে বিভাজন নিয়ে আসা তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না।
- ২) পরবর্তীতে যেহেতু বিভিন্ন মিশনারী দল প্রচার করেছে, তাদের আপন পরিচয়ে মণ্ডলী পরিচিত হয়েছে এবং এভাবে খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভক্ত মণ্ডলীর পরিচিতি লাভ করেছে।
- ৩) বাংলাদেশে মণ্ডলীর মধ্যে বিভাজন মূলত ধর্মতাত্ত্বিক কারণে নয়। এ কারণে সাধারণতঃ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে এই বিভাজন গ্রহণযোগ্য নয়।

- ৪) খ্রিস্টাব্দী প্রচারের সাথে সাথে গড়ে উঠেছে উপাসনালয়, গির্জা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ইত্যাদি যা পরিচিতি লাভ হয়েছে মণ্ডলী বা খ্রিস্টান সম্প্রদায় অনুসারে।
- ৫) বিদেশ থেকে অর্থসাহায্য খ্রিস্টানদের মধ্যে পার্থক্য এবং মণ্ডলীগুলোর মধ্যে ভাগাভাগি ও ভিন্নতা অনেকাংশে দায়ী। এ কারণে কিছু কিছু এলাকায় ও গ্রামে এমন কি একই পরিবারের মধ্যেও বিভিন্ন মণ্ডলীর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য-প্রচেষ্টা

- ১) খ্রিস্টীয় জীবনে দৃশ্যমান ঐক্য: আত্মীয়তা ও এলাকার প্রতিবেশীর বন্ধন; আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনা, উপাসনা, মহাসভা, উদ্দীপনা-সভা ও ধর্মীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান, খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহের প্রার্থনা, বাইবেল দিবস, আন্তঃমাণ্ডলিক বিবাহ, পারিবারিক-সামাজিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব।
- ২) আন্তঃমাণ্ডলিক সংগঠন: কমিটি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন: উদাহরণ স্বরূপ: যৌথ কমিটি, ওয়াইএমসিএ, ওয়াইডব্লিউসিএ, ক্রেডিট ইউনিয়ন, খ্রিস্টান এন.জি.ও, ইত্যাদি।
- ৩) আন্তঃমাণ্ডলিক চার্চ সংগঠন: এনসিসিবি, এনসিএফবি, ইউএফসিবি ও তার কার্যক্রম, যৌথ খ্রিস্টান ধর্মশিক্ষা ও সিলেবাস প্রণয়ন, নির্দিষ্ট মণ্ডলীর নিজস্ব আয়োজনে অতিথি হিসেবে অন্যদের নিমন্ত্রণ।
- ৪) সম্ভাব্য সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড: আনুষ্ঠানিক আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপ, বাইবেল সেবাকর্ম, যৌথ গঠন ও আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ, বাইবেল বিষয়ক কর্মকাণ্ড, উপাসনা-অনুষ্ঠান রীতি, ধর্মশিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা, বাণী প্রচার, পালকীয় কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা, অন্য ধর্মের সাথে সংলাপ, মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে সহযোগিতা, মানবোন্নয়ন এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ, যোগাযোগ মাধ্যম, ইত্যাদি।
- ৫) সর্বশেষে, বাংলাদেশে যদি সত্যিকারে খ্রিস্টীয় ঐক্য স্থাপনে অগ্রসর হতে হয় তাহলে বিশ্বাসের সত্য নিয়ে সংলাপ করতে হবে নতুবা সত্যকে আপেক্ষিক ও অসম্পূর্ণ রেখে অনৈক্যের পথে পথচলা অব্যাহত থাকবে।

Sources

১. দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল: খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টা, *Unitatis Redintegratio*, 21 Novemeber, 1964; কাথলিক প্রাচ্য মণ্ডলী বিষয়ক নির্দেশনামা, *Orientalium Ecclesiarum*, 21 Novemeber, 1964.
২. পোপ দ্বিতীয় জন পল ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত

ক'রে, “তারা যেন এক হয়” (*UT UNUM SINT*) শীর্ষক বিশ্বজনীনপত্রটি প্রকাশ করেছিলেন।

3. Directory for the Application of Principles and Norms on Ecumenism, *by The Pontifical Council for Promoting Christian Unity, Vatican City, March 25th, 1993*
4. By Martin Bürger Top ecumenical initiatives of Pope Francis: a retrospective
Munich, Germany, Apr 24, 2025 / 14:31 pm
5. By Kristina Millare, Vatican releases document to mark 1,700th anniversary of First Council
Vatican City, Apr 3, 2025 / 13:00 pm
6. Vatican News: The Nicene Creed: an expression of Christian identity
7. Pope Francis: Restoration of Christian unity is ‘an urgent priority in today’s world

ৱচনা- ৩: খ্রিস্টান বিশ্বাস এবং নিসীয় খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্র

প্রথমে আমি ইউএফসিবি-এর কর্মকর্তাদের অনেক সাধুবাদসহ কৃতজ্ঞতা জানাই যে, “খ্রিস্টান বিশ্বাস এবং নিসীয় খ্রিস্টবিশ্বাস” বিষয়টি আজকের সর্বমন্ডলীর খ্রিস্টান কনফারেন্সের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। আমি প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে, আমি ডগম্যাটিক থিওলজিয়ান নই। আমার শিক্ষা মূলত খ্রিস্টান নৈতিক বিষয় সম্পর্কে। আরও একটি বিষয়ে আমি আমার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিচ্ছি যে, এখানে উপস্থিত সকল মণ্ডলীর মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের প্রচলিত শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের সাথে আমি তেমন পরিচিত নই। আলোচ্য বিষয়টি খ্রিস্টান বিশ্বাস সম্পর্কিত হওয়ায় এবং এই বিশ্বাসই আমার প্রচারকাজের যৌক্তিকতার ভিত্তি হওয়ায়, আমার জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার ভরসা পাচ্ছি।

(১) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র অথবা বিশ্বাসসূত্রের গুরুত্ব

মণ্ডলীর খ্রিস্টবিশ্বাস ও মিশনকাজের মূল ভিত্তি হিসেবে রয়েছে নিসীয় খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্র বা খ্রিস্টবিশ্বাসসূত্র। এ কারণে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র বিষয়ে আলোচনা করার গুরুত্ব বিশেষ করে নিম্নোক্ত কারণে:

(ক) প্রথমত, এ বছরটিতে *খ্রিস্টের আগমনের ২০২৫ বছরের জুবিলী* পালিত হচ্ছে। খ্রিস্টের বিশ্বাসী হিসেবে রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীতে বছরটি পুণ্যবর্ষরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এই বর্ষে ধর্মবিশ্বাসের জয়ন্তী পালন পুণ্যবর্ষের অন্যতম একটি প্রধান কর্মসূচী হিসেবে রয়েছে। তাই বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে তিনটি খ্রিস্টান মাণ্ডলিক জোট-সংগঠনের কয়েকজন যোগদানকারী, আমরা একত্রে বিশ্বাসমন্ত্র আলোচনা ও ধ্যান করে মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের জুবিলী উদ্‌যাপন করছি।

(খ) দ্বিতীয়ত, এই জুবিলী বর্ষেই আবার স্মরণ করা হচ্ছে ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত মণ্ডলীর প্রথম নিসীয় ইকিউমেনিকাল ("oikoumene") মহাসভা, যার ১৭০০তম বর্ষ পূর্তি এ বছর স্মরণ করা হচ্ছে। উক্ত সভায় বিশ্বজনীন খ্রিস্টান বিশ্বাসমন্ত্র সংজ্ঞায়িত হয়েছিল, খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাস নীতিসমূহ প্রণীত হয়েছিল এবং একটি বিশ্বাস-ভাভারে সংগৃহীত করা হয়েছিল। রোমের বিশপের সভাপতিত্বে, বিশ্বের তৎকালীন সকল বিশপদের নিয়ে (প্রায় ৩০০ বিশপ) ইকিউমেনিকাল মহাসভাটি ক্যাথলিক (বিশ্বজনীন) মণ্ডলীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(গ) তৃতীয়ত, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র হচ্ছে খ্রিস্ট সম্বন্ধে মণ্ডলীর বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকারোক্তি। বিশ্বাসের এই স্বীকারোক্তি পবিত্র ত্রিত্ব এবং যিশুর ঈশ্বরত্বের উপর

বিশ্বাস-সম্বলিত। নিসীয খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্র আমাদের খ্রিস্টান বিশ্বাসের “পরিচয়পত্র” বলে বিবেচিত। এই বিশ্বাসমন্ত্রে পবিত্র ত্রিত্ব, যিশু খ্রিস্ট, যিনি ঈশ্বর ও মানুষ, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে পরিব্রাজন, প্রভৃতি বিষয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসনীতির সার-সংক্ষেপ এই বিশ্বাস-ভান্ডারে রক্ষিত হয়েছে। নিসীয বিশ্বাসমন্ত্র সমস্ত খ্রিস্টান মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যের চিহ্ন। নিসীয বিশ্বাসমন্ত্র আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। এই একই বিশ্বাসে গঠিত হওয়া প্রত্যেক খ্রিস্টানের দায়িত্ব।

(ঘ) বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টাকে ঐশতাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে আরও গভীরতা প্রদানের প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করছেন। এ বাসনাটি বলতে হবে আমাদের পরিপক্বতারই প্রকাশ। আমাদের বিশ্বাসের ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে খ্রিস্টীয় ঐক্য-প্রচেষ্টাকে জোরদার করার জন্য আজকের আয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। নিসীয বিশ্বাসমন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা বিভিন্ন মণ্ডলীকে একত্রিত করবে এবং বিশ্বাসীবর্গকে অনুপ্রাণিত করবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য; এভাবে খ্রিস্টীয় ঐক্য স্থাপনে এবং চার্চের মিশনকে আরও জোরদার করবে। নিসীয বিশ্বাসমন্ত্রের বার্ষিকী উদ্‌যাপন “একসঙ্গে চলার” গুরুত্ব আরোপ করবে এবং মঙ্গলসমাচার অনুসারে জীবনযাপন করার প্রতি একনিষ্ঠতার আহ্বান জানাবে।

(২) নিসীয বিশ্বাসমন্ত্রের বার্ষিকীতে ঐশতত্ত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের অধ্যয়ন ও দলিল:

আজকে নিসীয বিশ্বাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা স্মরণ করি, নিসীয মহাসভার বার্ষিকী উপলক্ষে পোপের “আন্তর্জাতিক ঐশতাত্ত্বিক কমিশন” নিসীয বিশ্বাসমন্ত্র নিয়ে একটি অধ্যয়ন-সভা আয়োজন করেছিল এবং তার পরিসমাপ্তিতে একটি দলিলও প্রকাশ করা হয়েছে। দলিলটির নাম: “যিশু খ্রিস্ট, ঈশ্বরের পুত্র, ব্রাহ্মণকর্তা: মণ্ডলীর নিসীও ইকিউমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছর পূর্তি”। প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস মৃত্যুর পূর্বে এই দলিলটিকে অনুমোদন করে গেছেন।

ইতিহাসে নিসীয বিশ্বজনীন মহাসভা একটি ঐতিহাসিক মহাসভা ছিল। তৎকালীন সময়ে বিদ্যমান নানা ভ্রান্ত মতবাদের প্রেক্ষাপটে বিশ্বের বিশপগণ প্রথমবারের মতো ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান বিশ্বাসমন্ত্র নির্ধারণ করেছিলেন, তাঁরা সকল বিশ্বাসকে একত্রিত করেছিলেন, বিশ্বাসের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছিলেন এবং যিশু খ্রিস্টকে মুক্তিদাতা হিসেবে, এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐক্যে এক-ঈশ্বরে বিশ্বাসকে ঘোষণা করেছিলেন।

৩৮১ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্তিনোপল মহাসভা কর্তৃক পরিশোধিত হয়ে নিসীয বিশ্বাসমন্ত্র মণ্ডলীর পরিচয়পত্র এবং মণ্ডলীর বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হতে থাকে। নিসীয মহাসভায় খ্রিস্টবিশ্বাসকে শুধু সুনির্দিষ্টই করা হয়নি, বরং মহাসভাটি মণ্ডলীর মধ্যে নিয়ে এসেছে ঐক্য এবং বিশ্বজনীনতা (ইকিউমেনিকাল অথবা বিশ্বজনীন/কাতলিক বিশেষত্ব)।

শুরু থেকেই প্রেরিতিক খ্রিস্টমণ্ডলী সবার জন্য **সংক্ষিপ্ত মন্ত্র-আকারে বা সূত্র-আকারে**, বিধিসম্মত ভাবে, তার বিশ্বাস প্রকাশ ও সম্পন্ন করে আসছে (রোমীয় ১০:৯; ১ করি ১৫:৩-৫); বিশেষ করে দীক্ষা-প্রার্থীদের কথা বিবেচনা করে এ কাজটি করা হয়েছিল। তবে ধর্মবিশ্বাসের এই সংশ্লেষণ মানুষের মতামতের সাথে সঙ্গত করার উদ্দেশ্যে করা হয় নি; এ প্রসঙ্গে যেরুসালেমের সাধু সিরিল যেমন বলেন: “পবিত্র শাস্ত্র থেকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ধর্মবিশ্বাসের অভিন্ন শিক্ষারূপে প্রদান করার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল”।

খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাসমন্ত্রগুলো শুধু তাত্ত্বিক ঐশতত্ত্বই নয়; বরং খ্রিস্টবিশ্বাসের এই সংশ্লেষণ যেন খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের গভীরতা এবং খ্রিস্টান বিশ্বাসী সমাজের মধ্যে তার জীবনসাক্ষ্য যে সদা বহমান রয়েছে তা যেন খ্রিস্টবিশ্বাসীরা আরও গভীরভাবে বুঝতে পারে।

পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিসীয় মহাসভায় খ্রিস্টান বিশ্বাসমন্ত্র, প্রথমবারের মতো মন্ডলীর ঐক্য ও বাণীপ্রচারের বিষয়গুলো একটি উত্তম **সিনড-প্রক্রিয়া** (একসঙ্গে পথচলার পদ্ধতি) অনুসরণ করে, বিশ্বজনীন বিশ্বাসমন্ত্র রূপে (ইকিইম্যানিকাল বা কাথলিক/সর্বজনীন) প্রকাশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে, একসঙ্গে পথচলা বা সিনড-প্রক্রিয়া অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর বিশ্বাসকে আরও গভীরভাবে জানার জন্য এবং মণ্ডলীর মিশন পালন করার জন্য এই প্রক্রিয়া আমাদেরকে অনেক প্রেরণা যোগাতে পারে।

বিশ্বজনীন বিশ্বাসমন্ত্র সম্পর্কে মন্ডলীর আদি পিতৃগণের একটি কথা উল্লেখ করতে চাই: “আমরা যেভাবে দীক্ষিত হই সেভাবে আমরা বিশ্বাস করি; এবং আমরা যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে আমরা প্রার্থনা করি।” সুতরাং খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে: পবিত্র ত্রিত্বের নামে আমাদের দীক্ষান্নান বা অবগাহন, আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং আমাদের সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনা।

(৩) মণ্ডলীতে খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্রের দুটো স্বীকৃত ধারা

ধর্মবিশ্বাসমন্ত্রসমূহের মধ্যে খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে দু'টি বিশ্বাসোক্তি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। একটি হচ্ছে **নিসীয়-কনস্টান্তিনোপলীয় বিশ্বাসমন্ত্র**, যার সূচনা হয়েছিল দু'টি বিশ্বজনীন মহাসভা থেকে (৩২৫ এবং ৩৮১ খ্রিস্টাব্দ)। আজ পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল বৃহৎ খ্রিস্টমণ্ডলীগুলোতে একই ভাবে এই বিশ্বাসমন্ত্র সমাদৃত হয়ে আছে।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে **প্রেরিতদূতগণের বিশ্বাসমন্ত্র**। এটি রোমীয় খ্রিস্টমণ্ডলীতে দীক্ষান্নানের সময় উচ্চারিত অতি প্রাচীন বিশ্বাসোক্তি। রোমীয় খ্রিস্টমণ্ডলীতে এটি বিশেষ করে দীক্ষান্নানের রীতিতে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

আমরা যখন খ্রিস্টে দীক্ষিত হই তখন আমরা পবিত্র ত্রিত্বে দীক্ষান্নাত/বাণ্টাইজিত/ অবগাহিত হই; আমরা পবিত্র ত্রিত্বের প্রতি বিশ্বাস রেখে আমরা দীক্ষিত হই। খ্রিস্টে দীক্ষালাভের সময় আমাদের ওপরে উচ্চারিত হয়: “আমি (নাম....) তোমাকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় দীক্ষান্নাত করি”। এর অর্থ হচ্ছে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরে আমরা বিশ্বাস স্বীকার করি, সেই বিশ্বাসে জীবন যাপন করি, যে-জীবন পিতা, পুত্র ও আত্মারই জীবন, সেই জীবনে আমরা প্রবেশ করি এবং খ্রিস্টবিশ্বাসী হয়ে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের মিশন সম্পন্ন করার সাধনা করি।

(৪) নিসীয় মহাসভার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

নিসীয় মহাসভার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসেবে বলা যায় যে, খ্রিস্টমণ্ডলীর আদিযুগে খ্রিস্টানদের মধ্যে বিশ্বাসকে বুঝতে গিয়ে, অন্যের কাছে শিক্ষা দিতে গিয়ে বহু বছর ধরে অনেক আলোচনা ও সমালোচনা করতে হয়েছে। *ঐশতাব্দিক আলোচনায়* বিভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছিল যা ছিল অনেকবার পরস্পর-বিরোধী।

বিশ্বাস সম্বন্ধে যখন ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দল এবং তাদের অনুসারী। মণ্ডলীর আদি যুগে এক ধরনের মতামত ছিল যা যিশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেছে আবার এর বিপরীতে অন্য মতবাদ ছিল যা যিশুর মানবত্ব অস্বীকার করেছে। পবিত্র ত্রিত্ব ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়েও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত আকারে তৎকালীন সময়ের সেই *ভ্রান্ত মতবাদগুলো* তুলে ধরছি: ভ্রান্তমতবাদ হচ্ছে স্বীকৃত বিশ্বাসধারা থেকে বিচ্যুত মতবাদ। খ্রিস্টান বিশ্বাস সম্বন্ধে ভ্রান্তমতবাদ গুলো দুটো বিষয় কেন্দ্র করে উদ্ভাবিত হয়েছিল: *পবিত্র ত্রিত্বের স্বরূপ ও সম্পর্ক বিষয়ে এবং যিশু খ্রিস্টের প্রকৃত সত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে*। দ্বিতীয় শতাব্দীতে *সাবেলিয়ান* মতবাদের সৃষ্টি হয়। এই মতবাদ অনুসারে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা হচ্ছে একই ঈশ্বরের তিন ধরনের প্রকাশ, ভূমিকা বা পরিচয় যা এক ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। *ডসেটিজম* ভ্রান্তবাদের মূল কথা হচ্ছে যিশুর কোন মানবরূপ ছিল না। *একদেহবাদী* মতবাদ হচ্ছে: যিশু খ্রিস্টের মধ্যে আছে দুটো ভিন্ন প্রকৃতি কিন্তু একটি দেহে তা সংযুক্ত। *এপোলিনারিয়ান* মতবাদ (৩৫০): এই মতবাদ অনুসারে যিশু খ্রিস্ট প্রকৃত মানব-স্বভাবী ছিলেন না, আবার পুরোভাবে তিনি যে ঈশ্বর-স্বভাবী ছিলেন তা-ও নয়। *এরিয়ান* মতবাদ (২৫০-৩৩৬ খ্রি.) খুবই কঠোর ভ্রান্তবাদী মতবাদ ছিল। তারা এই মত পোষণ করেন যে, যিশু খ্রিস্ট ঈশ্বর ছিলেন না; মানুষের পরিব্রাণের জন্য তিনি ছিলেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের প্রেক্ষাপটে, মণ্ডলীর ঐক্য, বিশ্বাসের ঐক্য এবং সাম্রাজ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য সম্রাট কনস্টান্টাইনের আহ্বানে প্রথম নিসীয় মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রকে আবার নিসীয়-কনস্টান্তিনোপল বিশ্বাসমন্ত্র বলেও আখ্যায়িত হয়ে থাকে। **নিসীয় ইকিউম্যানিকাল প্রথম মহাসভা** (৩২৫ খ্রি.) এবং **তৃতীয় ইকিউম্যানিকাল কনস্টান্তিনোপল মহাসভা** (৩৮১ খ্রি.) দু'টির সিদ্ধান্তক্রমে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র গৃহীত হয়। ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কনস্টান্তিনোপল মহাসভায় পবিত্র আত্মার সম্পর্কে একটি অংশ সংযোজন করা হয়। সেখানে বলা হয় যে, পিতা ও পুত্র থেকে (*Filioque*) পবিত্র আত্মা জাত হয়েছেন।

রোমান কাথলিক মন্ডলী, এ্যাংলিকান মন্ডলী, এবং বৃহত্তর প্রোটেষ্টান্ট মণ্ডলীগুলো নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রটি একমাত্র বিশ্বাসমন্ত্র রূপে গ্রহণ করে আসছে। আর প্রাচ্যের অর্থডক্স মন্ডলী কনস্টান্তিনোপল (৩৮১) মহাসভা কর্তৃক সংযুক্ত “পুত্র হতে জাত” (*Filioque*) বাদ দিয়ে বিশ্বাসমন্ত্রটি ব্যবহার করে আসছে।

(৫) নিসীয় মহাসভা দ্বারা নির্ধারিত বিশ্বাসোক্তিসমূহ

পবিত্র ত্রিত্ব হচ্ছে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস: পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বরে বিশ্বাস।

(ক) পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস

বিশ্বাসমন্ত্র - ১: এক পরমেশ্বর, সর্বশক্তিমান পিতা, স্বর্গ ও মর্ত

এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য বিশ্বমন্ডলের সৃষ্টিকর্তায় আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

বিশ্বাসের মর্মার্থ: (বাইবেলের শিক্ষানুযায়ী)

- এক ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি (২ বিবরণ ৬:৪-৫; ফিলিপ্পীয় ২:১০-১১; মার্ক ১২:২৯-৩০, ৩৫-৩৭)
- ঈশ্বর তাঁর নাম প্রকাশ করেন (ফিলিপ্পীয় ২: ১০-১১) (ক) তিনি জীবনময় ঈশ্বর (যাত্রা ৩: ৬: {ইতিহাসের ঈশ্বর}), (খ) “আমি সেই আমি যিনি আছেন” (যাত্রা ৩:১৩-১৫); (গ) দয়ালু ও কৃপাময় ঈশ্বর, (ঘ) একমাত্র ঈশ্বর আছেন, (ঙ) ঈশ্বর যিনি সত্য ও প্রেম: ঈশ্বর সত্যস্বরূপ (১ যোহন ১:৫, ৪:৮), ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ (ইসাইয়া ৪৩: ১-৯; ১ যোহন ৪:৮, ১৬)।

বিশ্বাস খ্রিস্টীয় জীবনের জন্য সহায়ক। খ্রিস্টবিশ্বাসের কারণে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য ও তার মহিমা জানতে পারি; কৃতজ্ঞতার সাথে জীবনযাপন করতে পারি; সকল মানুষের ঐক্য ও প্রকৃত মর্যাদা সম্বন্ধে জানতে পারি; সৃষ্টি বস্তুর সদ্ব্যবহার করতে পারি এবং সব পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে পারি।

পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ: এই বিশ্বাসমন্ত্রে মধ্যে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

পিতা: ঈশ্বর যে পিতা সেখানে যে-বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা হল: “পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে” – এর অর্থ, ত্রিত্বরূপে ঈশ্বরের প্রকাশ (পুত্র কর্তৃক পিতা প্রকাশিত, পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্রকে প্রকাশ করেন); ধর্মবিশ্বাসের শিক্ষা অনুসারে পবিত্র ত্রিত্ব, ঈশ্বরের ত্রাণদায়ী কার্যাবলি ও ত্রিত্বিক মিশনকর্মসমূহ।

সবশক্তিমান ঈশ্বর:

সৃষ্টিকর্তা: সৃষ্টিবিষয়ক শিক্ষাদান, সৃষ্টি – পবিত্র ত্রিত্বের কাজ, “ঈশ্বরের গৌরবের জন্য জগত সৃষ্টি হয়েছে”, সৃষ্টির রহস্য: (ঈশ্বর প্রজা ও প্রেমের দ্বারা সৃষ্টি করেন, ঈশ্বর শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করেন, ঈশ্বর সুসজ্জল এবং উত্তম বিশ্ব তিনি সৃষ্টি করেন, ঈশ্বর সৃষ্টির উর্ধে ও সৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত, ঈশ্বর সৃষ্টিকে ধারণ করেন ও রক্ষা করেন), ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা সম্পাদন করেন – ঐশতত্ত্বাবধান।

স্বর্গ ও মর্ত: অদৃশ্যমান ও দৃশ্যমান জগত

মানুষ: পরমেশ্বরের নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্ট, মানুষ হচ্ছে “দেহ ও আত্মা, কিন্তু আসলে এক সত্তা”, “পুরুষ ও নারী করে তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন”; মানুষের পতন: মানুষের পাপ, “তুমি তাকে মৃত্যুর কবলে পরিত্যাগ করনি”।

(খ) পুত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস

বিশ্বাসমন্ত্র - ২: আমি বিশ্বাস করি এক প্রভু যিশু খ্রিস্টে,

যিনি পরমেশ্বরের একমাত্র-জাত, এবং সর্বযুগের পূর্বে পিতা হতে জনিত।

পরমেশ্বরের হতে পরমেশ্বর, জ্যোতি থেকে জ্যোতি, সত্যেশ্বর হতে সত্যেশ্বর।

তিনি জাত, সৃষ্ট নন, পিতার সঙ্গে অভিন্ন-স্বরূপ; তাঁর দ্বারা সমস্তই হল সৃষ্ট।

আমাদের মানবকুলের জন্য ও আমাদের পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে

স্বর্গ থেকে তিনি অবরোহন করলেন

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন ঈশ্বরের বাণী, যিনি ঈশ্বরের পুত্র, যিনি পিতা হতে জনিত।

তিনি জাত, সৃষ্ট নন। এই নিগূঢ়তত্ত্বটা বুঝা কঠিন। যিশু কি করে একই সময়ে ঈশ্বর ও মানুষ হতে পারেন সে নিয়ে অনেক ঐশতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে।

অন্য কথায় যিশু পূর্ণ ঈশ্বর এবং তিনি চিরন্তন, যেমন পিতা চিরন্তন। এখানে এই

কথাটি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে, একজন মাত্র ঈশ্বর আছেন, তবে পিতা তাঁর ব্যক্তিসত্তায় পুত্র থেকে আলাদা।

মহাসভার পিতৃগণ পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে যাচাই করে এরিয়ান মতবাদের যুক্তি (অর্থাৎ যিশু সৃষ্ট ছিলেন এবং তিনি সত্যিকারে ঈশ্বর ছিলেন না) – এই যুক্তি খন্ডন করেছেন। যিশু ঈশ্বরের বাক্য হিসেবে অনন্তকাল ধরে ছিলেন এবং তিনি সর্বদাই বিদ্যমান। পিতা থেকে তিনি জনিত, সত্যেশ্বর হতে সত্যেশ্বর, জ্যোতি থেকে জ্যোতি।

এখানে একটি জিনিস বিবেচ্য ছিল যে, ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে সবকিছু সৃষ্ট হয়েছে। আদিপুস্তকে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বর কথা বলেন আর সবকিছু সৃষ্টি করেন: “আলো হোক”, তাই আলো হল।

ঈশ্বরের বাক্য রূপে যিশুকে স্বর্গ থেকে জগতে প্রেরণ করেছিলেন মানুষকে মুক্তি দিতে এবং পরিত্রাণ দান করতে।

বিশ্বাসমন্ত্র - ৩: এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে দেহধারণ করলেন, এবং মানুষ হলেন।

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

কুমারী মারীয়ার পূর্ণ স্বাধীনতায়, এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবে ঐশবাণী দেহগ্রহণ করলেন। যিশু খ্রিস্ট, তিনি নিজে সৃষ্ট নন, কিন্তু তার মধ্য দিয়েই সমস্ত কিছু সৃষ্ট হল, এবং মানববেশে তিনি ধরায় নেমে আসলেন। সাধু পলের কথায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজেকে নিঃস্ব করলেন এবং দাসের রূপ গ্রহণ করলেন।

যিশুর মানব দেহধারণের সত্যকেই তো আমরা বড়দিনে বা প্রভুর জন্মোৎসবে উদ্‌যাপন করি। এই ঘটনা ইতিহাসে অনন্য। আমাদের ঈশ্বর আমাদের মতো একজন হলেন।

বিশ্বাসমন্ত্র - ৪: পোস্তিয় পিলাতের শাসনকালে আমাদের জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন, মৃত্যু-যাতনাভোগ করলেন ও সমাধিস্থ হলেন;

বিশ্বাসমন্ত্র - ৫: এবং শাব্দ-অনুসারে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করলেন ও

বিশ্বাসমন্ত্র - ৬: স্বর্গে আরোহণ করলেন; পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন;

বিশ্বাসমন্ত্র - ৭: তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে সগৌরবে পুনরাগমন করবেন – তাঁর রাজত্বের শেষ হবে না।

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

উপরোক্ত বিশ্বাসমন্ত্রগুলো (৪-৭) তৃতীয় বিশ্বাসমন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। যিশু মানুষ হলেন যেন মানুষের পরিত্রাণ সাধন করতে পারেন। আমাদেরই জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন। মহাসভার পিতৃগণ “পোস্তিয় পিলাতের শাসনকালে” – এ কথা কেন বললেন? কারণ যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এটা ইতিহাসে ঘটেছে। অতএব যিশু সত্যিই সমাধিস্থ হয়ে তৃতীয় দিবসে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পর, তিনি স্বর্গে রহস্যপূর্ণ ভাবে উত্থিত হলেন, এবং তিনি এখন পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে রাজত্ব করছেন।
আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি মহা গৌরবে পুনরায় আগমন করবেন। এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় আগমন। দ্বিতীয় আগমনের সময় আমাদের সকলার বিচার হবে; আমরা যা করেছি তা সবই উন্মোচিত হবে এবং ন্যায়বিচার সম্পন্ন হবে।
দ্বিতীয় আগমনের সময় পুরাতন পৃথিবী ও পুরাতন স্বর্গের অবসান ঘটবে এবং যিশুর চিরকালীন ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠা হবে।

(গ) পবিত্র আত্মা ঈশ্বরে বিশ্বাস

বিশ্বাসমন্ত্র - ৮ : আমি বিশ্বাস করি প্রভু ও জীবনদায়ী পবিত্র আত্মা,
যিনি পিতা ও পুত্র হতে সম্ভূত,
পিতা ও পুত্রের সাথে সমভাবে আরাধিত ও গৌরবান্বিত;
তিনি প্রবক্তাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন।

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

আমরা ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন পবিত্র আত্মা, যিনি প্রভু ও জীবনদাতা। ঈশ্বর প্রথম আদমের ওপর তিনি প্রাণবায়ু দান করেছিলেন। এই প্রাণবায়ু হচ্ছে পবিত্র আত্মা যিনি প্রাণ দান করেন এবং জীবনকে প্রাণবন্ত রাখেন। তিনি পিতা ও পুত্রের একাত্মতায় প্রীত এবং গৌরবান্বিত। আমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র আত্মা যিশুর মানব দেহধারণের পূর্বে ছিলেন ও পরে আছেন; তিনি প্রবক্তাদের অনুপ্রাণিত করেছেন।

পবিত্র ত্রিত্ব ঈশ্বরের নিগুঢ় রহস্য। জাগতিক কোন বস্তু ও তুলনা এই নিগুঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। পবিত্র ত্রিত্বের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে বাইবেলে বর্ণিত ভক্তবিশ্বাসীর জীবনে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও কাজ।

বিশ্বাসমন্ত্র - ৯ : এক পবিত্র সর্বজনীন ও প্রেরিতিক মণ্ডলীতে আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্বাসমন্ত্র - ১০ : আমি পাপমোচনার্থে এক দীক্ষান্নান স্বীকার করি;

বিশ্বাসমন্ত্র - ১১ : এবং মৃতদের পুনরুত্থান ও

বিশ্বাসমন্ত্র - ১২ : শাস্ত জীবনের প্রত্যাশা করি। আমেন।

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

যিশু খ্রিস্টের মন্ডলী হচ্ছে খ্রিস্টের অতীন্দ্রীয় দেহ। অতএব মণ্ডলী পবিত্র, কেননা খ্রিস্ট পবিত্র, যদিও সমস্ত বিশ্বাসী সর্বদা পবিত্র না-ও হতে পারে; মণ্ডলী এক, কেননা খ্রিস্ট এক; মণ্ডলী কাথলিক কারণ মণ্ডলী “সর্বজনীন”; মণ্ডলী প্রেরিতিক, কেননা খ্রিস্ট প্রেরিতদূতদের ওপর ভিত্তি করে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

খ্রিস্টে বাপ্তাইজিত হয়ে এই মণ্ডলীতে আমরা প্রবেশ করি, আদিপাপ থেকে মুক্ত হয়ে আমরা খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত হই; এভাবে আমরা ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা হয়ে উঠি। আমরা বিশ্বাস করি যে, খ্রিস্ট পুনরায় আগমন করবেন, আমরা তখন মহিমান্বিত হয়ে খ্রিস্টের দেহের সঙ্গে পুনঃসংযুক্ত হব, এ যেন পুনরুত্থিত খ্রিস্টের দেহের অনুরূপ হয়ে ওঠা। আমরা অবশ্য সেই রূপ এখনও জানি না।

আমরা ভাবী জগতের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষমান; স্বর্গীয় দূতবৃন্দের এবং সকল সন্তজনের মতো আমরাও ধন্য হব এবং ঈশ্বরের ভালবাসা ও প্রশংসায় রত থাকব। আমাদের তখন আর কোন বাসনা থাকবে না এবং সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে আমরা মুক্ত হব।

আমেন:

পরিশেষে আমেন...। আমেন কথার অর্থ হচ্ছে “হ্যাঁ”, “তাই হোক” এবং “আমি বিশ্বাস করি”। মানুষ হিসেবে আমাদের এই কথাই হতে পারে সর্বশেষ কথা। ঈশ্বর আমাদের কাছে নিজের পরিচয় এবং আমাদের জন্য তিনি কী করেছেন তা প্রকাশ করেছেন। আর আমাদের আস্থা ও ভরসা এবং আমাদের অন্তরের বিশ্বস্ত সাড়া দান হচ্ছে আমাদের “আমেন”।

উপসংহারে আমাদের চিন্তা ও আলোচনার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন:

- (ক) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র খ্রিস্টানদের জীবনের অর্থাৎ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও বাণীপ্রচারের “পরিচয়পত্র” – এই বিষয়ে আমাদের চিন্তা বা মন্তব্য কী?
- (খ) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র মণ্ডলীর মধ্যে একতা ও খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টার “ভিত্তি” – এ কথাটি নতুন কিছু করার জন্য কী ধরনের আবেদন আমাদের কাছে নিয়ে আসে?
- (গ) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র অনুসারে খ্রিস্টীয় জীবন গড়ে তোলার জন্য আমাদের ভাবনাগুলো কী?

Sources:

1. International Theological Commission, Study Document: *Jesus Christ, Son of God, Saviour – the 1700th anniversary of the Ecumenical Council Nicea (325-2025)*, May 20, 2025, Vatican City.
2. *ক্যাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা*, প্রধান সম্পাদক বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, বাংলাদেশ ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনী, জুবিলী বর্ষ ২০০০।
3. Wikipedia: Article: Purpose of Study Day - Nicene Creed, 2025.
4. Wikipedia: Article: History of Nicene Creed, 2024.
5. Wikipedia: Dr. C. George Boeree, Article: The Early Christian Heresies.

রচনা— ৬: আন্তঃমাতুলিক সম্পর্ক ৪

পোপ ফ্রান্সিসের উদ্যোগসমূহ

প্রথমেই আমি নিজের, খ্রিস্টান সম্প্রদায় ও বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠীর নামে পোপ মহোদয়ের প্রতি আমাদের গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং তাঁর সকল কর্মকীর্তি, আদর্শ ও দৃষ্টান্তের জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ হচ্ছেন একজন ধর্মগুরু। পোপ ফ্রান্সিস কাথলিক তথা খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরুই হয়ে উঠেছিলেন। একযুগ (২০১৩-২০২৫ খ্রি.) ধরে তিনি পোপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শুধু খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু নন। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে ভাটিকান একটি ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘভুক্ত। এ দিক দিয়ে পোপ মহোদয় একজন রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান। এই দায়িত্ব বলে তিনি সকল রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাদের কাছেও মিশনকাজে প্রেরিত।

ক ৥ পোপ ফ্রান্সিসের আন্তঃমাতুলিক (ইকিউমেনিকাল) উদ্যোগসমূহ

পোপ ফ্রান্সিস আন্তঃমাতুলিক সম্পর্ক উন্নয়নে, পূর্বসূরী পোপ বেনেডিক্টের দ্বারা অর্জিত সকল অর্জনের উপর ভিত্তি করে, তারই ধারাবাহিকতায় অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যেমন: বিভিন্ন মন্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে সভা এবং বিভিন্ন চার্চের সঙ্গে সংলাপ করেছেন। ঐক্য ও “সাক্ষাৎ-এর কৃষ্টি” উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় তিনি বড়োই উদ্যোগী ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সব কাথলিক, অর্থডক্স, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের (ডিনোমিনেশন) খ্রিস্টানসারীদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পায়। পোপের নেয়া উদ্যোগসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে তুলে ধরিছি:

- (১) সভা-সাক্ষাৎ ও সংলাপ: পোপ ফ্রান্সিস অর্থডক্স মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে বিশেষভাবে কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়াক বার্থলমিয়ার সাথে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষাৎ করেছেন। একই বছর কিউবাতে রাশিয়ার অর্থডক্স প্যাট্রিয়াক কিরিলের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল যাতে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার হয় এবং উভয়ের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি সম্বন্ধে ঐকমত্য অনুসন্ধান করা হয়। পোপ ফ্রান্সিস লুথেরান মণ্ডলীর সাথে সুইডেনে, ২০১৬ খ্রি. প্রোটেস্ট্যান্ট বিপ্লবের ৫০০ বছরের পূর্তি যৌথভাবে পালন করেছেন এবং লুথেরান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটি সমঝোতার বিবৃতি যৌথভাবে স্বাক্ষরিত হয়। দলিলে প্রকাশ করা হয় যে, এই দুই মন্ডলীর মধ্যে অনৈক্যের চাইতে ঐক্য অনেক বেশী। অ্যাংলিকান মণ্ডলীর সভায় তিনি যোগদান করেছেন এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন অনেকবার। তিনি অ্যাংলিকান মণ্ডলী এবং প্রাচীন কাথলিক মণ্ডলীসমূহের সাথে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আলাচনায় লিপ্ত ছিলেন তাঁর পুরো কার্যকালে। বিশেষ প্রয়োজনে সুদান সফরকালে আর্চবিশপ অব ক্যান্টারবারি তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন।

- (২) **সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনা:** পোপ ফ্রান্সিস খ্রিস্টীয় ঐক্য এবং সমঝোতার জন্য, বিভিন্ন খ্রিস্টান ঐতিহ্যের মন্ডলীর সদস্যদের সাথে সমবেতভাবে প্রার্থনা ও উপাসনার গুরুত্ব অনুভব করে তিনি নিজে তাতে যোগদান করতেন।
- (৩) **“সাক্ষাৎ-এর কৃষ্টি”:** পরস্পরের মধ্যে “সাক্ষাৎ-এর কৃষ্টি” গড়ার জন্য পোপ ফ্রান্সিস নিজেই উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে যায় এবং ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত দলগুলোর মধ্যে যোগসেতু নির্মাণ করা হয়। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দর্শন করা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সংলাপের একটি কার্যকরী পদ্ধতি। পোপ ফ্রান্সিস অন্য ধর্মের এবং অন্য মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে “সাক্ষাৎ-এর কৃষ্টি” গড়ে তুলেছেন।
- (৪) **যৌথ বিবৃতি ও উদ্যোগ:** অন্যান্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন এবং যৌথভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যেন সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন ২০২৫ খ্রি. একসঙ্গে পুনরুত্থান পর্ব পালন করার জন্য প্রাচ্য অর্থডক্স মন্ডলী ও কাথলিক মণ্ডলীর যৌথ ঘোষণাপত্র।
- (৫) **“রোমের বিশপ সম্পর্কে আন্তঃমন্ডলিক আলোচনা”:** পোপের ফ্রান্সিসের সমর্থনে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক পোপের মন্ত্রণালয় থেকে একটি দলিল প্রকাশিত হয়। দলিলের নাম ছিল: “বিশ্বজনীনপত্র *Ut Unum Sint* (তারা যেন এক হয়) অনুসারে রোমের বিশপ: প্রাধান্য ও সিনড-প্রক্রিয়া” বিষয় নিয়ে আন্তঃমন্ডলিক পর্যালোচনা এবং মতামত প্রকাশ করা হয়। আন্তঃমন্ডলিক পর্যালোচনায় পোপের প্রাধান্য সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই দলিলে স্থান পেয়েছে এবং আগামী পুনর্মিলিত মণ্ডলীতে কীভাবে পিতরের ভূমিকা, রোমের বিশপ বা পোপ পালন করতে পারেন তার সম্ভাবনাও যাচাই করা হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে সুপারিশও করা হয়েছে।
- (৬) **“সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী”:** পোপ মহোদয় মণ্ডলীতে সিনড-প্রক্রিয়া বা অপরের কথা শোনা এবং মাণ্ডলিকভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার প্রক্রিয়ার গুরুত্বের ওপর বেশ জোর দিয়েছেন, যার মাধ্যমে ঐক্য অর্জন এবং আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন করা যায়। পোপ ফ্রান্সিস খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, কাথলিক মণ্ডলীর সিনড-প্রক্রিয়া খ্রিস্টীয় ঐক্য আরও ফলপ্রসূ ও বেগবান করবে।

(৭) অনুতাপ ও ক্ষমা: পোপ ফ্রান্সিস কাথলিকদের আহ্বান করেছেন যেন তারা অতীতের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা যাচনা করে এবং তাদেরকে ক্ষমা দান করে যারা অতীতে নির্যাতিত হয়েছেন; এভাবে পুনর্মিলন ও নিরাময় সাধন করা হবে।

(৮) নিসীয় বিশ্বাস মন্ত্র: পোপ ফ্রান্সিস জীবদ্দশায় বাসনা করেছিলেন যে, নিসীয় ইকিউমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি অনুষ্ঠান তিনি অর্থডক্স মন্ডলী ও অন্যান্য মণ্ডলীর সাথে একত্রিত হয়ে পালন করবেন ইরাকের প্রাচীন নিসীয় নগরে (বর্তমানে ইজনিক নামক এলাকায়)। পোপ ফ্রান্সিসের এই পরিকল্পিত ঘটনা আন্তঃমণ্ডলিক সংলাপ ও ঐক্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। নিসীয় ইকিউমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি দলিল ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছেন। শোনা যাচ্ছে যে, হয়তো বর্তমান পোপ চতুর্দশ লিও ২০ মে তারিখে নিসীয় নগরে যাবেন এবং সকল মণ্ডলীর সাথে উদ্‌যাপন করবেন ১৭০০ বছরের বিশ্বাসমন্ত্র।

(৯) যিশুখ্রিস্ট-২০৩৩ (জেসি-২০৩৩): কাথলিক, অর্থডক্স, ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চ, অ্যাভাঞ্জেলিকাল সম্প্রদায়, প্রমুখ কর্তৃক একটি মুভমেন্ট গুরু হয়েছে। প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যিশুর পুনরুত্থানের ২০০০ বর্ষের পূর্তি উদ্‌যাপন করা এবং এই উদ্দেশ্যে একসঙ্গে ইকিউমেনিকাল মহাযাত্রার আহ্বান জানানো হয়েছে। উদ্যোগের মূলবাণী হচ্ছে: “আমাদের পরিচয় খ্রিস্ট, কোন সম্প্রদায় নয়।” এই উদ্যোগকে পোপ ফ্রান্সিস স্বাগতম ও সমর্থন জানিয়েছেন।

খ ॥ নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র: আন্তঃমণ্ডলিক সম্পর্কের ভিত্তি

নিসীয় ইকিউমেনিকাল ("oikoumene") মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে। উক্ত সভায় বিশ্বজনীন বিশ্বাসমন্ত্র সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। ইকিউমেনিকাল মহাসভা কাথলিক মণ্ডলীতে, পোপের সভাপতিত্বে, বিশ্বের সকল বিশপদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত ইকিউমেনিকাল বা সর্বজনীন মহাসভা ঐশ্বাবাণীর আলোকে ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা এবং মণ্ডলীর শৃঙ্খলা বিষয়ে যে-শিক্ষা দান করে তা মণ্ডলীতে যুগযুগ ধরে শিক্ষা-পরম্পরা হয়ে চলমান থাকে। নিসীয় মহাসভা তেমনই একটি মহাসভা যা বিশ্বাসের বিষয়ে শিক্ষা-পরম্পরার প্রধান কর্তৃপক্ষ হয়ে উঠেছে।

নিসীয় মহাসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বক্ষেণে প্রচলিত ছিল এরীয় ভ্রান্ত মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে যিশু শুধু মানুষ ছিলেন। এর বিরুদ্ধে নিসীয় মহাসভা যিশুর ঈশ্বরত্বকে খ্রিস্টবিশ্বাসের স্বীকারোক্তি হিসেবে স্থির করেছে।

নিসীয় মহাসভার বার্ষিকী উপলক্ষে পোপের “আন্তর্জাতিক ঐশতাত্ত্বিক কমিশন” একটি দলিল প্রকাশ করেছে। দলিলটির নাম: “যিশু খ্রিস্ট, ঈশ্বরের পুত্র, ত্রাণকর্তা: মণ্ডলীর নিসীয় ইকিউমেনিকাল মহাসভার ১৭০০ বছর পূর্তি”। পোপ ফ্রান্সিস এই দলিলটিকে অনুমোদন করেছেন।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র হচ্ছে খ্রিস্ট সম্বন্ধে মণ্ডলীর বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকারোক্তি। পবিত্র ত্রিত্ব এবং যিশুর ঈশ্বরত্বের উপর বিশ্বাস সম্বলিত খ্রিস্টবিশ্বাসমন্ত্র আমাদের বিশ্বাসের “পরিচয়পত্র” বলে বিবেচিত। বিশ্বাসমন্ত্র শুধুমাত্র কয়েকটি ধর্মনীতির তালিকা নয়; বরং এখানে প্রকাশিত হয়েছে ঈশ্বরের ভালবাসা এবং তাঁর পরিত্রাণের উপহার।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সমস্ত খ্রিস্টান মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যের চিহ্ন। এ বছর কাথলিক ও অর্থডক্স মণ্ডলী ও অন্যান্য মণ্ডলী একই দিনে পুনরুত্থান উৎসব পালন করেছে। নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। পোপ মহোদয় বাসনা করেছেন যে, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা বিভিন্ন মণ্ডলীকে একত্রিত করবে এবং কাথলিক বিশ্বাসীবর্গকে অনুপ্রাণিত করবে সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সম্পর্কে রচিত দলিলটি কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে: (১) বাণী-প্রচারের জন্য নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র অপরিহার্য, (২) খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অন্যের সাথে সহভাগিতার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। (৩) সাম্প্রতিক সামাজিক ও কৃষ্টিগত পরিবর্তনের সময় বিশ্বাসের যথোপযুক্ততা ব্যক্ত করবে। (৪) উপরন্তু বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে সকল বিচ্ছিন্নতার মাঝে বিশ্বাসের ঐক্য বা খ্রিস্টীয় ঐক্য অর্জনে গতি সঞ্চারণ করবে। (৫) পরিশেষে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র প্রাচ্য ও পশ্চাত্য মণ্ডলীর মধ্যে সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করবে, যেমনটি হয়েছিল পুনরুত্থান উৎসব পালন করার সময়।

পোপ ফ্রান্সিস পুণ্যবর্ষ ঘোষণার পূর্ব থেকেই ২০২৫-জুবিলীর সাথে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের ১৭০০ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন সংযুক্ত করেছেন। তিনি আশা করেছেন যে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের পূর্তি অর্থপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হবে এবং মণ্ডলীতে ঐক্য প্রচেষ্টার একটি দৃঢ় ভিত্তি লাভ করবে এবং বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় আশার প্রতীক হিসেবে এই ঘটনাটি বিবেচিত হবে।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের বার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং সেই উপলক্ষে প্রকাশিত দলিলটি খ্রিস্টীয় ঐক্য স্থাপনে এবং চার্চের মিশনকে আরও জোরদার করবে। নিসীয় সম্মেলন এবং চার্চের চলমান সিনড-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত কারণ এই প্রক্রিয়া “একসঙ্গে চলার” গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই গুরুত্ব মঙ্গলসমাচার অনুসারে জীবনযাপন করার প্রতি একনিষ্ঠতার আহ্বান।

আন্তর্জাতিক ঐশতত্ত্ব বিষয়ক কমিশন আগামী মে ২০, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে দলিলটির ওপর একটি অধ্যয়ন দিবস আয়োজন করেছে। দিবসটি রোমে পন্টিফিকাল উরবানিয়ানা নামক

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এখানে অনেক ঐশত্ববিদ ও বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থেকে দলিলটির বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পরিশেষে মন্ডলীর আদি পিতৃগণের একটি কথা উল্লেখ করে শেষ করতে চাই:
“আমরা যেভাবে দীক্ষিত সেভাবে আমরা বিশ্বাস করি; এবং আমরা যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে আমরা প্রার্থনা করি।” সুতরাং খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য অপরিহার্য: পবিত্র ত্রিত্বের নামে দীক্ষাস্নান, বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং প্রার্থনা।

সংযুক্তি: নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র

এক পরমেশ্বর, সর্বশক্তিমান পিতা,
স্বর্গ ও মর্ত এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য বিশ্বমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা আমি বিশ্বাস করি।

আমি বিশ্বাস করি এক প্রভু যিশু খ্রিস্টে,
যিনি পরমেশ্বরের একমাত্র-জাত, এবং সর্বযুগের পূর্বে পিতা হতে জনিত।
পরমেশ্বর হতে পরমেশ্বর, জ্যোতি থেকে জ্যোতি, সত্যেশ্বর হতে সত্যেশ্বর।
তিনি জাত, সৃষ্ট নন, পিতার সঙ্গে অভিন্ন-স্বরূপ; তাঁর দ্বারা সমস্তই হল সৃষ্ট।
আমাদের মানবকুলের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে
স্বর্গ থেকে তিনি অবরোহন করলেন,
এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে দেহধারণ করলেন, এবং মানুষ হলেন।

পোস্তিয় পিলাতের শাসনকালে আমাদের জন্য তিনি ক্রুশাবদ্ধ হলেন,
মৃত্যু-যাতনাভোগ করলেন ও সমাধিস্থ হলেন;
এবং শাস্ত্র-অনুসারে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করলেন ও স্বর্গে আরোহন করলেন;
পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন;
তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে সগৌরবে পুনরাগমন করবেন – তাঁর রাজত্বের শেষ হবে না।

আমি বিশ্বাস করি প্রভু ও জীবনদায়ী পবিত্র আত্মায়,
যিনি পিতা ও পুত্র হতে সম্ভূত,
পিতা ও পুত্রের সাথে সমভাবে আরাধিত ও গৌরবান্বিত;
তিনি প্রবক্তাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন।
এক পবিত্র সার্বজনীন ও প্রেরিতিক মণ্ডলীতে আমি বিশ্বাস করি।
আমি পাপমোচনার্থে এক দীক্ষাস্নান স্বীকার করি;
এবং মৃতদের পুনরুত্থান ও শাস্ত্র জীবনের প্রত্যাশা করি। আমেন।

Sources

1. By Martin Bürger Top ecumenical initiatives of Pope Francis: a retrospective
Munich, Germany, Apr 24, 2025 / 14:31 pm
2. By Kristina Millare, Vatican releases document to mark 1,700th anniversary of First Council
Vatican City, Apr 3, 2025 / 13:00 pm
3. Vatican News:
The Nicene Creed: an expression of Christian identity
Pope Francis: Restoration of Christian unity is 'an urgent priority in today's world.

চতুর্থ ভাগ: বাংলাদেশ স্মৃতিয় মণ্ডলীতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

রচনা- ১: বাংলাদেশ মণ্ডলীর পালকীয় পরিকল্পনা ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: অতীত ও বর্তমান

(১) বাংলাদেশ মণ্ডলীর অপ্রকাশিত পরিকল্পনা ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ (১৯৭১-১৯৮৪)

ক) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার প্রেরণা:

- দলিল: “অন্য ধর্মসমূহের সঙ্গে মণ্ডলীর সম্পর্ক” বিষয়ক ঘোষণাপত্র (Nostra Aetate – 28/10/1965)
 - মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে একতা ও ভালবাসা লালন করার জন্য মণ্ডলীর দায়িত্ববোধ
 - সব মানুষ মিলে একটি সমাজ: ঈশ্বর থেকে: মানুষের আগমন, তত্ত্বাবধান, একই গন্তব্যে যাত্রা।
 - সকল মানুষের প্রশ্ন: মানুষ কে? অর্থ ও উদ্দেশ্য কী, পাপ-পুণ্য কী, কষ্টের অর্থ কী, সুখ কোথায়? মৃত্যু কালে, মৃত্যুর পর কী হয়? পুরস্কার বা শাস্তি আছে? – এক কথায় জীবনের রহস্য।
 - “পরোপকারের” প্রতি সব মানুষের অদম্য বাসনা আছে।
 - যাকিছু সত্য ও পবিত্র মণ্ডলী তা শ্রদ্ধা করে, বর্জন করে না।
 - মণ্ডলী সবার সাথে আলোচনা ও সহযোগিতা করেন; খ্রিস্টানদের সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করে।
 - লক্ষ্য: বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব।
- মণ্ডলীর নবায়ন ও স্থানীয় মণ্ডলীর উদ্ভাবন
- বাংলাদেশের স্থানীয় বিশপদের অভিনব ও ব্যতিক্রমধর্মী সাম্প্রদায়িকতা – অন্য ধর্ম ও মণ্ডলীর বাড়িতে রাত কাটানো (১৯৭৭)

খ) প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্টির দুর্যোগ ও বিপর্যয় ১৯৭০-১৯৭৬

- জলোচ্ছ্বাস (১৯৭০): জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে সংকীর্ণতা ও মণ্ডলীর কার্যপরিধির সীমানা/প্রাচীর; আক্রান্ত মানুষের সাথে সংলাপ।
- স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৯৭১): যারা ছিল পর তার হল আপন; যারা ছিল শত্রু তারা হল মিত্র; দেশ ও জাতির সাথে একাত্মতা দূর করেছে মণ্ডলীর বিদেশী পরিচয়; বাংলাদেশ সবার সাথে খ্রিস্টানদেরও দেশ; সংলাপের ভিত্তি কৃষ্টি ও সংস্কৃতি।

- যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশ ও জাতির বিনির্মাণে মণ্ডলী (১৯৭১-১৯৭৫): আত্মগণ্ডী থেকে বহির্মুখী মণ্ডলী: ত্রাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে সংলাপ।
- বাংলাদেশ মণ্ডলীর আপন পরিচয় নিয়ে পালকীয় ভাবনা (১৯৭৬-১৯৮৪): চেতনা, নবায়ন, অভ্যন্তরীণ সংগঠন ও বহির্মুখী সেবার কার্যক্রম সম্পর্কে ভাবনা; অনিশ্চয়তা ও নিশ্চয়তা, ছেড়ে-দেয়া ও ধরে-রাখার সংগ্রাম এবং ভবিষ্যতের আহ্বান।

(২) বাংলাদেশ মণ্ডলীর প্রথম পালকীয় পরিকল্পনা ও আন্তর্ধর্মীয় সংলাপ (১৯৮৫)

- বাংলাদেশ পালকীয় পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য: মিলন ও মিলনসমাজ গড়ে তোলা
- বাংলাদেশ পালকীয় অগ্রাধিকার
 - (১) ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মানসে মানুষের দুঃখ ও দুর্দশা নিরাময় করা
 - (২) মিলন ও মিলনসমাজ প্রতিষ্ঠা করা: অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে, অন্য মণ্ডলীর ভক্তদের সঙ্গে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
 - (৩) মণ্ডলীর অভ্যন্তরে সহভাগিতা/মিলন ও মিলনসমাজ: যাজকমণ্ডলী, সন্ন্যাসব্রতী মণ্ডলী ও জনমণ্ডলীর মধ্যে জীবন ও কাজের মিলন ও একাত্মতা।
 - (৪) সংস্কৃতায়ন: কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠা করা; সকল জাতি ও কৃষ্টির মানুষের কাছে মঙ্গলসমাচার, অর্থাৎ খ্রিস্টধর্মকে ঘোষণা করা।
 - (৫) গঠন: খ্রিস্টধর্মের শিষ্যত্বে গঠন, মঙ্গলসমাচারের বর্ণিত সুখী/দুখী হওয়ার বাণী (অষ্টকল্যাণ বাণী) অনুসারে।

(৩) পালকীয় সংলাপ বিষয়ক জাতীয় কর্মশালার চূড়ান্ত বিবৃতি - ১৯৯৬ খ্রি. (বরিশাল)

- বাংলাদেশ ছয়টি মিশনকর্মে বাংলাদেশ প্রেরিত
- অন্য মণ্ডলী এবং অন্য ধর্ম ও কৃষ্টির ভাইবোনদের মাঝে সংলাপে ও বাণীপ্রচারে ব্রতী হতে আমরা প্রেরিত।

(৪) নতুন সহস্রাব্দের নবচেতনায় খ্রিস্টীয় জীবন ও সেবার গভীরে যাত্রা - ২০০১ খ্রি. (ময়মনসিংহ)

- প্রধান লক্ষ্য: বাংলাদেশে বৃহত্তর সমাজে মিলনের কৃষ্টি গঠন
- “ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের মধ্যে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অঙ্গণে, পুরুষ ও নারীর সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়, সমাজ ও শিশু-কিশোর-যুবাদের মধ্যে, এবং প্রযুক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে মিলন ও একাত্মতা:

(৫) বাংলাদেশ মণ্ডলীর ত্রিবার্ষিক পালকীয় পরিকল্পনা – ২০১১-২০১৩ খ্রি.

- প্রধান লক্ষ্য: নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়া – তৃণমূলে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয়/মানবিক সমাজ
- ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনা: বৃহত্তর অথচ মৌলিক বিষয়ে সর্বজনের সংলাপ
প্রথম বর্ষ: ধর্মীয় ও কৃষ্টিয় মূল ধারা: সৃষ্টি, কৃষ্টি ও ধর্ম
– ভূপ্রকৃতি, মানুষের কৃষ্টি, সংস্কৃতির প্রধান মূল্যবোধসমূহ
দ্বিতীয় বর্ষ: ব্যক্তি ও সমাজের মূলধারা: ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র সমাজের প্রতি গুরুত্ব।
তৃতীয় বর্ষ: সেবাকারী মণ্ডলী হওয়ার পরিপক্বতা – প্রেমপূর্ণ সেবা।

(৬) আনন্দময় মঙ্গলসমাচার – ২০১৩-২০২০ খ্রি.

- প্রধান বিষয়সমূহ: খ্রিস্টবিশ্বাস, মঙ্গলবার্তা ঘোষণা, পরিবারে ভালবাসা, প্রকৃতি প্রেম, ঐশদয়া, পবিত্রতা, “মানবিক ভ্রাতৃত্ব”।
উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে সব মানুষের সাথে সংলাপ – সংলাপের ব্যাপকতা।
স্থানীয় মণ্ডলীতে (ধর্মপ্রদেশে) বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ।
- পোপের দলিলসমূহ: “বিশ্বাসের আলো” (২০১৩); আনন্দময় মঙ্গলবার্তা (২০১৩); “প্রভুর প্রশংসা হোক” (২০১৫); “ভালবাসার আনন্দ” (২০১৬); “দুঃখীদের প্রতি দয়া” (২০১৬); “আনন্দ করো – উল্লসিত হও” (২০১৮); “সকলে ভাইবোন” (২০২০)

(৭) খ্রিস্টমণ্ডলী মিলনসমাজ: বাংলাদেশ মণ্ডলীর সাক্ষ্যদান (২০১৮ খ্রি.)

- আগামী দশকের জন্য স্থানীয় মণ্ডলীর ১১ টি অগ্রাধিকারসমূহ
- মঙ্গলবাণী ঘোষণা; ভালবাসা ও সেবাকাজ; বিবাহ ও পরিবার; মৌলিক খ্রিস্টীয় সমাজ; পবিত্র আত্মার দান: বহু ও এক এবং কর্তৃপক্ষ ও আত্মিক শক্তি; আধুনিক জগতে ও কালে পবিত্র হওয়ার আহ্বান; অভিবাসন ও শরণার্থী; শিক্ষা ও গঠনের লক্ষ্য: মানবিক ভ্রাতৃত্ব; শিশুদের অধিকার; সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষা ও যত্ন; গণমাধ্যম।

(৮) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী: সবার সাথে একসঙ্গে পথচলা (২০২১-২০২৪)

- সিনোডাল চার্চ: সকল ধর্মের মানুষের সাথে একসঙ্গে পথচলা সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য
- পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষা: সববিষয়ে সর্ব ধর্ম, কৃষ্টি ও মণ্ডলীর সাথে একসঙ্গে পথচলা

(৯) মহান জুবিলী: ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ – পুণ্যবর্ষ: “আশার তীর্থযাত্রী আমরা”)

- আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য উদ্‌যাপন: নিসীয়া মহাসভা (৩২৫ খ্রি.): নিসীয়া বিশ্বাসমন্ত্র (১৭০০ বর্ষপূর্তি)
- আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সম্ভাব্য কার্যক্রম: বিশ্বজনীন ও স্থানীয় মণ্ডলীতে
.....

রচনা- ২: আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আধ্যাত্মিকতা

(১) আধ্যাত্মিকতা বলতে কী বুঝি?

সহজ কথায়: আমাদের জীবনাবস্থা ও কর্মকাণ্ডে যিশুকে অনুসরণ করাই হচ্ছে খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা: ব্যাখ্যা করলে:

- **শিষ্যত্বের আহ্বান** – “আমাকে অনুসরণ কর”
পিতার ইচ্ছা পালনে –
যিশুর আদেশ পালনে: ঈশ্বরকে ভালবাস এবং প্রতিবেশীকে ভালবাস
আদর্শ যিশু: আমি যেমন পিতাকে ভালবেসেছি, তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছি
আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি – একাত্মতা ও জীবন সমর্পণ
“তোমার আপন ক্রুশ বহন করে আমার অনুগামী হও”
- **শিষ্যত্বের মিশনের জন্য প্রেরণ** – “যাও, মঙ্গলবার্তা ঘোষণা কর”
ঐশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মঙ্গলবাণী ঘোষণা

(২) আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: ঐশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ

- **মিলন ও ভ্রাতৃত্বের ঐশ্বরাজ্য:** ন্যায্যতা ও শান্তির রাজ্য; একাত্মতা, “ভাইবোন” – জীবনের-সংলাপ।
- **সহবোধ ও সহকর্মের ঐশ্বরাজ্য:** একসাথে, সম্মিলিতভাবে কাজ করা, কাজে সহকর্মী, সহযোগী ও সহভাগী; কর্মভিত্তিক সংলাপ।
- **সত্যের ঐশ্বরাজ্য:** সত্যের স্বাক্ষর, জ্ঞান-অর্জন ও অজ্ঞতা-বর্জন, সর্বের কল্যাণবোধ, গণমঙ্গলবোধ; সৃষ্টি ও প্রকৃতিবোধ; বৌদ্ধিক সংলাপ।
- **আধ্যাত্মিকতার ঐশ্বরাজ্য:** ধর্মের উর্ধ্বে আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা; আত্মিক অনুশীলন ও আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি; আধ্যাত্মিক সংলাপ
- **ঐশ্বরাজ্যের আধ্যাত্মিক নিদর্শন:** সাক্ষাৎ ও দর্শনের ঐশ্বরাজ্য: আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে সাক্ষাৎ ও দর্শন; সম্পর্ক ও সমঝোতা দৃশ্যমান করা; ধর্মীয় নেতৃত্বের সংলাপ।

(৩) পোপ ফ্রান্সিসের দৃষ্টান্ত:

- যিশুর অনুসারী এবং মঙ্গলবার্তার অনুসারী
- সকল ধরনের মানুষের সাথে তার ঐশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজকর্ম
- জাগতিক বিষয়ে আধ্যাত্মিক ব্যক্তির সংলাপ: হত-দরিদ্র মানুষের সাথে সাক্ষাৎ, ছোট ও ক্ষুদ্রদের সাথে সাক্ষাৎ; বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, সরকার প্রধান, পেশাজীবী, বানিজ্য ও ব্যবসায়ী জাতি, সৃষ্টি ও প্রকৃতি, কৃষ্টি ও ধর্মের লোক এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের সাথে সংলাপ।
- “এক সঙ্গে পথ চলা” – “ভাইবোন” সকলার সাথে একসঙ্গে পথচলা: ধর্ম, মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের সাথে একসঙ্গে পথচলা।
- যিশুর দৃশ্যমান সাক্ষী: পোপ মহোদয়ের জীবনটা খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন।

কবিতা- ৬: PROMOTING A CULTURE OF HARMONY

CULURAL PERSPECTIVE OF HARMONY IN BANGLADESH

His Eminence Cardinal Jean-Louis Tauran, the-then Prefect of the Pontifical Council on Inter-Religious Dialogue visited Bangladesh in April 2011 and spent one week to promote inter-religious harmony, praising the country as model saying: “Bangladesh is the best example of Religious Harmony.”

This observation of His Eminence was based on the fact that Bangladesh is multi-ethnic, multi-religious country where people of different religions and cultural groups have lived together for generations, creating a shared cultural and social heritage. Other key aspects of harmony are: shared cultural identity; inter-faith celebrations, Constitutional foundation, historical reinforcement in 1971 Liberation War, occasional instances of communal violence often linked to political motivations and external influences, Government vigilance to protect human rights of the minorities, etc. The Key values of the Cultural harmony are: Peaceful Co-existence, Mutual Respect, Understanding and Empathy, Integration and Unity, Cooperation and Collaboration, Valuing Unity in Diversity.

Recently, many people are raising the question, how much of such harmony we have been experiencing during the last decade or so? Is there continuity of such treasure of harmony in our cultural tradition?

At the backdrop of the cultural harmony and tensions in the country, our speakers have shared their opinions from their own religious perspective, namely Islamic, Hindu, Buddhist and Christian, highlighting some fundamental aspects.

ISLAMIC PERSPECTIVE OF HARMONY (Prof. Dr. Muhammad Elius)

God, the Creator, is the foundation and source of all harmony, to whom human being relates individually as well as in community living the bond of brotherhood. Plurality of religions is in God's plan and design, and hence people must "live in love, sympathy, cooperation and mutual understanding with the people of other religions"

Some verses in Qur'an may seem contradicting the idea of harmony. In that case the text should be understood in the context in which it is said. With holistic approach and in the totality of the Qur'anic teachings, harmony should be searched and discovered. For inter-faith harmony, the Prophet (PBUH), made many treaties and contracts with the people of other religions with objectives of peace, harmony and brotherhood.

HINDU PERSPECTIVE OF HARMONY (Dr. Milton Kumar Dev)

Who is man? Human beings are not aware of their own nature. Man has to know who he is. Hindu Scripture says man is a being in whose body and soul God lives. The greatest glory of humankind is the faith in God.

The most of the People of the world belong to one religion or the other. But these Religious people have not played its true role, they have been silent for long time. Hence we see all evils, wars and conflicts. According to Ramkrishna and Vivekananda, religions are different paths leading to the same goal and all religions are true, This idea should inspire to have inter-faith dialogue, harmony and peace. Hatred brings violence and violence brings destructions. Non-violence is the way to brotherhood, harmony and peace.

BUDDHIST PERSPECTIVE OF HARMONY (Dr. Shantu Barua)

Brotherhood has been recognized as an ethical value implying cultivation of sincere and affectionate relationships with individuals. According to the teachings of Buddha, Brotherhood is a liberating force directing towards the cultivation of universal loving-kindness and compassion. The foundation of universal brotherhood are the four *Brahmaviharas*: Loving-Kindness (*metta*),

compassion (*Karuna*), Sympathetic Joy (*Mudita*), and Equanimity (*Upekkha*)

Metta, loving-kindness occupies a central position in Brahma Vihars. Buddha himself practiced this virtue in relation to all people, family and friends as well as enemies and adversaries. Metta begins from himself and extends to other relations. Metta is a cultivation of inner peace and freedom from anger which is the greatest enemy of human beings, because anger breeds hatred, hostilities, restlessness, violence, discrimination, etc. Loving-kindness brings forgiveness, generosity, non-violence, compassion, humility and patience and thereby promote culture of brotherhood and harmony.

CHRISTIAN PERSPECTIVE OF HARMONY

In order to Promote a Culture of Harmony, three speakers have spoken from their own religious perspective. If we try to capture the main thoughts of the respectable speakers without quoting anyone, I humbly dare to present the following as Christian global perspective summing up the highlights of their perspectives presented.

1. Ultimately the main focus and center of the discussion has been on Human Person with his/her dignity and rights who are understood as architect of culture of harmony.
2. In the present complexities of the world human being does not know who he is, what is his nature? It is a philosophic and anthropological question. Human beings are considered as relational beings. A Human person is a relational being, has fourfold relations: (a) relation with other individual human persons, (b) relation with groups and community (c) relation with the Creation (both God-created and man-created world), (d) relation with God or the Supreme Being. A Human person, although born as human being, he/she becomes human, an ethical or moral person in his/her fourfold relations. Hence when we talk about promoting a culture of harmony, we conceive a holistic and integrated harmony of four-fold relational dimensions of human person.

3. To answer the philosophic and anthropological question, Religion comes with Religious beliefs, as “soul” of Culture and then reflection becomes theological as well as anthropological which try to understand human beings as Religious Being, freeing from fragmented and dis-integrated understanding in the concept of secularization. For too long religion has been silent, word is to be spoken and thus come dialogue, inter-religious dialogue. From the religious perspective, God is the Creator, created human being as male and female who are Images of God. This is foundational harmony between male and female, between human being and God.
4. God is One. He is Creator of all Creation, He is the Protector and He is the Redeemer of the fallen humanity. Cultural and Religious Harmony originates in the unicity of God. Our belief in one God, is the foundation of all our efforts for promoting harmony.
5. God has created the World, as “Common Home” (cfr. *Laudato si*) which has to be loved and taken care of. God has created Human Being as Family where all members are brothers and sisters, *Fratelli tutti*. Harmony of earth and harmony of humankind rests on the understanding of God’s creation as “Common Home” and Humankind as “Brothers-Sisters”.
6. For promotion and protection of a culture of harmony, inter-religious dialogue recently has given birth of a new concept of “Fraternal Humanity” or “Human Fraternity” on which we see certain consensus as goal of inter-religious dialogue as well as for education of the future generation.
7. It is also heartening to see a development of “Agreement”, “Treaty” “Pact” signed between inter-religious groups

পঞ্চম ভাগ: জুবিলীবর্ষ - ২০২৬ : পুণ্যবর্ষ

রচনা-১: “আশার তীর্থযাত্রী আমরা”

২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ: মণ্ডলীর জুবিলীবর্ষ ও পুণ্যবর্ষ

॥ ক ॥ জুবিলীবর্ষ ও পুণ্যবর্ষের মঙ্গলবাণীর প্রেরণা: “আশা আমাদের ছলনা করে না”

বিগত ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ৯ মে, পোপ মহোদয় ২০২৫ খ্রিস্টাব্দকে জুবিলী বর্ষ এবং পুণ্য বর্ষ বলে জারি করেছেন। এটি ৩১তম জুবিলী। ঘোষণাপত্রটির শিরোনাম: “আশা আমাদের ছলনা করে না” কারণ এই আশা ঈশ্বরের ভালবাসার নিশ্চয়তা দান করে (রোমীয় ৫:৫)।

পোপ মহোদয়ের একান্ত বাসনা যে, পুণ্যবর্ষ অনেকের আশা নবায়ন করার সুযোগ দান করবে। জুবিলী সবার জন্য বিশ্বের মানুষের কাছে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। জুবিলীর আবেদন মণ্ডলীর সীমানা পেরিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে কেননা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আশা থাকে। আমাদের জীবনটা যদি সুখ-দুঃখ, পরীক্ষা ও বাধা দিয়ে ভরা থাকে, আর আশা সকল যাতনা নিঃশেষ করে ফেলে দিতে পারে, তা হলে সাধু পল, যেমন অবাক করে আমাদের বলে: “আমরা তো আমাদের দুঃখ-দুর্ভোগ নিয়েও গর্ব করে থাকি; কেননা আমরা জানি যে, দুঃখ-দুর্ভোগ থেকে জাগে নিষ্ঠা আর নিষ্ঠা থেকে চারিত্রিক যোগ্যতা; আর চারিত্রিক যোগ্যতা থেকে অন্তরে জেগে ওঠে আশা। আর এই আশা তো কখনো ছলনা করে না; কেননা স্বয়ং পবিত্র আত্মা যিনি -- আমাদের কাছে ঐশদান যিনি -- তিনি আমাদের হৃদয় পরমেশ্বরের ভালবাসায় পরিপ্লুত করেছেন।” রোমীয় ৫:৩-৪

॥ খ ॥ বাস্তবজীবনে আমাদের আশা :

- কেন আশার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে?
- আমাদের জীবনে আশার অভাব অনুভব হয়? কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আশা হারিয়ে ফেলছি?
- কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আশা প্রকাশ করি?
- তীর্থযাত্রা: কী আশা করি? অতীতে কেন যাই?

(১) আসছে জুবিলী বর্ষের জন্য আমাদের আশা কী? খ্রিস্টমণ্ডলীতে জুবিলী সব সময়ই জনগণের একটি ঘটনা বলে পরিচিত। পোপ অষ্টম বনিফাস ১৩০০ খ্রিস্টবর্ষকে পুণ্যবর্ষ হিসেবে প্রথমবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা এসেছে রোমীয় জনগণের চাহিদা থেকে। জনগণ চেয়েছিল পাপের পূর্ণ ক্ষমা, ঈশ্বরের দয়া এবং “পাপের পূর্ণ দণ্ডমোচন”। পরবর্তীতে ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পোপ দ্বিতীয় পলের সময় পর্যন্ত প্রত্যেক ২৫ বছর অন্তর অন্তর “পুণ্য দ্বার” উন্মোচন এবং পিতর ও পলের সমাধিতে তীর্থ করার ব্যবস্থা রোমে প্রচলিত হয়েছিল।

(২) ঐতিহাসিক ভিত্তি কোথায়? বাইবেলে লেবীয় পুস্তকে বিবরণ রয়েছে: দাসপ্রথা থেকে মুক্তি, কারাবন্দীদের মুক্তি, ঋণ মওকুফ করা হয়, ঈশ্বরের করুণা প্রদর্শন করা হয়। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৮ম বনিফাস প্রথমবার জুবিলী অনুষ্ঠিত হয়। ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দে ৫০ থেকে ২৫ বছরে পরিবর্তন করা হয়।

(৩) আধুনিক জগতে এর অর্থ কী? বর্তমানকালের পরিস্থিতিতে আগামী ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জুবিলী হবে সমগ্র মণ্ডলীর জন্য পালকীয় একটি বিশেষ অনুগ্রহের মুহূর্ত যখন খ্রিস্টবিশ্বাসী জনগণ তাদের বিশ্বাস, লোকভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের এক সুবর্ণ সুযোগ পাবে। অবশ্যই এই জুবিলী হতে হবে সঠিক ধর্মশিক্ষার আলোকে।

সাম্প্রতিক জগতের অবস্থা সর্বক্ষেত্রে যদিও শুভ নয় তথাপি এ অবস্থা তীর্থের পরিপন্থী নয়, কেননা তীর্থ সবসময় আশা জাগ্রত করে। বর্তমান কালের সকল নেতিবাচক পরিস্থিতিতে একমাত্র আশা পারে সকল অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে। এই প্রসঙ্গে প্রবক্তা ইসাইয়ার কথা স্মরণ করতে পারি: “সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিদ্রাণ, আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না; কারণ প্রভুই আমার বল ও শক্তি, তিনি হলেন আমার পরিদ্রাণ” (১২:২)।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই প্রসঙ্গে বলেন: “জুবিলী সবসময়ই এমন একটি ঘটনা যা মণ্ডলীর জন্য আধ্যাত্মিক, মাণ্ডলিক এবং সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। জুবিলীর আধ্যাত্মিক দিক, যা আমাদেরকে মন পরিবর্তন করতে আহ্বান জানায়, তা যেন আমাদের সামাজিক জীবনের মৌলিক দিকগুলো সম্পৃক্ত হয়ে জীবনের সামগ্রিকতার অঙ্গভূক্ত হয়। যে-জগত ঈশ্বর আমাদের হাতে চাষাবাদ ও রক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেখানে আমরা যেন সবাই তীর্থযাত্রী রূপে উপলব্ধি করি; আমাদের যাত্রাপথে সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং এই পৃথিবী যে আমাদের সবার অভিন্ন বসতবাটি – এই কথা ধ্যান করতে আমরা যেন কোনদিনও ভুলে না যাই।”

যুগ যুগ ধরে প্রভুর ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, পরিবার ও শত্রুপক্ষদের মধ্যে মৈত্রীভাব স্থাপন করা হয়, যিশুর দিকে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ও ঐশ করুণার দ্বারা অন্তর উন্মুক্ত করা হয়।

জুবিলী বর্ষে মাণ্ডলিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কী দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় যা স্থায়ী ভাবে আমাদের মধ্যে থাকবে।

(৩) পূর্ণ দণ্ডমোচন লাভ: মণ্ডলীতে অনেক দিনের ঐতিহ্য। জুবিলী বর্ষ পাপের পূর্ণ দণ্ডমোচন পাওয়া যায়। অপব্যাত্ম্য বা সঠিক ব্যাত্ম্য সব সময় হয় না। পাপ থেকে পাপস্বীকারের মাধ্যমে পাপের ক্ষমা লাভ করা হয়। কিন্তু পাপ ঈশ্বরের সাথে এবং মানুষের মধ্যে যে ক্ষত বা প্রভাব সৃষ্টি হয়, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় যাতে সাময়িক ভাবে শান্তি বা দণ্ড লাভ করে জীবনকে আরও সুন্দর করতে, নিরাময় করতে বিশেষ করে কষ্ট-যাতনা ভোগ করে, প্রার্থনা ও দয়ার কাজ করে দণ্ড থেকে মুক্তি পেতে পারে।

(৪) পূর্ণ দণ্ডমোচন লাভের জন্য করণীয়: জুবিলীর সময়ে যে দণ্ডমোচন দেয়া হবে তা লাভ করতে হলে তীর্থের সময়: (১) নির্ধারিত পুণ্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করা, (২) খ্রিস্টযাগ অর্পন করা, (৩) পাপস্বীকার করা; (৪) পাপের প্রতি আসক্তি বর্জন করা (৫) পোপ মহোদয়ের উদ্দেশ্যে প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনা ও ত্রিত্বের জয় বলে প্রার্থনা করা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যথার্থই সমীচীন যে, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষটি হবে ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিসীয় মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি। এই স্মরক-অনুষ্ঠান আন্তঃমণ্ডলিক একটি ভাব দেবে, কেননা এই মহাসভাটি খ্রিস্টতত্ত্ব বিষয়ক বিশ্বাসমন্ত্র মণ্ডলীতে প্রথমবারের মতো চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল যা আজ পর্যন্ত সর্বখ্রিস্টবিশ্বাসীদের ঐক্যের চিহ্ন হয়ে আছে। জুবিলী বর্ষে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করবে।

২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ: রোম নগরীতে বিভিন্ন দল বা শ্রেণির জন্য তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। তীর্থযাত্রা শুধু রোমে অনুষ্ঠিত হবে তা নয়। প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলী, তার আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসারে, নিজস্ব ভাষা ও প্রতীক-চিহ্নের মাধ্যমে জনগণ প্রকাশ করবে তাদের খ্রিস্টবিশ্বাস, তারা সাক্ষ্যদান করবে এবং উৎসব-উদ্‌যাপন করবে।

চরচর-৩: পরিবরের জুবিলী উদযাপন :

জুবিলী বর্ষে পরিবারিক জীবনের জুবিলী উদযাপন করার অর্থ কী? আমি যাজক হিসেবে তোমাদেরকে এই জুবিলী উৎসবে কীভাবে দেখছি? এ বিষয়ে আমার অনুভূতি কী তা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। প্রথমেই জুবিলী বর্ষে তোমরা যারা খ্রিস্টীয় পরিবারে আছ, তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাই। মণ্ডলীর আদি-গোড়া-ভিত্তি হয়ে, অন্য কথায় গৃহ-মন্ডলী হয়ে তোমার পরিবারিক জীবন যাপন করছ। তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। তোমাদেরকে সাধুবাদ জানাই কেননা তোমরা ঘরে ঘরে মন্ডলী আছ বলে বৃহত্তর পরিসরে মন্ডলী অবস্থান করছে। তোমাদের জন্য মন্ডলী গর্বিত ও মহিমাম্বিত।

(১) পরিবারের জুবিলী হচ্ছে জীবনের পরিচয় উদযাপন। এ উদযাপনের মধ্য দিয়ে তোমরা তোমাদের পরিচয়ের গভীরে যাচ্ছ, নিজস্ব পরিচয় সম্বন্ধে আরও জ্ঞান লাভ করছ, আরও শিক্ষা গ্রহণ করছ, আরও সচেতন হচ্ছ। আজকের সকাল বেলার সকল গুণেচ্ছাবানী ও বক্তব্যের মাধ্যমে সেটাই তো প্রকাশ পেয়েছে।

যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী হিসেবে, তোমাদের জীবনের আহ্বান, তোমাদের জীবনের পরিচিতি জেনে ও ধ্যান করে আমরাও আমাদের জীবনের মর্যাদা আরও গভীর ভাবে অনুভব করি এবং তোমাদের জীবনান্বাহনের সেবাকাজে আরও কর্তব্যনিষ্ঠা জাগ্রত হয়। আমিও আমার জীবনের পরিচয় উদযাপন করি। কেননা মন্ডলীতে আমরা সবাই এক – যদিও আমাদের প্রত্যেকের ভূমিকা ভিন্ন।

(২) পরিবারের জুবিলী উদযাপন হচ্ছে একটি স্মরণোৎসব: তোমরা স্মরণ করছো: প্রাক-বিবাহের পরিণয়, বিবাহ-সংস্কার গ্রহণ, বিবাহ-উৎসব, স্বামী-স্ত্রী রূপে দাম্পত্য জীবন, পরিবারের পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যদের সাথে সম্পর্ক ও জীবনযাত্রা; স্মরণ করছো তোমাদের বিগত দিনগুলোর ইতিহাস, যা খ্রিস্টীয় পরিবারের ইতিহাস। পরিবারের মধ্যে যাকিছু অখ্রিস্টীয়: পাপ, পতন, বিফলতা, ব্যর্থতা – তাও কিন্তু খ্রিস্টীয় পরিবারের ইতিহাসের অংশ; সেখান থেকে তোমরা অনেকে বেরিয়ে এসেছো, বেরিয়ে আসতে চাও, ভবিষ্যতে আরও সুন্দর হওয়ার প্রত্যাশা করছ, ইত্যাদি। যজ্ঞ-উৎসর্গ হচ্ছে তোমাদের বিবাহিত জীবনের সর্বোত্তম স্মরণোৎসব।

আমি যাজক হিসেবে প্রভুর স্মরণোৎসবের সাথে তোমাদের স্মরণোৎসব মিলিয়ে দিয়ে যজ্ঞ নিবেদন করি; আজ শুধু নয়, সব খ্রিস্টযাগে তাই আমরা করে থাকি।

(৩) পরিবারের জুবিলী উদযাপন হচ্ছে কৃতজ্ঞতা: তোমাদের জীবনের সকল সফলতার জন্য প্রভুর প্রশংসা করছ, তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ, তাঁর কাছে তোমাদের কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করছ। তোমাদের বিবাহিত জীবনে জীবনভর তোমরা যাচিত অথবা অযাচিত কত ভালবাসা, কত অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করেছো।

আমরাও মন্ডলীর যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী হয়ে ঈশ্বরকে এবং তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তোমরা নিজেরা যে আহ্বান পেয়েছো সেখান থেকেই তো আমাদের আহ্বানের উৎস। আমরা কত আশাভরে তোমাদের দিকে চেয়ে থাকি, প্রার্থনা করি, এবং প্রতীক্ষায় থাকি তোমাদের কোন কোন সন্তান-সন্ততি আমাদের মতো জীবন আহ্বান বেছে নেবে।

(৪) পরিবারের জুবিলী উদ্‌যাপন হচ্ছে অনুতাপ: তোমরা তোমাদের জুবিলী পালন করতে গিয়ে অবশ্যই তোমার স্মরণ হবে অনেক ব্যর্থতা, বিফলতা, অপারগতা ও পাপ-অপরাধ। পাপের জন্য অনুতাপ করা কিন্তু ধার্মিকতার প্রথম ধাপ এবং পারিবারিক জীবনে সাধুতার অনুগ্রহ লাভের এক বিশেষ মুহূর্ত।

আমরা যাজক হিসেবেও অনুভব করি আমাদের কতো বিফলতা, আমাদের সেবাকর্মের সীমাবদ্ধতা। তোমাদের দুর্বলতা আমাদেরকে তোমাদের সাথে এক করে, মিলন করে। যিশুর ক্ষমা তোমাদের অন্তরে পৌঁছে দিয়ে আমরাও অনুভব করি ক্ষমাদান ও ক্ষমা-পাওয়ার আনন্দ।

(৫) পরিবারের জুবিলী উদ্‌যাপন হচ্ছে নতুন আশার জাগরণ: জুবিলী উদ্‌যাপনে তোমাদের অন্তরে নতুন আশা জেগে উঠবে। তীর্থযাত্রী তোমরা, অতীতে আশা নিয়ে পথ চলেছো তোমরা। সাধু পলের কথা অনুসারে “আশা তোমাদেরকে প্রতারণা করেনি”; বর্তমানে তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের বর্তমান, তোমরা যে মন্ডলীতে বিরাজমান আছ, সেটা তো তোমাদের অতীতের আশার ফল, আশার স্বার্থকতা, আশার সাক্ষ্যদান। তোমরাও আশাভরে ঈশ্বরের নিকট পুনরায় অঙ্গীকার করবে ভবিষ্যতের জন্য।

আমরা তোমাদের নবপ্রেরণা, নবচেতনা, নব-উদ্যোগ দেখে যাজক হিসেবে আমরাও আশান্বিত। যথাযোগ্যভাবে তোমাদের সেবা করার নতুন আশা আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়।

জুবিলীর দিনে তোমাদের জন্য ঈশ্বর যে কথা বলেন তা আমরা দুটো শাস্ত্রপাঠে শুনেছি: ১ম করি ১৩:১-১৩; যোহন ১৭: ২০-২৬। বর্তমান পোপ লিও মন্ডলীর কাছে দুটো বিষয় গুরুত্ব দিয়ে পরিবারের জন্য বাণী রেখে যাচ্ছেন। সেই দুটো বিষয় আজ শাস্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে: ভালবাসা ও একতা।

ভালবাসা: প্রথম পাঠে সাধু পলের লেখা থেকে একটি প্রেমের বা ভালবাসার কবিতা শুনলাম। এই কবিতা গোটা মন্ডলীর প্রেমগীতি, এটা পরিবার বা তোমরা যারা

গৃহ-মন্ডলী হিসেবে আছ তোমাদের জন্য নিত্যদিনের প্রেমগান। তোমাদের বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের মাপকাঠি হচ্ছে ভালবাসা। ভালবাসা ছাড়া সবকিছুই বাহ্যিক, চংচঙানি ও বনবনানি মাত্র। ভালবাসা সহিষ্ণু, কোমল; ভালবাসায় ঈর্ষা নেই, অহংকার নেই, রক্ষ ব্যবহার নেই, স্বার্থচিন্তা নেই, বদমেজাজ নেই; ভালবাসা বিচার করে না, অধর্মতায় আনন্দ করে না, সককিছু ক্ষমা করে। ভালবাসার মধ্যে আছে সীমাহীন বিশ্বাস, সীমাহীন আশা ও সীমাহীন ধৈর্য। ভালবাসার মৃত্যু নেই, ভালবাসাই ভালবাসাকে মরতে দেয় না। তোমরা বিশ্বাস করো, তোমাদের মধ্যে এই ভালবাসা আছে, তাই তোমরা পরিবাররূপে আছ। যদি ভালবাসার অভাব অনুভব হয় তা হলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসার জন্য আশা জাগ্রত হবে।

একতা: তোমরা বিশ্বাস করো যে, তোমাদের বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে একতা আছে। তোমাদের পারিবারিক একতার মধ্য দিয়ে তোমরা পবিত্র ত্রিত্বের ঐক্য প্রকাশ করে থাক। তিনে মিলে এক, দুয়ে মিলে এক, পিতা, মাতা ও সন্তান মিলে এক – অনর্থক বা অর্থহীন কথাবার্তা নয়। পরিবারের প্রিয়জনেরা, তোমরা তোমাদের জীবনের শক্তি কোথা থেকে পাও? আজকের মঙ্গলসমাচারে সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে: মহাযাজক যিশু তোমাদের জন্য প্রার্থনা করেন; তোমাদের জন্য তাঁর যাজকীয় প্রার্থনা হচ্ছে: “তারা যেন এক হয়”। এটাই তোমাদের শক্তি। জীবনকে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করে তিনি সেই প্রার্থনা করেন। তোমরা তোমাদের বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের একতা দিয়ে যিশুর মহিমা ও তাঁর গৌরব প্রকাশ করছ।

পিতা তোমাদের ভালবাসেন, পুত্রের অনুগ্রহ তোমাদের মধ্যে আছে এবং পবিত্র আত্মায় তোমরা অভিষিক্ত, অধিষ্ঠিত ও প্রেরিত। তাই তোমাদের মধ্য দিয়ে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার জয় হোক। পরিবার হিসেবে তোমরাও মহিমাম্বিত। তোমাদের মহিমায় গোটা মন্ডলীও মহিমাম্বিত। আমেন॥

ৱচনা-৬ : জুবিলীবর্ষে তত্ত্বাবধেব বিকটি তপস্যা কালীত বাণী

তোমরা ইতোমধ্যে জান যে, এ বছর খ্রিস্ট যিশু যে এ জগতে এসেছেন তার ২০২৫ বছরের পূর্তি। তাই এ বছর জুবিলী বর্ষ। কাথলিক মণ্ডলীতে প্রতি ২৫ বছর অন্তর-অন্তর জুবিলী বর্ষ অনুষ্ঠিত হয় যা আবার “পুণ্য বর্ষ” হিসেবেও অভিহিত হয়।

জুবিলী বর্ষ উদ্‌যাপন করার আবেদন, সূচনা লগ্ন থেকে এসেছে জনগণের কাছ থেকে। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে কাথলিক মণ্ডলীর জনগণ পোপ বনিফাসের কাছে জুবিলী উদ্‌যাপন করার আবেদন করেছিল। তারা কেন আবেদন করেছিল? একমাত্র উদ্দেশ্য হল: জুবিলী বর্ষে, তাদের ধ্যান-প্রার্থনা-তপস্যা ও তীর্থের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের ভালবাসা ও তাঁর করুণা লাভ করবে, পাপের ক্ষমা পাবে, সকল প্রকার কু-অভ্যাস ও কুপ্রবৃত্তি এবং পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে; জগতে মুক্তিদাতার আগমন তাদেরকে পাপ থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ দান করবে। পাপ দ্বারা ঈশ্বরের সাথে এবং মানুষের সম্পর্কে সৃষ্ট ক্ষতের কারণে শান্তি-দন্ডের যে-যোগ্য হয়েছে তার থেকে পূর্ণ দন্ডমোচন লাভ করার সুযোগ পাবে যাতে তারা মৃত্যুর পরে সরাসরি স্বর্গে গমন করতে পারবে।

জুবিলীবর্ষ-২০২৫ খ্রি. : পুণ্যবর্ষ : “আশার তীর্থযাত্রী আমরা”

পোপ ফ্রান্সিস মণ্ডলীর সকলের কাছে আহ্বান করেছেন যেন “আশার তীর্থযাত্রী” মূলধ্যান নিয়ে জুবিলীর পুণ্য ও পবিত্র বছরটি পালন করা হয়। সুতরাং ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জুবিলীর সময় খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সাথে একাত্ম হয়ে তোমরা ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করে দেখবে: যিশু কি তোমার জন্য এই জগতে আসেননি? যিশু কি তোমাকে ভালবাসেন না? তোমার প্রতি তাঁর দয়া কি তিনি দেখাবেন না? তুমি কোন সময় পাপ বা অপরাধ করোনি? ঈশ্বর ও মানুষের সাথে তোমার সুন্দর সম্পর্ক কি ছিল হয়ে যায়নি? তার জন্য তুমি কি শান্তি পাবার যোগ্য হয়ে ওঠোনি? যিশু যে তোমাকে পাপের বোঝা, দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চান, তা তুমি কি গ্রহণ করবে না? জীবনে তুমি কি শান্তি পেতে চাও না? খ্রিস্টীয় জীবনে তুমি যে, যিশুর বন্ধু, যিশুর সাথী, তাঁর অনুসারী তোমাকে নিয়ে যিশু যে আনন্দ পেতে চায়, তুমি যে আনন্দ পেতে চাও, তা তুমি গ্রহণ করবে না?

খ্রিস্টীয় জীবনপথে চলার সময় গোটা মণ্ডলী যেমন, তেমনি তোমরাও, নিরাশা ও হতাশ হয়ে পড়তে পার? সামনে ভাল কিছু হয়তো দেখছো না। মনে হতে পারে জীবনের সকল শুভ স্বপ্ন ও ভাবনা যেন হারিয়ে ফেলেছো। জীবনে অনেক কষ্ট ও দুঃখ অনুভব হতে পারে। জীবনধারণ ভারী বোঝা হয়ে অনুভূত হতে পারে।

সেই সময়ে সাধু পল অবাক করে আমাদের বলেন: “আমরা তো আমাদের দুঃখ-দুর্ভোগ নিয়েও গর্ব করে থাকি; কেননা আমরা জানি যে, দুঃখ-দুর্ভোগ থেকে জাগে কর্তব্যনিষ্ঠা আর কর্তব্যনিষ্ঠা থেকে আসে চারিত্রিক যোগ্যতা; আর চারিত্রিক যোগ্যতা

থেকে অন্তরে জেগে ওঠে আশা। আর এই আশা তো কখনো ছলনা করে না; কেননা স্বয়ং পবিত্র আত্মা যিনি -- আমাদের কাছে ঐশদান যিনি -- তিনি আমাদের হৃদয় পরমেশ্বরের ভালবাসায় পরিপ্লুত করেছেন।” রোমীয় ৫:৩-৪

তাই বলছি তোমরা আশা নিয়ে পথ চল। আশা হারিয়ে ফেল না। খ্রিস্টীয় জীবনে শান্তি ও আনন্দ নিয়ে তোমার বন্ধুদের সাথে পথ চল। পবিত্র আত্মা তোমাদের মনে অনুতাপ সঞ্চর করতে পারে। তোমাকে বলতে পারে যিশুর ভালবাসা গ্রহণ কর, তার দয়া গ্রহণ করো, পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নম্রভাবে পাপস্বীকার করো। পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করে পুনরায় ঈশ্বর ও মানুষের সাথে পুনর্মিলিত হও।

আশা নিয়ে পোপ মহোদয়ের আহ্বানে ও মন্ডলীর আহ্বানে সাড়া দাও। আশা অন্তরে ধারণ করো। আশা তোমাকে ছলনা করবে না, তোমাকে ঠকাবে না, তোমার প্রতি আশা বেইমানী করবে না। তোমার মধ্যে তো খ্রিস্টবিশ্বাস আছে: এই খ্রিস্টবিশ্বাস হচ্ছে তোমার জীবনে বড় দিদি। ভালবাসা বা প্রেম হচ্ছে তোমার জীবনে মেজ দিদি, সেই ভালবাসা নিয়ে পথ চলে। তোমার জীবনে “আশা” হল ছোড়দি, তোমার জীবনে ছোট বোনের আশা তোমার হাত ধরে সে চলতে চায়। আশার হাত ধরে জীবন পথে চলবে না? ছোট বোন আশাকে ছেড়ে বিশ্বাস ও প্রেম দিদিরাও চলতে পারবে না। আশা কিন্তু নিজেও বিশ্বাস ও প্রেমের হাত ধরে চলে। অতএব খ্রিস্টীয় জীবনে তোমার বিশ্বাস ও প্রেম – এই দুই দিদিকে সঙ্গে রেখে ছোটবোন “আশা”র হাত ধরে চলো। এভাবে তোমার জীবনের পথ চলা সার্থক হবে, পুন্যবর্ষ তোমার জন্য অনেক অনুগ্রহ নিয়ে আসবে।

তোমাদের জন্য আমার প্রার্থনা যেন জুবিলীবর্ষ আমাদের সকলার জন্য যেমন, তোমাদের জন্যও তেমনি, তোমাদের খ্রিস্টীয় জীবন আরও আধ্যাত্মিক, আরও মাণ্ডলিক ও সামাজিক তাৎপর্য বহন করে আনে। আমাদের জীবনে মন-পরিবর্তনের জন্য যেন যিশুর ভালবাসার আহ্বান শুনতে পারি ও সাড়া দিতে পারি।

তপস্যাকাল : “এসো আশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করি”

এই জুবিলীবর্ষ কেন্দ্র করে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তপস্যাকালের জন্য যে বাণী রেখেছেন তা হল: “এসো, আশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করি”। তপস্যাকালে তোমাদের কাছেও পোপ মহোদয় সেই একই আহ্বান করছেন। এসো তাঁর আহ্বানের ওপর একটু ধ্যান করে দেখি।

ভস্ম-তিলক নিয়ে অনুতাপসূচক একটি অনুষ্ঠান-রীতির মধ্য দিয়ে, বিশ্বাস, ভালবাসা ও আশাভরে, আমরা আমাদের বাৎসরিক তপস্যাকালীন তীর্থযাত্রা শুরু করেছি। মাতা মণ্ডলী আমাদের আহ্বান করেন যেন আমরা ঈশ্বরের কৃপার প্রতি আমাদের হৃদয় খুলে দিই, যাতে পাপ ও মৃত্যুকে ধ্বংস করে, প্রভু যিশুর বিজয় আনন্দের সাথে উদ্‌যাপন করতে পারি। সাধু পল বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন: “বিজয়ের গ্রাসে মৃত্যু হয়েছে কবলিত। ওহে মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়?” (১করি ১৫:৫৪-৫৫)। ত্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত যিশুই হচ্ছেন আমাদের জন্য বিশ্বাস ও ভালবাসার ভিত্তি ও আশার প্রতিশ্রুতি।

এবারের জুবিলী বর্ষের তপস্যাকালের উদ্দেশ্যে পোপ মহোদয়ের ধ্যানবাণীর মধ্য দিয়ে “এসো, আশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করি” এবং ব্যক্তিগত ও সমবেত ভাবে জীবন পরিবর্তনের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ করি।

যাত্রা করা: প্রথমেই আমরা স্মরণ করি বাইবেলের মহাযাত্রা: মিশর দেশ থেকে প্রতিশ্রুত মুক্তির দেশে ঐশজনগণের যাত্রা। স্মরণ করি বর্তমানকালেও কত সহস্র মানুষ যাত্রা করছে, পথ চলছে নানা কারণে ও নানা লক্ষ্যে। তপস্যাকালে আমাদের সচেতন হতে হয় যে আমরা যাত্রা করছি, আমরা যাত্রী।

তবু নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়: আমি কি সত্যিই যাত্রা করছি? না পথে আমি থেমে গেছি? আমি কি সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি? না হতাশা ও নিরাশায়, ভয় ও সংকটে যাত্রাপথে অচল হয়ে পড়েছি? আমি কি আমার পাপ অবস্থা ও জীবনের অমর্যাদা পেছনে রেখে সামনের দিকে পথ চলছি? এই মন-পরীক্ষা হচ্ছে তপস্যাকালের চিন্তা ও ধ্যান।

পোপ মহোদয় বলেন **একসঙ্গে** যাত্রা করো: আমাদের এই যাত্রা একাকী যাত্রা নয়। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান – একই পিতার উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা। একসঙ্গে যাত্রা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাত্রাপথে কাউকে আঘাত করা নয়, হিংসা-ঈর্ষা নিয়ে বা ভান করে যাত্রা করা নয়, কেউ যেন পেছনে পড়ে না থাকে, কাউকে বাদ দিয়ে যাত্রা করা নয়। তোমরা ভাবতে পারো: তরুণসমাজে একসঙ্গে পথ চলবে, পরস্পরের হাত ধরে একসঙ্গে পথ চলবে। অন্যের প্রয়োজনের প্রতি উদার হয়ে তোমরা পথ চলবে।

তপস্যাকালে আমরা যাদের সাথে আছি, যাদের সাথে বাস করি, আমাদের পড়াশুনার সময়ে আমরা আমাদের সহপাঠী, সহযাত্রী, সমসাথী নিয়ে পথ চলছি, আমাদের কার্যক্ষেত্রে যাদের সাথে কাজ করি ও যাদের সাথে সম্পর্ক রাখি, তাদের সাথে আমি কি আমার বন্ধন অনুভব করি? তারা কি আমার কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে? যাত্রাপথে কাউকে কি ইচ্ছা করে দূরে সরিয়ে রেখেছি? যাত্রাকালে আমি কি খ্রিস্টান সমাজ বা মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন? আমি তাদের সাথে যাত্রা করছি? আমার বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে

যাত্রা করছি? তপস্যাকালে ঈশ্বরের কাছ থেকে এই আহ্বান আমরা শুনতে পাই: তোমরা একসঙ্গে জীবনে যাত্রা করো।

আশা নিয়ে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করছি কেননা আমাদের কাছে দেয়া হয়েছে প্রতিশ্রুতি। “আশা আমাদের ছলনা করে না” (রোমীয় ৫:৫), জুবিলীর মূলকথা, সেই লক্ষ্যের দিকে আমাদের যাত্রা; আর সেটাই হচ্ছে পুনরুত্থানের বিজয়। সাধু পল আবার বলেন: “যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, আমরা ওইসব কিছুই সম্মুখীন হয়েও তাঁরই শক্তিতে তবুও মহাবিজয় লাভ করি। কারণ আমি তো নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, কোন-কিছুই আমাদের প্রভু যিশুতে নিহিত ঐশ ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না: মৃত্যুও নয়, জীবনও নয়, কোন দূত, আধিপত্য বা শক্তি, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন-কিছু, উর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা সৃষ্ট অন্য কোন-কিছুও নয়”। (রোমীয় ৮:৩৭-৩৮)

মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান: “আশা”র জন্য আমাদের কাছে আহ্বান আসছে; ঈশ্বরের মহান শাস্ত্র জীবনের প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর উপরে আস্থা স্থাপনের জন্য আহ্বান আসছে। আমি কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, প্রভু আমার পাপ ক্ষমা করেন, না এমন ভাব পোষণ করি যে, আমিই সব কিছু করতে পারি? আমি কি মুক্তি বাসনা করি? সেই পরিব্রাজক পেতে ঈশ্বরের সহায়তা যাচনা করি? বর্তমান জীবন-পরিস্থিতিতে আমি কি আশা ধারণ করতে পারি? দেশ ও জাতি, মণ্ডলী ও আমার ইতিহাসের ঘটনাকে আশা নিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি? আশা হচ্ছে আমাদের জীবন-নৌকার সুদৃঢ় নোঙ্গর।

স্নেহের প্রীতিভাজনেরা, পুণ্যবর্ষে তোমাদের প্রত্যেকের কাছে এই বাণী উচ্চারিত হচ্ছে: “আশার তীর্থযাত্রী” তোমরা। উপরোক্ত বাণীর আলোকে তোমরা তোমাদের জীবনটাকে পর্যালোচনা করো। তপস্যাকালে তোমাদের কাছে এই আহ্বানও আসছে: “আশা নিয়ে তোমরা একসঙ্গে যাত্রা করো”। এই বাণীর দ্বারা তোমরা যে নির্দেশনা পাচ্ছ তা নিয়ে তোমাদের জীবন পর্যালোচনা করো।

কুমারী মারীয়া, আশার মাতা তুমি, তুমি তরুণদের স্নেহময়ী মাতা। তাদের সঙ্গে চলো, তাদের জন্য প্রার্থনা কর এবং তপস্যাকালীন যাত্রায় তাদের সহযাত্রী হও।

ৱচনা- ৪: জাতীয় জুবিলী-উৎসব – ব্যক্তিগত ধ্যাত সহভাগিতা

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শুরু হয়েছিল ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন বিশ্বজনীন মণ্ডলীর নিকট আহ্বান করে বলেছিলেন: “মণ্ডলীর জানালা খুলে দাও।”

যুগ যুগ ধরে প্রতিটি পুণ্যবর্ষে খ্রিস্টমণ্ডলীর কাছে আহ্বান আসে: “মণ্ডলীর দরজা খুলে দাও”। সেই আহ্বানে জাতীয়ভাবে জুবিলী-২০২৫-এর পুণ্যবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুণ্যকর্ম হচ্ছে উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করা, আর সেই দ্বার হচ্ছেন খ্রিস্ট যিশু নিজে। কিছুক্ষণ আগে এই মন্দিরের উন্মুক্ত দ্বার ভক্তিভরে স্পর্শ করে প্রবেশ করে প্রবেশ করেছি।

জাতীয় পর্যায়ে পুণ্যবর্ষ পালন করতে এসে এই মুহূর্তে স্মরণ পড়ছে ১২৬ নয় সাম-গীতিকারের কথা: “যারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বীজ বুনে যায়, আনন্দের গান গাইতে গাইতে তার ফসল তুলে আনে” (৪-৫)। আজকের আমাদের এই আনন্দ-উৎসব মূলত তাই, নাচে-গানে-আনন্দ-উৎসবে এবং কৃতজ্ঞতা-প্রশংসা-স্তুতিতে, খ্রিস্টযাগ-উপাসনায় একত্রিত হয়ে আমরা পুণ্যবর্ষের ফসল সংগ্রহ করছি।

জুবিলী-২০২৫ বর্ষ এবং পুণ্যবর্ষের প্রত্যাশা

দীর্ঘ তিনটি বছরের সিনড প্রক্রিয়ায় মণ্ডলীর পথ চলা ছিল আমাদের এক অভিনব পূর্বপ্রস্তুতি। পূর্বপ্রস্তুতির একটি মহা লগ্নে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ৯ মে, পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিস্টাব্দকে “আশার তীর্থযাত্রী আমরা” শিরোনামে মূলভাবনা দিয়ে ৩১তম জুবিলী বর্ষকে পুণ্যবর্ষ বলে ঘোষণা করেন। ঘোষণাপত্রটির প্রেরণার বাণী ছিল: “আশা আমাদের ছলনা করে না, কারণ এই আশা ঈশ্বরের ভালবাসার নিশ্চয়তা দান করে (রোমীয় ৫:৫)।

পোপ ফ্রান্সিস পুণ্যবর্ষ উপলক্ষে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি একান্ত বাসনা করেছিলেন পুণ্যবর্ষ তিনি গোটা বিশ্বমণ্ডলীর সাথে পালন করবেন নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ঈশ্বর তাকে পুণ্যধামে নিয়ে গেলেন এ বছরের পুনরুত্থান পর্বের পরের দিন, ২১ এপ্রিল।

পোপ মহোদয়ের বাসনা ছিল: পুণ্যবর্ষ অনেকের জীবনে আশা নবায়ন করার সুযোগ দান করবে। মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। জুবিলীর আবেদন মণ্ডলীর সীমানা পেরিয়ে প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌছে যাবে কেননা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আশা রয়েছে।

পোপ ফ্রান্সিস প্রত্যাশা করেছেন জুবিলী- ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জুবিলী হবে সমগ্র মণ্ডলীর জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহের মুহূর্ত যখন খ্রিস্টবিশ্বাসী জনগণ তাদের বিশ্বাস, লোকভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের এক সুবর্ণ সুযোগ পাবে।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাম্প্রতিক জগতের অবস্থা যদিও তীর্থের পরিপন্থী, তথাপি তীর্থ সবসময় আশা জাগ্রত করে। বর্তমান কালের সকল নেতিবাচক পরিস্থিতিতে একমাত্র আশা পারে সকল অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন: “জুবিলী সবসময়ই এমন একটি ঘটনা যা মণ্ডলীর জন্য আধ্যাত্মিক, মাণ্ডলিক এবং সামাজিক তাৎপর্য বহন করে।” যুগ যুগ ধরে প্রভুর ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, পরিবার ও শত্রুপক্ষদের মধ্যে মৈত্রীভাব স্থাপন করা হয়, যিশুর দিকে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ও ঐশ্বর্য করুণার দ্বারা অন্তর উন্মুক্ত করা হয়।

পোপ ফ্রান্সিস বলেন: “পুণ্যবর্ষে রোম নগরীতে বিভিন্ন দল বা শ্রেণির জন্য তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। তবে শুধু রোমে নয়, প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলী, তার আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসারে, নিজস্ব ভাষা ও প্রতীক-চিহ্নের মাধ্যমে জনগণ প্রকাশ করবে তাদের খ্রিস্টবিশ্বাস, তারা সাক্ষ্যদান করবে এবং উৎসব-উদ্‌যাপন করবে।”

পুণ্যবর্ষে মণ্ডলীর অভিজ্ঞতা

ক্যাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস – প্রায় দুই হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাস। তথাপি মণ্ডলী বুড়ো হয়ে যায়নি। মণ্ডলী সর্বদাই যুব, যৌবনে তার অবস্থান, প্রতিনিয়তই যেন মণ্ডলীর বসন্তকাল: সর্বদাই সজীব, সক্রিয় ও সতেজ।

জুবিলী বর্ষের প্রস্তুতি স্বরূপ দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নবায়নের (*aggiornamento*) আহ্বান মণ্ডলীতে প্রচারিত হয়েছিল, প্রস্তুতিপর্বে আমরা অংশগ্রহণ করেছি এবং আশার তীর্থযাত্রায় পুণ্যবর্ষে আমরা প্রবেশ করেছি।

জুবিলীবর্ষে মণ্ডলী যে মিলন-সমাজ তা উদ্‌যাপন করেছি পবিত্র ত্রিত্বের মিলনের একাত্মতায় ও আদর্শে, যাজক-সন্ন্যাসব্রতী-ভক্তজনগণের সম্মিলিত যাত্রায়। মণ্ডলী যে অংশগ্রহণমূলক তা উদ্‌যাপন করেছি খ্রিস্টের নিগুঢ় দেহের অঙ্গ রূপে যার মধ্যে রয়েছে স্বতন্ত্র মর্যাদা ও ভূমিকা। মণ্ডলী যে মিশনারি বা প্রেরণধর্মী, তা আমরা উদ্‌যাপন করেছি দীক্ষিত মিশনারি হিসেবে। বিশ্বজনীন ও স্থানীয় মণ্ডলীতে একসঙ্গে যাত্রা করে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হিসেবে উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে মিলন, অংশগ্রহণ ও মিশন প্রকাশিত হয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

(১) বন্ধু যিশু সংঘের ভক্তজনগণের সঙ্গে দুইটি তীর্থযাত্রা, বছরে চারবার নির্জন ধ্যান-সভা এবং প্রতিদিনের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পুণ্যবর্ষ উদ্‌যাপন।

- (২) ভাটিকান থেকে আগত কার্ডিনাল কোভাকাড ও সহকর্মীদের উপস্থিতিতে, সর্বজনীন ভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে একত্রে সপ্তাহব্যাপী আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পুণ্যবর্ষ উদ্‌যাপন।
- (৩) ভাটিকানের “সমন্বিত মানব-উন্নয়ন” মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্ডিনাল চেরনীর উপস্থিতিতে, চারদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে, ভালাবাসা, সেবা ও দয়ার কাজে সম্পৃক্ত দীনজনদের স্মরণ করে এবং মণ্ডলীর বহু মানব-উন্নয়ন সংগঠন ও কর্মীদের সাথে একাত্ম হয়ে মণ্ডলীর সমন্বিত মানব-উন্নয়ন আদর্শ উদ্‌যাপন।
- (৪) নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের ১৭০০ বছরের পূর্তিতে, আন্তঃমাণ্ডলিক ভাবে সর্বখ্রিস্টান কনফারেন্সের মাধ্যমে নিসীয় বিশ্বাসের ঐক্য উদ্‌যাপন।
- (৫) প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু ও স্মরণসভা এবং পোপ লিও’র নির্বাচন ছিল বিশ্বের এবং স্থানীয় মণ্ডলীর জন্য ছিল পুণ্যবর্ষের আরেকটি বৃহৎ কর্মসূচি যা আমরা পরিকল্পনা করিনি, স্বয়ং পবিত্র আত্মাই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন এবং প্রচুর ফসল সেখান থেকে উৎপাদিত হয়েছে।
- (৬) বিশ্বমণ্ডলীতে এবং স্থানীয় মণ্ডলীতে বিভিন্ন দলে দলে তীর্থযাত্রা পুণ্যবর্ষের মধ্যে ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রসারিত কর্মসূচি।
- (৭) রোমে প্রয়াত ৭ জন পোপের কবর-পরিদর্শন ও প্রার্থনা, ওয়াশিংটনের অমলোড্রবা কুমারী মারীয়ার ন্যাশনাল শ্রাইন, মট্রিয়ালের সেন্ট যোসেফ শ্রাইনে তীর্থযাত্রা এবং প্রবাসে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশের খ্রিস্টানদেরকে মিশনারি ভূমিকায় উদ্দীপিত করা ছিল আমার একটি ব্যক্তিগত বিশেষ কর্মসূচি।
- (৮) পুণ্যবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন ঘটনা ও শিক্ষা নিয়ে লেখালেখি ও শেয়ারিং ছিল আরেকটি ধ্যান ও সেবা।

সর্বশেষে – আজকের জাতীয় জুবিলী উদ্‌যাপন – ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ সংগ্রহণ হচ্ছে পুণ্যবর্ষের একটি সুন্দর আধ্যাত্মিক ও মাণ্ডলিক ঘটনা।

ষষ্ঠ ভাগ: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছুটিলি উদযাপন

রচনা-১: বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনের সুবর্ণ জয়ন্তী বিবর্তন – বিশেষ ঘটনা – মাইলফলক

প্রারম্ভিক কথা:

মানুষ বর্তমানে বাস করে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, অতীতের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করে। অতীতের প্রতি আকর্ষণ হচ্ছে এ কারণে যে, মানুষ যেহেতু স্থান-কাল-পায়ে অবস্থান করে, সেহেতু সে শূন্য থেকে আসেনি, তার আছে একটা ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত একটা পরম্পরা। অতীতকে স্মরণ করা মানবসত্তার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। স্মৃতির শক্তি অত্যন্ত সক্রিয়। স্মৃতি বিলোপন অনেক সময় একটা অসুস্থতা হতে পারে। সি.বি.সি.বি.-এর সুবর্ণজয়ন্তীতে সি.বি.সি.বি.-কে ফিরে দেখা একটি মহৎ, সুস্থ ও আনন্দদায়ক কাজ। এই ঘটনার ভাগীদার হতে পেরে আমি খুবই ভাগ্যবান মনে করছি।

আমার জানামতে, সি.বি.সি.বি.-এর পূর্ব-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস, পূর্বে মনে হয় নেয়া হয়নি। অতএব এই প্রবন্ধটি দাঁড় করাতে আমাকে তথ্যের সন্ধান করতে হয়েছে। তথ্যপঞ্জি হিসেবে যে দলিল আমি ব্যবহার করেছি, তাহল কাথলিক বিশপ সম্মিলনী সভার কার্যবিবরণী যা সংখ্যায় প্রায় দুই শতাধিক হবে। এই কার্যবিবরণীগুলো ঢাকা আর্চবিশপ হাউজের আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে। আরেকটি প্রধান দলিল হচ্ছে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, কেননা সি.বি.সি.বি.-এর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তিরিশ বছর আমি নিজে বিশপ হিসেবে সম্পৃক্ত ছিলাম।

আমাকে বলা হয়েছে: বিগত পঞ্চাশ বছরে “সি.বি.সি.বি.-এর বিশেষ ঘটনা ও মাইলফলক” উল্লেখ করে একটি রচনা লিখতে। উক্ত বিষয়টিই প্রতিপাদ্য ক’রে রচনাটির শিরোনাম রেখেছি “সি.বি.সি.বি.-র বিবর্তন: বিশেষ ঘটনা ও মাইলফলক”। প্রবন্ধটি সাতটি ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করছি। প্রথম ভাগটি পটভূমিকা স্বরূপ এবং সর্বশেষ ভাগটি উপসংহার স্বরূপ। আর মাঝখানে রয়েছে সি.বি.সি.বি.-এর পাঁচজন সভাপতির পাঁচটি কার্যকাল।

প্রবন্ধের ঐতিহাসিক তথ্যগুলো নিখুঁত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি এটি প্রথমকাজ বলে অনেক তথ্যই বাদ পড়েছে অথবা ঘটনার তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতে আরও মান-সম্পন্ন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করার দ্বার উন্মুক্ত থাকছে। প্রকৃতিগতভাবে বর্তমান প্রবন্ধটি অনেকটা বিবরণমূলক; বিশ্লেষণী একটি গবেষণা-সম্মত প্রবন্ধে রূপান্তরিত করার আরও সুযোগ রয়েছে বলে আমি স্বীকার করি।

পটভূমিকা: প্রাক্-সি.বি.সি.বি - ১৯৬০-১৯৭১

৥ ১ ৥ দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা (১৯৫৯-১৯৬৫)

মহাসভার প্রস্তুতিকাল (১৯৫৯-১৯৬২)

পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী, অপ্রত্যাশিতভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য ২১তম বিশ্বজনীন মহাসভা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দিলেন। প্রথম ভাটিকান মহাসভার ৯২ বছর পর, দীর্ঘ প্রায় চার বছরের প্রস্তুতির সমাপ্তিতে, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা উদ্বোধন হল।

মহাসভার কার্যকাল (১৯৬২-১৯৬৫)

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা উদ্বোধন করেছেন পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন, যিনি ৩ জুন, ১৯৬৩ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন পোপ ষষ্ঠ পল (১৯৬৫), যার মৃত্যু ঘটেছে ৬ আগস্ট ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। মহাসভার মূল উদ্দেশ্য ছিল: “খ্রিস্টমণ্ডলীর নবীকরণ”। মণ্ডলীর সামগ্র্য দিক পর্যালোচনা করার পর ১৬ টি গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুমোদিত হয়। পরিসমাপ্তিতে যে কথাটা শ্লোগান হয়ে ব্যক্ত হয়েছে তা হল: “মহাসভা সমাপ্ত হল, মহাসভা দীর্ঘজীবী হোক”। অন্য কথায় বলা যায় যে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা মাত্র শুরু হয়েছে, দীর্ঘকাল ধরে মহাসভা চলবে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাঁচজন বিশপ দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় অংশগ্রহণ করেছেন। তারা হলেন: ঢাকার আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার, সিএসসি, চট্টগ্রামের বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সিএসসি, খুলনার বিশপ দান্তে বাস্তালিয়েরিন, এস.এক্স; দিনাজপুরের বিশপ যোসেফ ওবের্ট, পি.মে, এবং ঢাকার সহকারী বিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি।

পাকিস্তান কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (পি.সি.বি.সি), পূর্ব পাকিস্তান কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (ই.পি.বি.সি), বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর (সি.বি.সি.বি) জন্য প্রধান লক্ষ্য ও দর্শন ছিল দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা অনুসারে মণ্ডলীকে নবীকরণ করা; খ্রিস্টমণ্ডলীর সাক্ষ্যদান, সেবাদান ও মিলনসমাজ রূপে গঠনের জন্য শিক্ষা ও প্রেরণা দান করা; এবং পালকীয় পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দান করা।

৥ ২ ৥ পাকিস্তান কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (পি.সি.বি.সি)

পাকিস্তান কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (পি.সি.বি.সি.) কখন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার তথ্য জানা আমার সম্ভব হয়নি। তবে করাচীর আর্চবিশপ (পরবর্তীতে কার্ডিনাল)

যোসেফ এন্তনি কর্ভেরো পিসিবিসি'র সভাপতি হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর ১৬ থেকে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন “বাংলাদেশ” হিসেবে নতুন রাষ্ট্রীয় পরিচয় লাভ করে।

সমগ্র পাকিস্তানের (পূর্ব+পশ্চিম) বিশপগণ, উদাহরণ স্বরূপ ১৮-১৯/১১/১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাতে এবং ২২-২৩/৫/১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে করাচীতে বিশপ সম্মিলনীর (পিসিবিসি) সভায় মিলিত হয়েছেন। সংবিধান অনুসারে পি.সি.বি.সি দুবছরে একবার সভা করতেন, পালাক্রমে একবার পূর্ব ও পরবর্তীবার পশ্চিম পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হত।

আবার এও দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিশপগণ পৃথকভাবে সম্মিলনীর আঞ্চলিক সভায় (ইপিবিসি) মিলিত হতেন। উদাহরণ স্বরূপ: ১৯-২০/০৪/১৯৬০; ২৯-৩০/৯/১৯৬৯ এবং ২২/৭/১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বিশপদের সভা।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যারা পূর্ব পাকিস্তানের বিশপ সম্মিলনীতে (ইপিবিসি) সদস্য ছিলেন তার হলেন: ঢাকার আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার, সিএসসি (সভাপতি), বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সিএসসি, চট্টগ্রাম; বিশপ দান্তে বাভালিয়েরিন, এস.এব্র, খুলনা; বিশপ যোসেফ ওবের্ট, পি.মে, দিনাজপুর। প্রতিটি সভায় একজন বিশপকে সেক্রেটারি হিসেবে মনোনীত করা হত।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বিশপ সম্মিলনী স্থানীয় বিশপদের দ্বারা গঠিত হয়। সভাপতি: ঢাকার আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গান্ধুলী, সিএসসি (১৯৬০/১৯৬৭), চট্টগ্রামের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি, (১৯৬৮-), দিনাজপুরের বিশপ মাইকেল রোজারিও - সেক্রেটারি (১৯৬৮-) এবং খুলনার বিশপ মাইকেল অতুল ডি'রোজারিও, সিএসসি (১৯৭০-)।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে মণ্ডলীর পরিসংখ্যান ছিল এরূপ: ক্যাথলিক জনসংখ্যা : ১১৪,৯৮৮; পুরোহিত ১২৫ (পাকিস্তানী ৩৯ + মিশনারী ৯৬); ব্রাদার ৬০ (পাকিস্তানী ১৩ + মিশনারী ৪৭); সিস্টার ৪১৩ (পাকিস্তানী ২৮০ + মিশনারী ১৩৩)।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের জন্য দুটো সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়: বরিশালে ৫-৮ আগস্ট এবং ঢাকায় ১২-১৫ আগস্ট। করাচী সেমিনারী থেকে আসা অধ্যাপক ফা: লুইস মাসকারেনাস এই সেমিনার দুটো পরিচালনা করেন। সেমিনারের প্রধান বিষয় ছিল: উপাসনা-অনুষ্ঠান। পুরোহিতগণ যে সমস্ত সুপারিশ পেশ করেন তা পূর্ব পাকিস্তানের বিশপগণ অনুমোদন করেন। (ইপিবিসি সভা: আগস্ট ২৪-২৫, ১৯৬৯)।

॥ ৩ ॥ বিশেষ কয়েকটি ঘটনা:

বিংশ শতাব্দির পঞ্চাশ দশক ছিল সমবায় আন্দোলন ও নারী শিক্ষা আন্দোলন দ্বারা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ দ্বারা চিহ্নিত।

“পূর্ব পাকিস্তান খ্রিস্টান এসোসিয়েশন” নামে একটি রেজিস্টারকৃত সংগঠন হিসেবে পরিচয় লাভ করে (রেজিস্ট্রেশন নং ৩১৮৭/১৪৬-ইস্ট পাকিস্তান, ১৯৬৮-৬৯, ১১ই মার্চ)।

পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত মণ্ডলীর “ধর্মীয় ও সামাজিক” বিষয়ের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ জরিপ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৮-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। প্রধান পরিচালনায় ছিলেন লুভেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সমাজতত্ত্ববিদ, ফাদার ফ্রান্সোয়া হুটার্ট। স্থানীয় ভাবে ফাদার রুড ফ্রাইয়ার্ড, সি.এস.সি এবং সিস্টার মেরী প্যাট্রিশিয়া, সিএসসি উক্ত জরিপ পরিচালনা করেন। জরিপ কাজে করাচী উচ্চ সেমিনারিতে অধ্যয়নরত পূর্ব বাংলার কয়েকজন সেমিনারিয়ান (বেঞ্জামিন কস্তা, বার্নাড পালমা ও প্যাট্রিক ডি'রোজারিও) কয়েকটি প্যারিশে গিয়ে প্রশ্নমালার সাহায্যে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে জরীপের তথ্য সংগ্রহ করে।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে “প্যান এশিয়ার বিশপ সম্মেলন” অনুষ্ঠিত হয় ফিলিপাইনের মানিলা শহরে। এই সভায় পূর্বপাকিস্তানসহ এশিয়ার সকল দেশের বিশপগণ উপস্থিত ছিলেন। এ কারণে ১২-১৩ নভেম্বরের জলোচ্ছাসের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিশপগণ দেশে থাকতে পারেননি।

যাত্রা বিরতির জন্য, ১৯ নভেম্বর, ১৯৭০ খ্রি. পোপ ষষ্ঠ পল ঢাকা বিমান বন্দরে এক ঘন্টা অবস্থান করেন। প্রায় দশ হাজার খ্রিস্টভক্ত বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়ে পোপ মহোদয়কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। ঐ সময়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিমান বন্দরে পোপ মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর কয়েকদিন আগে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে আক্রান্তদের প্রতি পোপ মহোদয় সমবেদনা জানান এবং এক লক্ষ ডলারের একটি চেক প্রেসিডেন্টের হাতে হস্তান্তর করেন। সমপরিমাণের আরেকটি চেক ঘূর্ণিঝড়ে কবলিত খ্রিস্টানদের জন্য প্রদান করেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে দেশে বেশ কয়েকটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। একদিকে ১২-১৩ নভেম্বর প্রকৃতির একটি তাণ্ডব, জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়; আবার অন্যদিকে ১৯৭০ এর জাতীয় নির্বাচন এবং পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। এই দুটো ঘটনা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কে চূড়ান্ত যে ফাটল ধরেছে তা আর কোনদিন জোড়া লাগেনি। ফলশ্রুতিতে হল ৯ মাসব্যাপী স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিজয় (ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১)।

সমসাময়িক কালে মণ্ডলীর মধ্যে ঘটেছে বহুমুখী যুগান্তকারী কয়েকটি ঘটনা: (১) বাংলার মাটিতে একজন পোপ ষষ্ঠ পলের প্রথম আগমন; জনগণের সাথে তাঁর একাত্মতা; এই ঘটনা খ্রিস্টানদেরকে দিয়েছে তাদের নাগরিক জীবনে মর্যাদা ও স্বীকৃতি। (২) জলোচ্ছাস মণ্ডলীর গণ্ডী-সীমানা ভাসিয়ে দিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ দিয়েছে বৃহত্তর সমাজের সাথে খ্রিস্টান জনগণের একাত্মতা ও দেশাত্মবোধ, এবং অনেক কিছুতে তাদেরকে দিয়েছে বহিমুখী চিন্তা ও কার্যক্রম। (৩) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে খ্রিস্টানদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্য ধর্মের মানুষের মাঝে নিমজ্জিত হয়ে নতুন ভাবে সাক্ষ্যদানের দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে। (৪) দেশের মধ্যে এন.জি.ও উদ্ভাবন হয়েছে যার মধ্যে “কোর” ও “কারিতাস” অন্যতম পথিকৃতির ভূমিকা পালন করেছে। (৫) স্থানীয় মণ্ডলী হওয়ার বহুমাত্রিক আহ্বান ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনী অর্জন করেছে। (৬) তাদের নেতৃত্বে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণ বিভিন্ন কমিশন, সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশ ও মণ্ডলী গড়ার কাজে দৃঢ়চিত্তে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। নেতিবাচক ঘটনার মধ্য থেকে ঈশ্বর কত শুভ জিনিস বেড় করে আনেন, তা দেখে আমরা সবাই বিস্মিত।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় যে, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ চারজন বিশপই ছিলেন দেশীয়। মণ্ডলীকে স্থানীয়করণ ও সংস্কৃত্যায়নের প্রক্রিয়ায় দেশীয় বিশপদের মনোনিবেশ ছিল বিরাট একটি মাইল-ফলক।

প্রথম কার্যকাল: ১৯৭১-১৯৭৭ (৭ বছর)

কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সদস্য

সভাপতি: আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি, ঢাকা (১৯৬৭-১৯৭৭)

সেক্রেটারি জেনারেল: বিশপ মাইকেল ডি'রোজারিও, সিএসসি, খুলনা (১৯৭০-)

সদস্য বিশপ : আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি, ঢাকা (১৯৬০-১৯৭৭); বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি, চট্টগ্রাম (১৯৬৮-); বিশপ মাইকেল রোজারিও, দিনাজপুর (১৯৬৮-); বিশপ মাইকেল ডি'রোজারিও, সিএসসি, খুলনা (১৯৭০-)।

পোপের প্রতিনিধি: আর্চবিশপ এডোয়ার্ড ইদ্রিস ক্যাসেডি (১৯৭৩-১৯৭৯)

(১) ই.পি.বি.সি-এর সভা

কাথলিক ডিরেক্টরিতে বলা হয়েছে যে, সি.বি.সি.বি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়; তবে তারিখ বা মাসের কোন উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবতঃ বাংলাদেশের বিজয় দিবসের

সাথে সঙ্গতি রেখে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দকে সি.বি.সি.বি.-এর প্রতিষ্ঠা-বর্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৬৯-১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের বিশপদের কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সেই সভাগুলো মূলতঃ পূর্বপাকিস্তানের আঞ্চলিক বিশপ সম্মিলনীর সভা (ই.পি.বি.সি.) হিসেবে বিবেচিত হয়। (প্রো-নুনসিও মাল্টোনি, সার্কুলার নং ২২৯৭, সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৬৯)

CORR “কোর” প্রতিষ্ঠা-১৯৭১: পূর্ব পাকিস্তানের বিশপগণ, দেশের ভেতরে ও বাইরে (কারিতাস ইন্টারন্যাশনাল, কারিতাস ইতালি, কারিতাস জার্মানি ও কাথলিক রিলিফ সার্ভিস) সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করার পর, জলোচ্ছাস ও যুদ্ধের ফলে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ করার জন্য, স্থানীয় Chittagong Organization for Rehabilitation and Development (CORD –Dec. 2, 1971) সংগঠনটিকে রূপান্তরিত করে আন্তঃধর্মপ্রদেশীয় সংগঠন হিসেবে Christian Organization for Relief and Rehabilitation (CORR) সংস্থাটি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ১২-১৩ তারিখে ই.পি.সি.বি সভায় প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সংস্থার জন্য যাদের হাতে দায়িত্ব প্রদান করা হয় তারা ছিলেন: প্রেসিডেন্ট: বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি (অনুপস্থিতে আর্চবিশপ গাস্কুলী); ডিরেক্টর: ফাদার বেঞ্জামিন লাভে, সিএসসি; সেক্রেটারি: ফাদার বি. রড্রিগ্‌স; সদস্য: ফাদার চার্লস ইয়াং, ফাদার ফ্রেস্টানি, এস.এক্স, ফাদার চেসকাতো, পিমে, ফাদার ব্রুইয়ার্ড সিএসসি এবং সিস্টার মেরী প্যাট্রিশিয়া সিএসসি; আর মাঠ সুপারভাইজার হিসেবে ব্রাদার লরেন্স ডায়েস, সিএসসি এবং ব্রাদার কনস্টান্ট সিএসসি-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয় (ই.পি.বি.সি সভার কার্যবিবরণী: ১২-১৩ জানুয়ারি, ১৯৭১)।

বিশপদের সিদ্ধান্তক্রমে “এপিসকপাল কমিশন ফর মিশন” প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং প্রস্তাবিত হয় যে, তার সভাপতি থাকবেন একজন বিশপ। বাংলাদেশে জাতীয় পি.এম.এস-এর এটাই হচ্ছে আদিক্রম। (ই.পি.বি.সি সভা: ৭-৮ জুলাই, ১৯৭১)

(২) সি.বি.সি.বি.-এর প্রথম সভা: ২-৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২:

বলতে গেলে এই সভাটিই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রথম সভা। সি.বি.সি.বি.-এর প্রতিষ্ঠা বর্ষ এই তারিখ থেকেও গণনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিশপদের এই সভাটি অনেক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল:

(ক) বাংলাদেশের বিশপগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তিনজন বিশপের একটি প্রতিনিধি দল ভাটিকানে গিয়ে পোপ মহোদয়কে অনুরোধ করবেন যেন ভাটিকান স্বাধীন বাংলাদেশকে অতি সত্ত্বর স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং নতুন দেশটির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

- (খ) সভাকালীন সময়ে ২রা ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশের বিশপগণ, এ্যাংলিকান বিশপ ব্লেয়ার এবং ব্যাপ্টিস্ট চার্চের আর.এন. বাউড়ে-কে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- (গ) প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের সময় বিশপগণ, ঈশ্বরের আশীর্বাদের চিহ্নস্বরূপ ক্রুশমূর্তিসহ একটি সোনার চেইন, একটি কলম এবং দুই লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করেন।
- (ঘ) বিশপগণ তাদের লিখিত বক্তব্যে প্রেসিডেন্টকে খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন; **CORR**-এর বর্তমান কার্যক্রম, এবং ভবিষ্যত-কার্যক্রমের পরিকল্পনা তুলে ধরেন; বিহারীদের প্রতি তাঁরা উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন এবং তাদের মাঝে, বিশেষ করে মোহম্মদপুর, মিরপুর, খালিশপুর ও সৈয়দপুরে ত্রাণকাজের কথা অবগত করেন।
- (ঙ) ইতোমধ্যে প্রদত্ত সরকারি নির্দেশনার প্রতি অনুগত হয়ে কাথলিক চার্চ দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলগুলো বাংলা মিডিয়ামে রূপান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

একই সভায় আরও যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা নিম্নরূপ:

- (ক) ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত সকল কমিশনের নাম “আন্তঃধর্মপ্রদেশীয়” কমিশন বলে অভিহিত হবে।
- (খ) নটর ডাম কলেজে অধ্যয়নরত সেমিনারিয়ানদের নিয়ে ইন্টারমেডিয়েট সেমিনারী স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ফাদার থিওটোনিয়াস গমেজ, সিএসসি-কে প্রথম রেক্টর হিসেবে নিয়োগদান করা হয়।
- (গ) ১৯৬৮-১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মণ্ডলীর সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ক যে জরিপ করা হয় তার ফলাফল প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- (৩) সি.বি.সি.বি-এর পরবর্তী সভাসমূহ (১৯৭২-১৯৭৭) এবং উল্লেখ্য বিশেষ ঘটনাসমূহ

- ১) শিক্ষা: “বাংলাদেশ খ্রিস্টান শিক্ষা পরিষদ”-এর সংবিধান অনুমোদন; শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় সেমিনার আয়োজন (১৯৭২); জরুরি প্রয়োজন বিধায় ঢাকাতে খ্রিস্টান হোস্টেল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত (১৯৭২)।
- ২) সেমিনারী: এ্যাড হক সেমিনারী কমিশন গঠিত হয় (১৯৭২); বনানীতে উচ্চ সেমিনারী নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় (১৯৭৩); নটর ডাম ম্যাথিস হাউসে

- উচ্চ সেমিনারি শুরু যার প্রথম পরিচালক ছিলেন ফাদার পৌলুস কস্তা (১৯৭৩); বনানীতে উচ্চ সেমিনারী স্থানান্তরিত করা হয় (১৯৭৬)।
- ৩) **সামাজিক কর্মকাণ্ড:** বিশেষজ্ঞ ফাদার রটেনবার্গ, ফাদার টিচ্ছা বালাসুরিয়া এবং ফাদার হুটার্ট-এর সহযোগিতায় দেশের নতুন পরিস্থিতি ও মণ্ডলীর করণীয়, CORR বিষয়ে সমীক্ষণ, ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয় (১৯৭২)। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই CORR জাতীয় এন.জি.ও. হিসেবে রেজিস্টার করা হয়।
- ৪) **পরিবার:** ফাদার জর্জ লোবো-এর পরিচালনায় “বিবাহ ও পরিবার বিষয়ক সেমিনার” অনুষ্ঠিত হয় (১৯৭৩); চারটি ধর্মপ্রদেশে চারদিন ব্যাপী বিবাহ ও পরিবার বিষয়ের উপর চারটি কোর্স আয়োজন করা হয় (১৯৭৩)।
- ৫) **সি.বি.সি.বি:** নিয়মাবলি প্রণয়ন (১৯৭২) ও অনুমোদন (১৯৭৩) করা হয়; সেক্রেটারি হিসেবে ব্রাদার জর্জ নোয়াক্স সিএসসি-কে মনোনয়ন দান করা হয় (১৯৭৩); বাংলাদেশের প্রথম কাথলিক ডিরেক্টরী প্রকাশ করা হয় (১৯৭৩)।
- ৬) **ভাটিকানের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক:** বাংলাদেশে প্রথম এ্যাপস্টলিক প্রো-নুনসি হিসেবে পরম শ্রদ্ধেয় এডোয়ার্ড ক্যাসেডিকে নিয়োগ করা হয় (২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩)।
- ৭) **যাজকদের নবীকরণ:** নটর ডাম কলেজে, বাংলাদেশে যাজকদের নবীকরণের জন্য দুই দলে বিভক্ত হয়ে ১৫ দিন ব্যাপী দুটো কোর্সের আয়োজন করা হয়। পরিচালনায় ছিলেন ফিলিপাইনের ই.এ.পি.আই-এর অধ্যাপকবৃন্দ (১৯৭৪)।
- ৮) **কমিশন ও সংগঠন:** সর্বমোট ৯ টি কমিশন/সংগঠনের সাথে দু’দিন ব্যাপী সভা করা হয়। উদ্দেশ্য: দায়িত্ব আরও সুনির্দিষ্টকরণ ও তাদের কাজে সক্রিয়করণ (১৯৭৬)।
- ৯) **সি.বি.সি.বি-এর পালকীয় পত্র:** “খ্রিস্টীয় বিবাহ ও পরিবার”, ১২ জুন, ১৯৭৭। এই পালকীয় পত্রে *Humanae Vitae* (1968) নামক পোপ ষষ্ঠ পলের বিশ্বজনীনপত্রকে ভিত্তি করে দায়িত্বশীল পিতামাতা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক পদ্ধতি বিষয়ে মণ্ডলীর শিক্ষা তুলে ধরা হয়।
- ১০) **বিশপদের এক্সপোজার:** বাংলাদেশের কাথলিক বিশপগণ (সাথে ছিলেন বিশপ বার্নাবাস দ্বিজেন মণ্ডল) বরিশাল অঞ্চলে পাঁচ দিনের একটি এক্সপোজার প্রোগ্রাম করেন যখন তাঁরা মুসলমান ও হিন্দু পরিবারে ২ দিন ও ২ রাত দিন পারিবারিক পরিবেশে বাস করেন ও রাত কাটান।

দ্বিতীয় কার্যকাল: ১৯৭৮-২০০৫ (২৭ বছর)

কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সদস্য

সভাপতি: আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও (১৯৭৮-২০০৫)

সেক্রেটারি জেনারেল: বিশপ মাইকেল ডি'রোজারিও, সিএসসি, খুলনার বিশপ (১৯৭০-১৯৮৭);

বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি (১৯৮৭-)

বিশপ সদস্য: আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও, ঢাকার আর্চবিশপ (১৯৬৮/১৯৭৮-২০০৫); চট্টগ্রামের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি (১৯৬৮-১৯৯৪ + ১৯৯৪-১৯৯৬); বিশপ মাইকেল ডি'রোজারিও, সিএসসি, খুলনার বিশপ (১৯৭০-২০০৫); বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ, দিনাজপুর (১৯৭৮-১৯৯৬) সহকারী ঢাকা (১৯৯৬-); বিশপ ফ্রান্সিস গমেজ, ময়মনসিংহ (১৯৮৭-); বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, রাজশাহী (১৯৯০-১৯৯৫), চট্টগ্রাম (১৯৯৫-); বিশপ পৌলিনুস কস্তা, রাজশাহী (১৯৯৬-); বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি, দিনাজপুর (১৯৯৬-)

পোপের প্রতিনিধি: আর্চবিশপ এডোয়ার্ড ইদ্রিস ক্যাসেডি (১৯৭৩-১৯৭৯); আর্চবিশপ লুইজি আক্কোলী (১৯৭৯-১৯৮৯); আর্চবিশপ পিয়োরো বিজ্জ (১৯৮৯-১৯৯২); আর্চবিশপ আদ্রিয়ানো বেরনার্দিনি (১৯৯২-১৯৯৬); আর্চবিশপ এডোয়ার্ড এ্যাডামস (১৯৯৬-২০০২); আর্চবিশপ পল সাংগ-ইন-নাম (২০০৩-২০০৭)।

পালকীয় ঘটনা ও মাইলফলক:

ক ৯ বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ ও পুরোহিতদের যুক্ত সম্মেলন, ৪-৮ই জুলাই, ১৯৭৮

পাঁচদিনের এই সম্মেলনে বাংলাদেশের বিশপগণ ও নুনসিওসহ ১৩৭ জন পুরোহিতের মধ্যে ১২২ জন অংশগ্রহণ করেন। বিষয়বস্তু ছিল: “ন্যায্যতা ও বাণীপ্রচার”। পরিচালনায় ছিলেন ঐশতত্ত্ববিদ, ফাদার ডি. এস. আমালোর পাভাদাস, এন.বি.সি.এল.সি-এর ডিরেক্টর, দক্ষিণ ভারত। সেমিনারের ফলাফল “বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ ও পুরোহিতদের যুক্ত সম্মেলনের চূড়ান্ত বিবৃতি” শিরোনামে, ৪-৮ জুলাই, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। এই বিবৃতিতে আছে: (ক)

মণ্ডলীর প্রয়োজনসমূহ: সম্মেলনের পটভূমিকা; (খ) মণ্ডলী সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি (নতুন ভিশন); (গ) কালের নিদর্শন মোতাবেক বাস্তব পদক্ষেপ; (ঘ) সুপারিশমালা: প্রাধান্য নির্ণয়করণ, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ, ন্যায্যতার জন্য সংগ্রাম করা; পুরোহিত, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করা এবং মণ্ডলীতে সংস্কৃত্যায়ন দৃশ্যমান করা। মণ্ডলীর নবায়নে ও ভবিষ্যতের দর্শন নির্ণয়নে উপরোক্ত পালকীয় সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে কাজ করেছে।

খ ৥ বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় পরিকল্পনা - ১৯৮৫

সি.বি.সি.বি-এর একটা যুগান্তকারী ও অনুগ্রহ-ধন্য উদ্যোগ ছিল বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য একটি পালকীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি করা হয় যাদের দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি “মাস্টার পাস্টোরাল প্লান” (এম.পি.পি) প্রস্তুত করা। প্রায় চার বছর ধরে (১৯৮২-১৯৮৫) ধর্মপল্লী পর্যায়ে থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত এবং বিভিন্ন কমিশন/সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালার মধ্য দিয়ে প্রস্তুতির কাজ অব্যাহত থাকে। এই সময়ে প্রায় প্রতিটি সি.বি.সি.বি-এর সভায় উত্থাপিত বিষয়সমূহ ও মতামত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়।

পরিশেষে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের পঞ্চশতমি পর্ব দিনে, সি.বি.সি.বি কর্তৃক “বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় পরিকল্পনা” শিরোনামে পালকীয় দলিলটি বাংলা ও ইংরেজীতে প্রকাশ করা হয়। উক্ত পালকীয় দলিলে যে বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ নিম্নে করা হল:

ভূমিকা: বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা

(ক) বাংলাদেশে সন্তানদের ঘিরে স্বর্গীয় পিতার প্রেমময় পরিকল্পনা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত রয়েছে; (খ) বাংলাদেশে পরিপক্ব মণ্ডলীর জন্য ঐশ অনুগ্রহের এক নতুন মুহূর্ত সন্নিবৃত্ত: শিশুকাল, সাবালকত্ব লাভ করার পর একটি পরিপক্ব যুগে মণ্ডলীর প্রবেশ।

১। বাংলাদেশের সমাজ ও মণ্ডলীর যুগলক্ষণসমূহ

ক) উদ্বেগপূর্ণ যুগলক্ষণগুলো হচ্ছে: (১) চরম দুঃখ-দুর্দশা, নিরক্ষরতা ও অন্যায্যতা; (২) মৌলিক ক্ষমতা ও অধিকার ক্ষুণ্ণ; (৩) জনসংখ্যা স্ফীতি; (৪) ধর্ম ও নীতির প্রতি উদাসীনতা; (৫) বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও বিভেদ; (৬) মণ্ডলীতে সবার যথার্থ স্বকীয় ভূমিকার অভাব; (৬) আত্মকেন্দ্রিক

আধ্যাত্মিকতা; (৭) সাম্প্রতিক উন্নতির কুফল: উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বঞ্চিত।

খ) আশাব্যঞ্জক যুগলক্ষণগুলো হচ্ছে: (১) দুর্যোগের অন্তরালে নিস্তারের প্রতিশ্রুতি: আশাব্যঞ্জক যুগলক্ষণ এবং মণ্ডলী প্রত্যাশার চিহ্ন; (২) দরিদ্রদের সাথে একাত্মতা; (৩) বৃহত্তর ভ্রাতৃসমাজ গঠনের প্রচেষ্টা; (৪) মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে নবজাগরণ; (৫) দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পদ; (৬) পার্থিব আশীর্বাদসমূহ ঈশ্বরের যত্নশীলতার পরিচয়; (৭) জনসংখ্যা দেশের সম্পদ; (৮) শিশু ও যুবসমাজ।

২। পালকীয় অগ্রাধিকার: মূলতঃ পাঁচটি পালকীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়:

- (১) ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মানসে মানুষের দুঃখ ও দুর্দশা নিরাময় করা;
- (২) মিলন ও মিলন-সমাজ প্রতিষ্ঠা করা: অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে, অন্য মণ্ডলীর ভক্তদের সঙ্গে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা;
- (৩) মণ্ডলীর অভ্যন্তরে সহভাগিতা/মিলন ও মিলন-সমাজ: যাজকমণ্ডলী, সন্ন্যাসব্রতী মণ্ডলী ও জনমণ্ডলীর মধ্যে জীবন ও কাজের মিলন ও একাত্মতা;
- (৪) সংস্কৃতায়ন: কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা; সকল জাতি ও কৃষ্টির মানুষের কাছে মঙ্গলসমাচার, অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টকে ঘোষণা করা;
- (৫) গঠন: খ্রিস্টযিশুর শিষ্যত্বে গঠন – মঙ্গলসমাচারের বর্ণিত সুখী/ধন্য হওয়ার বাণী (অষ্টকল্যান বাণী) অনুসারে।

৩। প্রধান লক্ষ্য: মিলন ও মিলনসমাজ গড়ে তোলা

৪। পালকীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রথম অগ্রাধিকার : গঠন

(ক) অগ্রাধিকারগুলো সম্বন্ধে অবগত হওয়া; (খ) গঠনমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন করা; (গ) অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দল গঠন করা; (ঘ) মৌলিক সমাজ গঠন করা; (ঙ) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে (অর্থায়ন সহ) গঠন দান করা; (চ) প্রত্যেক প্যারিশে ও ধর্মপ্রদেশে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৫। পালকীয় পরিকল্পনায় মৌলিক আধ্যাত্মিক সাধনা

আত্মশুদ্ধি, ক্ষমা, পুনর্মিলন, মৌলিক প্রলোভনগুলো চিহ্নিত করা; মিলন ধ্যানে ভাইবোনদের সাথে একাত্মতা; আশীর্বাদ ও দুঃখের মধ্যে মিলন ও একাত্মতা। মিলনের আধ্যাত্মিকতা।

গ ॥ বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর পালকীয় সংলাপ বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা – ১৯৯৫

“বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় পরিকল্পনা-১৯৮৫” প্রকাশের দশ বছরের মাথায় সি.বি.সি.বি আরেকটি পালকীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগটি অভিহিত হয়েছে পালকীয় সংলাপ নামে। জাতীয় একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় বরিশালে ১৮-২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে। উদ্দেশ্য ছিল: “বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় পরিকল্পনা-১৯৮৫” কতটুকু কার্যকর ও বাস্তবায়ন হয়েছে তা তৃণমূল পর্যায়ে থেকে শুরু করে পালকীয় সংলাপের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা এবং পরবর্তী ধাপের জন্য প্রেরণবাণী নির্ধারণ করা। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি ধর্মপ্রদেশে একটি করে মোট ছ’টি কর্মশালা, এবং জাতীয় পর্যায়ে ৭ম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সি.বি.সি.বি. কর্মশালার ফলাফল নিম্নোক্ত পালকীয় দলিলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন।

পালকীয় দলিল: বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর পালকীয় সংলাপ: জাতীয় কর্মশালার চূড়ান্ত ঘোষণা, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ১ অক্টোবর, ১৯৯৬, বাংলাদেশ

১) বাংলাদেশ মণ্ডলীর মিশন

- (১) ঐশ্বর্য্য ধ্যান, প্রার্থনা, পবিত্র উপাসনা ও সংস্কারীয় জীবনযাপনে এবং ধর্মবিশ্বাসে গঠিত হয়ে খ্রিস্টের প্রকৃত শিষ্যত্ব লাভ করতে প্রেরিত।
- (২) খ্রিস্টীয় আদর্শে পারিবারিক জীবন গঠন ও যাপন করতে এবং মৌলিক সমাজের মিলনের জীবনযাপন প্রণালীতে ধর্মপল্লীকে মিলন-সমাজে গড়ে তুলতে প্রেরিত।
- (৩) ধ্যান, মিলন ও একাত্মতার আধ্যাত্মিকতায় গঠিত যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী ব্যক্তি ও সংঘ হয়ে নিঃস্বার্থ সেবাকাজে মগ্ন হতে প্রেরিত।
- (৪) অন্য মণ্ডলী এবং অন্য ধর্ম ও কৃষ্টির ভাইবোনদের মাঝে সংলাপে ও বাণীপ্রচারে ব্রতী হতে প্রেরিত।
- (৫) মণ্ডলীর ও দেশের শিক্ষা-কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু, কিশোর ও যুব সমাজকে উপযুক্ত শিক্ষা ও গঠন দান করতে আমরা প্রেরিত।
- (৬) সবার প্রতি বিশেষভাবে দীনতম ভাইবোনদের প্রতি দয়া, ন্যায় ও শান্তি এবং মানব-উন্নয়নের সেবাকাজে নিযুক্ত হতে প্রেরিত।

২) ফোকাস: পরিবার ও মৌলিক সমাজ

৩) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: ১৯৯৬-২০০০ খ্রিস্টাব্দ

মহান জুবিলী আসন্ন (১৯৯৬); খ্রিস্টে আমরা দীক্ষিত (১৯৯৭); আত্মায় আমরা এক (১৯৯৮); স্বর্গীয় পিতার দিকে আমাদের যাত্রা (১৯৯৯); মহান জুবিলী : মিলন উৎসব (২০০০)।

পালকীয় পত্র: প্রতিবছরই সি.বি.সি.বি মূলভাবের উপর ভিত্তি করে পালকীয় পত্র প্রকাশ করেন এবং জনগণকে মহান জুবিলী-২০০০ জন্য আধ্যাত্মিক ভাবে প্রস্তুতি দান করেন।

ঘ ॥ নতুন সহস্রাব্দের নবচেতনায় খ্রিস্টীয় জীবন ও সেবার গভীরে যাত্রা -২০০১

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের পরিসমাপ্তিতে, বাংলাদেশের বিশপগণ, বিশ্বজনীন মণ্ডলীর প্রধান, পোপ মহোদয়ের বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তৃতীয় সহস্রাব্দের উষালগ্নে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে, ময়মনসিংহে একটি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেন। সকল ধর্মপ্রদেশ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী, কমিশন/সংগঠন, সেবাকর্মী, প্রভৃতির প্রতিনিধিদের নিয়ে উক্ত সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সম্মেলনের আলোকে সিবিসিবি একটি পালকীয় প্রেরণাপত্র প্রকাশ করেন। সংক্ষেপে প্রেরণাপত্রের মূল বিষয় ছিল:

- (১) বাংলাদেশে বৃহত্তর সমাজে মিলনের কৃষ্টি গঠন
ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের মধ্যে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অঙ্গনে, পুরুষ ও নারীর সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়, সমাজ ও শিশু-কিশোর-যুবদের মধ্যে, এবং প্রযুক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে মিলন ও একাত্মতা;
- (২) বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জীবন ও সেবার গভীরে যাত্রায় মিলন ও মিলনসমাজ গঠন করা
ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে মিলন; পরিবারের মধ্যে মিলন; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে মিলন; ধর্মপল্লী, অঞ্চল ও ধর্মপ্রদেশে মিলন; যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের মধ্যে মিলন; খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য।
- (৩) তৃতীয় সহস্রাব্দে বাংলাদেশে মঙ্গলবাণী ঘোষণা: উপরোক্ত দু'ভাবে

পালকীয় প্রেরণাপত্র: নতুন সহস্রাব্দের নবচেতনা : খ্রিস্টীয় জীবন ও সেবার গভীরে যাত্রা, সিবিসিবি, প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্ব, ২০০২

ঙ ॥ অন্যান্য বিশেষ ঘটনা ও সিদ্ধান্তসমূহ (১৯৭৮-২০০৫)

পোপ দ্বিতীয় জন পলের বাংলাদেশ সফর (১৯৮৬)। উনি ছিলেন দ্বিতীয় পোপ যিনি বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় ও পালকীয় সফর করেছেন ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর। এরশাদ আর্মি স্ট্যাডিয়ামে ৫০ হাজার খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য খ্রিস্টযাগ অর্পন করেন, ১৮ জন ডিকনকে যাজকীয় অভিষেক প্রদান করেন; জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলিপন, বিশপ ও প্রেসিডেন্টের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ, নাগরিক সমাবেশে দেশের পাঁচ হাজার বিশিষ্টজনদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বাংলাদেশ পালকীয় পরিকল্পনা-১৯৮৫-এর আলোকে “মিলন ও ভ্রাতৃসমাজ” ছিল তাঁর সফরের মূলসুর।

পুণ্যপিতার এই সফরের ফলে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতা, আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক, মণ্ডলীর সাংগঠনিক দক্ষতা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুদূর প্রভাব বিস্তার করেছে।

সিবিসিবি সেক্রেটারিয়েট: জাতীয় সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় (১৯৭৮); ব্রাদার জর্জাদ ডি'সুজা, সিএসসি সেক্রেটারি হিসেবে সাময়িকভাবে নিযুক্ত হন। “বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ ও পুরোহিতদের যুক্ত সম্মেলন, ৪-৮ জুলাই, ১৯৭৮” ফলশ্রুতিতে বনানী সেমিনারীতে “জাতীয় পালকীয় সেবাকেন্দ্র”, (এন.সি.পি.এস) জন্ম গ্রহণ করে। এন.সি.পি.এস-এর কার্যক্রম ও সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করা হয় (১৯৭৮); সি.বি.সি.বি সেক্রেটারিয়েট গঠনের উদ্দেশ্যে এন.সি.পি.এস-এর অবিলুপ্তি (১৯৮২); সিবিসিবি সেক্রেটারিয়েট গঠন এবং সেক্রেটারি হিসেবে সি. মেরী বুস, সিএসসি-এর নিয়োগ (১৯৮৪); সিবিসিবি-এর প্রথম সহকারী সেক্রেটারি রূপে একজন পুরোহিতকে নিয়োগ দান (২০০৪)।

কমিশন/সংগঠন: শিক্ষা ও কাটেথেটিকাল কমিশন পুনর্গঠন করা হয় (১৯৭৮); কাথলিক যুব সেবাদল গঠন করা হয় (১৯৭৯); সিবিসিবি ও সকল কমিশন, এনসিপিএস ও অন্যান্য সংগঠনের সেক্রেটারি/ডিরেক্টর সাথে যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয়বস্তু: কমিশনের প্রতিবেদন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, এনসিপিএস ও কমিশন এবং এনসিপিএস ও সিবিসিবি মধ্যে সমন্বয় প্রসঙ্গে (১৯৭৮-১৯৮২); এ্যাপিসকপাল কমিশনগুলোর পুনর্গঠন ও সংবিধান প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয় (২০০৩-২০০৪)।

সেমিনার ও কর্মশালা: বিসিসি/বিএসসি/বিইসি: চারদিন ব্যাপী জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয় ঢাকা ও বরিশালে। পরিচালনায় ছিলেন ফিলিপাইন, ইনফান্টার বিশপ লাভায়েন ও ফাদার ডেসমণ্ড ডি'সুজা (১৯৮২)।

বর্ষ উদ্‌যাপন: “পুন্যবর্ষ: পুনর্মিলন” (১৯৮৩); “কুমারী মারীয়ার বর্ষ” (১৯৮৪); “খ্রিস্টপ্রসাদ বর্ষ” (২০০৪-২০০৫); “সাধু পলের বর্ষ” (২০০৮); ইত্যাদি।

বিবাহ সংক্রান্ত আদালত: বিবাহ সংক্রান্ত মণ্ডলীর আদালত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়; চারটি ধর্মপ্রদেশকে নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শুনানীর জন্য দুটো আদালত গঠন করা হয় (১৯৮৩); পরবর্তীতে দুটো আঞ্চলিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় (২০০৪)

স্থানীয় মণ্ডলীর ভাবনায় গভীরায়ন: এই সময়কালে মণ্ডলীর নবায়ন, সাংগঠনিক চেতনা ও ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়: মণ্ডলীর অভ্যন্তরীণ জীবন, সেবা, পালকীয় বিষয় ও কার্যক্রম নিয়ে ভাবনা খুবই জোরদার করা হয়।

তৃতীয় কার্যকাল: ২০০৫-২০১১ (৬ বছর)

কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সদস্য

সভাপতি: আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা

সেক্রেটারি জেনারেল: বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ, সিএসসি (১৯৮৭-২০০৭);

বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি (২০০৭-)

বিশপ-সদস্য: আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা, রাজশাহী (১৯৯৬-২০০৫) + ঢাকা (২০০৫-২০১১); বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ (১৯৭৮-১৯৯৬) + ঢাকার সহকারী (১৯৯৬-); বিশপ ফ্রান্সিস গমেজ, ময়মনসিংহ (১৯৮৭-২০০৬); বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, রাজশাহী (১৯৯০-১৯৯৫) + চট্টগাম (১৯৯৫-২০১০); বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি, দিনাজপুর (১৯৯৬-); বিশপ বিজয় এন. ত্রুজ, ওএমআই, খুলনা (২০০৫-); বিশপ পল পনেরন কুবি, সিএসসি (২০০৬-) বিশপ জের্ডাস রোজারিও, রাজশাহী (২০০৭-)। সিলেট ধর্মপ্রদেৱে ১ম বিশপ বিজয় এন. ত্রুজ, ও.এম.আই (২০১১)।

পোপের প্রতিনিধি: আর্চবিশপ যোসেফ মারিনো (২০০৮-২০১৩)

পালকীয় বিশেষ ঘটনা:

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর ত্রিবার্ষিক পালকীয় পরিকল্পনা : ২০১১-২০১৩

সি.বি.সি.বি মনে করেছিলেন যে বাংলাদেশ মণ্ডলীর মধ্যে যে পালকীয় পরিকল্পনার ধারা শুরু হয়েছে তা অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজন: পালকীয় পরিকল্পনা নিয়ে আসে মিলন ও ঐক্য, একসঙ্গে পথচলার মনোভাব ও প্রক্রিয়া; মণ্ডলীর ভিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সহায়তা। প্রতিবছর একটি মূলভাব নিয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনেকে উপলব্ধি করেছেন। এ কারণে বাংলাদেশের বিশপগণ ত্রিবার্ষিক একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন এবং সেই সম্বন্ধে একটি ধারণাপত্র প্রকাশ করেছেন।

পালকীয় পত্রটি হল: “নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়া: ২০১১-২০১৩ – ত্রিবার্ষিক পালকীয় পরিকল্পনার ধারণাপত্র”, সি.বি.সি.বি., প্রকাশ: ২১শে নভেম্বর, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ।

উক্ত পালকীয় পরিকল্পনার ধারণাপত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি:

ক ॥ পালকীয় পরিকল্পনা: প্রারম্ভিক কথা

- (১) পালকীয় পরিকল্পনার মূলভাব: “নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়া”; (২) পালকীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য: “স্থানীয়” মণ্ডলী হওয়া (৩) নতুন প্রক্রিয়ার অর্থ: “ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন”।

খ ॥ ত্রিবার্ষিক (২০১১-২০১৩) পালকীয় পরিকল্পনার দিক-দর্শন ও কর্মসূচী (ক) ত্রিবার্ষিক পালকীয় কর্মসূচীর দর্শন

ঈশ্বরের আত্মার আবেশে পৃথিবীর এবং আমাদের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের, ভূ-প্রকৃতির ও মানুষের জাগতিক-আত্মিক সংস্কৃতির নবরূপ ধারণ: “আমি এক নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবী দেখতে পেলাম।” (প্রত্যাদেশ ২১:১)

(খ) পালকীয় পরিকল্পনায় বর্ণিত ত্রিবিধ কার্যক্রম:

ভূ-প্রকৃতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা ও অনুরাগ বৃদ্ধি করা; “গৃহ-সমাজ” ও “ক্ষুদ্র সমাজ” সক্রিয় করা; “সেবাকারী ব্যক্তি ও সমাজ” রূপে পরিপক্ব হওয়া।

(গ) পালকীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যস্থল

খ্রিস্টীয় হওয়া আমাদের লক্ষ্যস্থল। মাণ্ডলীক জীবনাচরণ আরও সক্রিয় করার জন্য প্রতি বছর বাৎসরিক মূল ভাব নিয়ে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা এবং কর্মকাণ্ড গ্রহণ করব; তবে, তা ক্ষুদ্র মৌলিক সমাজ এবং পরিবারে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, তা হবে অন্যতম চূড়ান্ত লক্ষ্য।

১ম বছরে (২০১১) ধর্মীয় ও কৃষ্টিয় মূল ধারা: সৃষ্টি, কৃষ্টি ও ধর্ম

মূল আলোচ্যবিষয়: আমাদের ধর্মীয় ও কৃষ্টিয় মূল ধারা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও দিকদর্শন; এবং কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ভূ-প্রকৃতি, সার্বিক জনগোষ্ঠী, খ্রিস্টমণ্ডলী, বিভিন্ন সমাজ, ক্ষুদ্র মৌলিক সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির ভূমিকা কী তা নির্ধারণ করা।

২য় বছরে (২০১২) ব্যক্তি ও সমাজের মূল ধারা।

মূল আলোচ্য বিষয়: আমাদের জীবনে বিভিন্ন ধাপে সামাজিকতা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও দিকদর্শন, এবং বৃহত্তর সমাজগুলোর মাঝে বিশেষভাবে মূলে ক্ষুদ্র মৌলিক সমাজগুলোকে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে গড়ে তোলা।

৩য় বছরে (২০১৩/২০১৪): সেবাকারী হওয়ায় মূল পরিপক্বতা।

মূল আলোচ্য বিষয়: খ্রিস্টীয় পরিপক্বতা লাভের লক্ষ্যে আমরা কীভাবে দক্ষ “সেবাকারী ব্যক্তি ও সমাজ” হয়ে উঠতে পারি, তা নিয়ে পর্যালোচনা ও দিকদর্শন; এবং তা বাস্তবায়নে খ্রিস্টমণ্ডলীতে জীবন আহ্বান অনুসারে সবারই ভূমিকা, বিশিষ্টভাবে মৌলিক খ্রিস্টীয় সমাজ, পরিবার ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি পর্যায়ে।

অন্যান্য পালকীয় বিশেষ ঘটনাসমূহ

- ধন্যশ্রেণিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার সূচনা: আর্চবিশপ টি.এ. গান্ডুলী, সিএসসি (২০০৬) ব্রাদার ফ্লেভিয়ান লাপ্পান্ট, সিএসসি (২০০৭)
- কমিশন/সংগঠনের সেক্রেটারিদের প্রশিক্ষণ (২০০৯)
- পোপীয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ দপ্তরের প্রিফেক্ট কার্ডিনাল জন-লুইস তোরানের বাংলাদেশ আগমন (২০১০)
- জাতীয় কর্মশালা আয়োজন – বিষয়: “ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ” – এস.সি.সি (২০১০)
- মণ্ডলীর আইন সংশ্লিষ্ট বিধি বিষয়ে সিবিসিবি’র সম্পূরক নিয়ম-মালা প্রস্তুতি (২০১০-২০১১)
- শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত (২০১১)
- পবিত্র ক্রুশ সংঘ কর্তৃক নটর ডাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত (২০১১)

চতুর্থ কার্যকাল: ২০১১-২০২০ (৯ বছর)

কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সদস্য

সভাপতি: আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি’রোজারিও, সিএসসি (২০১১-২০২০)

সেক্রেটারি জেনারেল: বিশপ/আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি (২০০৭-২০২০)

বিশপ-সদস্য: আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি’রোজারিও, সিএসসি, রাজশাহী (১৯৯০-১৯৯৫) + চট্টগ্রাম (১৯৯৫-২০১০) + ঢাকা (২০১১-২০২০); বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি, দিনাজপুর (১৯৭৮-১৯৯৬) + ঢাকা, সহকারী (১৯৯৬-২০১৪); বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি, দিনাজপুর (১৯৯৬-২০১০) + চট্টগ্রাম (২০১১-২০২০); বিশপ বিজয় এন. ব্রুজ, ওএমআই, খুলনা (২০০৫-২০১১) + সিলেট (২০১১-২০২০); বিশপ পল পনেন কুবি,

সিএসসি (২০০৬-); বিশপ জের্ভাস রোজারিও, রাজশাহী (২০০৭-); বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি, সহকারী, চট্টগ্রাম (২০০৯-২০১৫) + বরিশাল (২০১৫-২০২১); বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, দিনাজপুর (২০১২); বিশপ রমেন বৈরাগী, খুলনা (২০১২); বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, সহকারী ঢাকা (২০১৭-২০২১) + সিলেট (২০২১-)।

পোপের প্রতিনিধি: আর্চবিশপ যোসেফ মারিনো (২০০৮-২০১৩); আর্চবিশপ জর্জ কোচেরি (২০১৩-২০২২)

পালকীয় বিশেষ ঘটনাসমূহ ও পালকীয় পত্র বা পালকীয় নির্দেশনা

১ ॥ বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর ত্রিবার্ষিক পালকীয় পরিকল্পনা : ২০১১-২০১৩ (চলমান)

বি.দ্র. তৃতীয় কার্যকালে গৃহীত কার্যক্রম চলমান।

পালকীয় পত্র: “বিশ্বাসবর্ষ: ২০১২-২০১৩: মানব জীবনে বিশ্বাস চিরন্তন বিষয়”, সিবিসিবি, ২০১২-২০১৩।

২ ॥ বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জাতীয় পালকীয় কর্মশালা – ২০১৮

মূলভাব: “মিলন-সমাজ : বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর সাক্ষ্যদান”, সি.বি.সি.বি, ২৮-৩১ আগষ্ট, ২০১৮

সি.বি.সি.বি পেছনের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, বাংলাদেশ মণ্ডলীতে প্রতি ১০/১২ বছর অন্তর অন্তর এক একটি বিশেষ জাতীয় পালকীয় সম্মেলন আয়োজন করা হয়। জাতীয় সম্মেলনের পরে যে দলিলটি প্রস্তুত হয় তা পরবর্তী দশকে প্রেরণামূলক ধারণা হিসেবে বাংলাদেশ মণ্ডলীর পালকীয় কর্মকাণ্ডে অনেক সহায়তা করে।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা ও এফ.এ.বি.সি-র চিন্তাভাবনার আলোকে, ইতিহাসের সাম্প্রতিক মুহূর্তে এসে বাংলাদেশ মণ্ডলী প্রশ্ন করেছে যে: “অতীতে আমরা কোথায় ছিলাম?”, “বর্তমানে আমরা কোথায় আছি?” এবং “আগামী দশকে আমরা কোথায় যাব?” এই প্রশ্ন নিয়ে – সি.বি.সি.বি তার কোর্ডিনেটিং কমিটির পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায়, ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীর বিভিন্ন পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার মাধ্যমে, একটি বছরের প্রস্তুতির পর, একটি জাতীয় পালকীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ২৮-৩১ আগষ্ট, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে।

মিলন-সমাজ রূপে বাংলাদেশ মণ্ডলী যেন সাক্ষ্যদান করতে পারে তার জন্য আগামী দশকে (২০২০-২০৩০) বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য নিম্নোক্ত পালকীয় অগ্রাধিকারসমূহ গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। এ বিষয়ে পালকীয় পত্রের মাধ্যমে অগ্রাধিকারগুলো বাংলাদেশের গোটা মণ্ডলীর জন্য ঘোষণা করা হয়।

(১) বর্তমান জগতের যুগ লক্ষণ পর্যালোচনা; (২) মঙ্গলবাণী ঘোষণা; (৩) ভালবাসা ও সেবাকাজ; (৪) বিবাহ ও পরিবার; (৫) মৌলিক খ্রিস্টসমাজ: মঙ্গলবাণী ঘোষণার নবজাগরণ; (৬) পবিত্র আত্মার দান: “বহু” ও “এক” এবং কর্তৃপক্ষ ও আত্মিক শক্তি; (৭) আধুনিক জগতে ও কালে পবিত্র হওয়ার আহ্বান: “আনন্দ কর ও উল্লসিত হও”; (৮) অভিবাসন ও শরণার্থী; (৯) শিক্ষা ও গঠনের লক্ষ্য: মানব-ভ্রাতৃত্ব; (১০) শিশুদের সুরক্ষা; (১১) সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষা ও যত্ন; (১২) যোগাযোগ মাধ্যম।

৩ ॥ অন্যান্য বিশেষ ঘটনাবলি (২০১১-২০২০)

নীতিমালা: উপাসনার নীতিমালার প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ (২০১০-২০১১); যাজকদের আচরণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন (২০১০); নাবালকদের প্রতি যৌন অপরাধ বিষয়ক নীতিমালা (২০১২-২০২০); পাস্টোরাল গাইডলাইনস্ (২০১৪); চার্চ পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি নীতিমালা (২০১৫-২০২০); শিশুদের সুরক্ষা নীতিমালা (২০১৮-২০২০); প্রকৃতি ও পরিবেশের যত্ন সম্পর্কে নির্দেশনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন (২০১৫-২০২০), ইত্যাদি।

গঠন-প্রশিক্ষণ: ভক্তজনগণ বিষয়ক বার্ষিক গঠন-প্রশিক্ষণ কোর্স (সর্বমোট ৮ টি); নারী বিষয়ক বার্ষিক প্রশিক্ষণ (সর্বমোট ৭ টি); খ্রিস্টান সংগঠন বিষয়ক বার্ষিক সেমিনার (সর্বমোট ৪ টি); ভক্তজনগণ বিষয়ক ৯ টি সেমিনার (২০১৫); আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক বার্ষিক গঠন-প্রশিক্ষণ কোর্স অব্যাহত আছে; যুবদিবস পালন, শিশুমঙ্গল সংস্থা, লেখক সম্মেলন, ন্যায় ও শান্তি কমিশনের ডেস্কগুলি স্থাপন ও সেমিনার, উপাসনা, পরিবার, স্বাস্থ্য ও প্রতিবন্ধী বিষয়ক প্রোগ্রাম, ইত্যাদি।

কার্ডিনাল মনোনয়ন: আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি-কে পোপ ফ্রান্সিস কার্ডিনাল হিসেবে নিয়োগ করেন। ঘোষণা: ৯ অক্টোবর, ২০১৬; কার্ডিনাল কলেজে অধিষ্ঠান (১৯ নভেম্বর, ২০১৬); রমনায় সম্বর্ধনা রমনা (ডিসেম্বর ৯, ২০১৬); নুনসিওর সম্বর্ধনা (ডিসেম্বর ১৪, ২০১৬); নাগরিক সম্বর্ধনা (২১ ডিসেম্বর ২০১৬)।

পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশ সফর (প্রস্তুতি শুরু ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে; নভেম্বর ৩০-ডিসেম্বর ২, ২০১৭): নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে পোপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশের বিমানযোগে

মিয়ানমার থেকে ঢাকাতে আগমন করেন। “শান্তি ও সম্প্রীতি”র মূলভাব নিয়ে তাঁকে রাষ্ট্রীয় ও পালকীয় সফরে বরণ করে নেওয়া হয়; সাভারের স্মৃতিসৌখ পরিদর্শন; বঙ্গবন্ধুর যাদুঘর পরিদর্শন; প্রেসিডেন্ট ভবনে রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় প্রথম দিনে। ১লা ডিসেম্বর, দ্বিতীয় দিনে: সোহরাওয়ার্দি ময়দানে প্রায় লাখো মানুষের সমাবেশে খ্রিস্টযাগ অর্পণ ও ষোলজন ডিকনকে যাজকীয় পদে অভিষেক প্রদান; প্রধানমন্ত্রীর সাথে নুনসিও ভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ; ঢাকার আর্চবিশপ ভবনে খ্রিস্টীয় নেতৃবৃন্দদের সাথে সাক্ষাৎ; বিশপগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ; নাগরিক সমাবেশে আন্তঃধর্মীয়, আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রার্থনা; এবং রোহিঙ্গাদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের কথা শ্রবণ। ২ ডিসেম্বর তৃতীয় দিনে: তেজগাও-এ অসুস্থ ও অনাথদের পরিদর্শন; উপস্থিত স্থানীয় ও অতিথি বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও গঠনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ; নটরডাম কলেজে দশ হাজার যুবক-যুবতীদের সাথে সাক্ষাৎ ও পরবর্তীতে বিদায় সম্বর্ধনা। পোপ ফ্রান্সিস জাতি-ধর্ম-বর্ণ-কৃষ্টি নির্বিশেষে আধ্যাত্মিকতা, শান্তি ও সম্প্রীতি, মিলন ও ঐক্য, এবং মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধের সাক্ষ্য রেখে গেছেন যা মণ্ডলীকে সর্বদা প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে। পোপ ফ্রান্সিস দেশে-বিদেশে সকল মানুষের কাছে খ্রিস্টবাণী ও জীবন মূল্যবোধ প্রচার করে গেলেন তাদেরই একজন কাছের মানুষ হয়ে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পোপ মহোদয় বাংলাদেশের বিশপদের ভূয়সী প্রশংসা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন এ কারণে যে এতো বছর ধরে বাংলাদেশ মণ্ডলী তার গৃহীত পালকীয় পরিকল্পনা খুবই সমন্বয়যোগী ও সক্রিয় ক’রে ধারাবাহিকতার সাথে অব্যাহত রেখেছেন। এ দৃষ্টান্ত তাঁর মতে গোটা মণ্ডলীতে একটি বিরল ঘটনা।

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম আর্চডাইয়েসিস মর্যাদায় উন্নীত এবং বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি-কে, আর্চবিশপ পদে মনোনয়ন ও অধিষ্ঠান (২০১৭); চট্টগ্রাম দিয়াঙ-এ খ্রিস্টানদের উপস্থিতিতর ৫০০ বছরের পূর্তি উদ্‌যাপন (২০১৮); করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার পর স্ট্রোকের কারণে আর্চবিশপ মজেস কস্তা, এ.এস.সি.-এর মৃত্যুবরণ (১১ জুলাই, ২০২০)।

কার্ডিনালদের সফর: ঢাকা ডাইয়েসিসের ১২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পোপের বিশেষ দূত হয়ে কার্ডিনাল মার্কির সফর (২০১২); রাজশাহী ডাইয়েসিসের রজতজয়ন্তীতে, বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার প্রিফেক্ট, কার্ডিনাল ফিলেনির সফর ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং পোপ মহোদয়ের আগমনের জন্য প্রধানমন্ত্রির মৌখিক আমন্ত্রণ (২০১৫); আন্তর্জাতিক কারিতাসের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল আন্তনিও টাগলের সফর (২০১৮) এবং এফ.এ.বি.সি.-এর প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল চার্লস বো ও কার্ডিনাল টাগলের সফর: কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ; এবং চট্টগ্রাম কাথিড্রালে ও ঢাকার তেজগাওতে খ্রিস্টভক্তদের সঙ্গে খ্রিস্টযাগ অর্পণ (জুলাই ২৮-আগষ্ট ১, ২০১৯)।

কোভিড-১৯ মহামারি: সি.বি.সি.বি.-এর প্রেরণায় কোভিড-১৯ মহামারীতে (২০১৯-২০২২) আক্রান্ত জনগণের জন্য প্রতিটি ধর্মপ্রদেশ, কারিতাস ও অন্যান্য সংগঠন কর্তৃক ত্রাণ কার্যক্রম ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা হয়। দু'বছরে গোটা মণ্ডলী, সি.বি.সি.বি ও তার কমিশন ও সংগঠনের বহু কার্যক্রম করোনা ভাইরাসের কারণে ব্যহত হয় এবং অনেক মিটিং, প্রার্থনা ও উপাসনা ভাটুয়ালে অনুষ্ঠিত হয়।

যাদুঘর: বনানী সেমিনারীতে পোপ ফ্রান্সিস নামে জাতীয় খ্রিস্টান যাদুঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রক্রিয়া শুরু (২০১৮-)।

তীর্থযাত্রা: পাদুয়ার সাধু আন্তনির দেহাবশেষের প্রদর্শন ও খ্রিস্টানদের তীর্থযাত্রা (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭); ঐতিহ্যগত কৃষ্টি ও ধর্মীয় স্থানে সি.বি.সি.বি.-এর তীর্থযাত্রা, নভেম্বর ২০২০, (স্থান: খুলনা কাথিড্রাল ও ভবরপাড়া প্যারিশ, টুঙ্গিপাড়া, মুজিব নগর, ঝর্ণা গ্লোরিয়া সরকার,এম.পি-এর গ্রাম লাউডুবি, মংলা-সুন্দরবন, কপোতক্ষ নদীর তীরে মধুসূধন দত্তের বাড়ি, রবীন্দ্রনাথের কুটিবাড়ী, ষাট গম্বুজ মসজিদ, খান জাহান আলীর মাজার, লালন শাহ্ দরবার, কুষ্টিয়ার চার্চ অব বাংলাদেশ, বনপাড়া - রাজশাহী), ইত্যাদি।

সৌজন্য সাক্ষাৎ: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সি.বি.সি.বি. প্রতিনিধিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ। উপস্থিত ছিলেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক, আর্চবিশপ বিজয়, আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী (নুনসিও) এবং বিশপ শরৎ গমেজ (১২ নভেম্বর, ২০২০)।

জয়ন্তী: “প্রতিবেশী”-এর প্লাটিনাম জুবিলী (২০১৬); বি.সি.আর- ৪০ বছরের জয়ন্তী (২০১৮); জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন (২০২০-২০২২); এবং এই উপলক্ষে লাউদাতো সি’এর আলোকে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী (২০১৯-২০২১)

ইউ.এফ.সি.বি: আন্তঃমাণ্ডলিক ফোরাম হিসেবে বাংলাদেশ চার্চের তিনটি মাণ্ডলিক সংগঠন (সিবিসিবি, এনসিবি, এনসিএফবি) এই সংগঠনটি স্থাপিত হয় ২০১০ খ্রিস্টাব্দে। আজ পর্যন্ত এর কার্যক্রম অব্যহত আছে।

পঞ্চম কার্যকাল: ২০২০ -

কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সদস্য

সভাপতি: আর্চবিশপ বিজয় এন ব্রুজ, ওএমআই

সেক্রেটারি জেনারেল: বিশপ পল পনেন কুবি, সিএসসি (২০২০-)

বিশপ-সদস্য: বিশপ বিজয় এন. ত্রুজ, ওএমআই, খুলনা (২০০৫-) + সিলেট (২০১১-) + ঢাকা (২০২০-); বিশপ পল পনেন কুবি, সিএসসি ময়মনসিংহ (২০০৬-); বিশপ জের্ডাস রোজারিও, রাজশাহী (২০০৭-)। বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি, সহকারী, চট্টগ্রাম (২০০৯-) + বরিশালের বিশপ (২০১৫-) + চট্টগ্রামের আর্চবিশপ (২০২১-); বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, দিনাজপুর (২০১২); বিশপ রমেন বৈরাগী, খুলনা (২০১২); বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, সহকারী, ঢাকা (২০১৭-) + সিলেটের বিশপ (২০২১-)

পোপের প্রতিনিধি: আর্চবিশপ জর্জ কোচেরি (২০১৩-২০২২)

পালকীয় বিশেষ ঘটনাসমূহ ও পালকীয় পত্র:

- বিশপদের নিয়োগ বদলি ও কমিশনে বিশপদের দায়িত্ব পুনর্বন্টন কাজ চলমান রয়েছে।
- কভিড-১৯ মহামারির কারণে বাংলাদেশ মণ্ডলীর অনেক ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে ডিজিটাল পদ্ধতি বহুল ব্যবহার হয়েছে।
- কাথলিক চার্চ কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন (ডিসেম্বর ১০-১১, ২০২১); কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন (২০২১-২০২২); সিবিসিবি-র সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন (২০২২)।
- পোপ ফ্রান্সিসের বিশ্বজনীনপত্র “ফ্রাতেল্লি তুত্তি” অধ্যয়ন, আলোচনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে (২০২১)।
- “সাধু যোসেফ বর্ষ” উদ্‌যাপন এবং সি.বি.সি.বি.-এর পালকীয় পত্র প্রকাশ (২০২১)।
- পোপ ফ্রান্সিস ও সিবিসিবির নির্দেশনায় বাংলাদেশ মণ্ডলীর মধ্যে তিনবছর ব্যাপী (২০২১-২০২৩) মণ্ডলীর মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণ ও মিশন-এর উপর গুরুত্ব দিয়ে মণ্ডলীতে সিনড প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বিশ্বজনীন মণ্ডলীর সিনড-২০২৩-কে লক্ষ্য রেখে, ধর্মপাল-যাজক-সন্ন্যাসব্রতী-ভক্তজন একসঙ্গে পথ চলার জন্য তৃণমূল, ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ও তা চলমান রয়েছে।

উপসংহার: সি.বি.সি.বি. কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ধারা-পদ্ধতি

ক ॥ সিবিসিব-এর কর্মকাণ্ডের প্রেরণা

(১) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা: মণ্ডলীর নবায়ন

মহাসভার চারটি অধিবেশনে ষোলটি দলিল অনুমোদন করা হয়। এই দলিলগুলো হচ্ছে: চারটি সংবিধান: (১) পুণ্য উপাসনা-অনুষ্ঠান, (২) খ্রিস্টমণ্ডলী, (৩) ঐশ-প্রত্যাদেশ, (৪) বর্তমান জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান; নয়টি নির্দেশনামা: (৫) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, (৬) কাতলিক প্রাচ্য মণ্ডলী, (৭) খ্রিস্টীয় ঐক্য-প্রচেষ্টা, (৮) মণ্ডলীতে বিশপদের পালকীয় কার্যাবলী, (৯) সন্ন্যাস-জীবনের সময়োপযোগী নবায়ন, (১০) যাজকীয় গঠন, (১১) ভক্তজনগণের প্রেরিতিক কাজ, (১২) মণ্ডলীর প্রেরণাকার্য, (১৩) যাজকদের সেবাকাজ ও জীবন বিষয়ক নির্দেশনামা; তিনটি ঘোষণাপত্র: (১৪) খ্রিস্টীয় শিক্ষা, (১৫) অখ্রিস্টান ধর্মসমূহের সঙ্গে মণ্ডলীর সম্পর্ক, (১৬) ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয় ঘোষণাপত্র।

বিগত ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলীতে যে নবায়ন, পরিবর্তন ও উপযোগীকরণের ধারা চলেছে এবং এখনও অব্যাহত আছে তা উক্ত দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দ্বারা প্রকাশিত দলিলসমূহের সংবিধি, নির্দেশনা ও ঘোষণারই বাস্তবায়ন।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার চিন্তাধারার আলোকে ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পোপ মহোদয়গণ যে শিক্ষা বিভিন্ন দলিলে তুলে ধরেছেন তার প্রেরণায়ও সিবিসিবি বাংলাদেশ মণ্ডলীকে পরিচালনা দিয়েছেন।

পোপ ৬ষ্ঠ পল: *Populorum Progressio* (৩/৯/১৯৬৭), *Humanae Vitae* (১৫/৭/১৯৬৮), *Evangelii Nuntiandi* (৮/১২/১৯৭৫), পোপ ২য় জন পল: *Redemptor Hominis: Redeemer of Man* (4/3/1978), *Familiaris Consortio: Role of the Family in the World* (22/11/1981), *Christifideles Laici: Christ's Faithful - Laity* (30/12/1988), *Pastores Dabo Vobis: I Will Give Your Shepherds* (25/03/1992), *Ut Unum Sint: That they be one*, (25/5/1995), *Vita Consecrata*, (25/3/1996), *Pastores Gregis: On the Bishop* (16.10.2003), **Pope Benedict XVI** *Deus Caritas Est: God is Love*, (25/12/2005),

পোপ ফ্রান্সিসের নির্বাচন এবং তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বজনীন ও প্রেরণাপত্র বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলীতে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বিশ্বজনীন পত্র ও সিনডোত্তর প্রেরণাবাণীসমূহ হচ্ছে:

(১) “আনন্দময় মঙ্গলসমাচার” : বিষয়: “বর্তমান জগতে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা” (২০১৩); (২) “প্রভুর প্রশংসা হোক” : বিষয়: “আমাদের অভিন্ন বসতবাড়ির যত্ন” (২০১৫); (৩) “ভালবাসার আনন্দ” : বিষয়: “পরিবারে ভালবাসা” (২০১৬); (৪) “দুঃখীদের প্রতি দয়া” : বিষয়: “পূণ্য বর্ষ : দয়ার জয়ন্তী” (২০১৬); (৫) “আনন্দ করো – উল্লসিত হও” : বিষয়: “বর্তমান বিশ্বে পবিত্রতার আহ্বান” (২০১৮); (৬) “খ্রিস্ট জীবিত” : বিষয়: “যুবদের ও ঐশজনগণের নিকট প্রেরণাপত্র” (২০১৯); (৭) “সকলে ভাইবোন” : বিষয়: “দ্রাঘত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব” (২০২০)।

মাণ্ডলিক দলিল: *Code of Canon Law* (25/01/1983), *Catechism of the Catholic Church*, (11/10/1992).

(২) এশিয়া বিশপ সম্মিলনী জোট (এফ.এ.বি.সি.)

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দর্শনের আলোকে স্থানীয় মণ্ডলীতে একসঙ্গে এই দীর্ঘপথচলায় জন্য আরেকটি সংগঠন বাংলাদেশ মণ্ডলীর সহযাত্রী হিসেবে পথ চলেছে আর তা হল এশিয়ান বিশপ সম্মিলনী জোট (এফ.এ.বি.সি.)। যে সমস্ত এশিয়ার ধারণা ও কর্মপদ্ধতি সিবিসিবি-র সকল চিন্তাভাবনাকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং বাংলাদেশী মণ্ডলীর রূপকল্প বা দর্শন, পরিকল্পনা ও পদ্ধতি সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

এশিয়া মহাদেশে আছে (ক) বহু দীনমানুষ (দরিদ্রদের প্রতি অগ্রাধিকার), (খ) বহু প্রাচীন সংস্কৃতি (সংস্কৃত্যায়ন) ও (গ) বহু ধর্ম (আন্তঃধর্মীয় সংলাপ)। এই তিনটি বাস্তবতার মধ্যে এশিয়ার জনগণের সাথে বাংলাদেশ মণ্ডলী সহ-তীর্থযাত্রী। ঈশ্বরের সাথে আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দান করবে দীনমানুষের সাথে, অন্যধর্ম ও অন্যকৃষ্টির মানুষের সাথে একাত্মতা ও সংহতি।

এশিয়ার মণ্ডলীতে একটি নিজস্ব পালকীয় পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছে, যাকে বলা যায় “পালকীয় কর্মধারা পদ্ধতি”, যেখানে আছে নিম্নোক্ত ধাপগুলি: (ক) বাস্তবতা পরিদর্শন ও নিমজ্জন, (খ) সমাজ-বিশ্লেষণ এবং বাস্তবতা কীভাবে মানব-জীবনকে প্রভাবিত করে তা নিরূপণ করা, (গ) চিন্তা-ধ্যান, যার মধ্য দিয়ে সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও তাঁর কাজ আবিষ্কার করা, (ঘ) পালকীয় পরিকল্পনা, যার মধ্য দিয়ে পূর্বের তিনটি ধাপকে বাস্তব ও সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনায় বাস্তবায়ন করা।

এশিয়ার মণ্ডলীতে “এশিয়ার সমন্বিত পালকীয় পদ্ধতি” প্রেক্ষিতে এফ.এ.বি.সি.-তে এসেছে এশীয় মণ্ডলীকে “নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়া”-র আহ্বান। এই পদ্ধতি এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে মণ্ডলীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের মিলনে একটি পূর্ণ মিলনসমাজ

রূপে রূপান্তরিত করা; মৌলিক খ্রিস্টীয় সমাজ গঠনের মাধ্যমে মণ্ডলীকে অংশগ্রহণমূলক ও সহ-দায়িত্বশীল মণ্ডলী রূপে গড়ে তোলা।

এশিয়া বিশপ সম্মিলনী জোট (এফ.এ.বি.সি) কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রোগ্রামে বাংলাদেশে মণ্ডলী অংশগ্রহণ করতে শুরু করে ১৯৭০ থেকে। বিশপগণ নিয়মিতভাবে সম্মিলনীতে প্রাপ্ত দায়িত্ব অনুসারে এবং ধর্মপাল হিসেবে তাদের সহকর্মী ফাদার/ব্রাদার/সিস্টার ও ভক্তজনগণ সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামে, যেমন, বিমা, বিসা, বিলা, বিরী, বিটা, ওএইচডি, ফেইসা, ওএসসি, ইত্যাদি, এবং এফ.এ.বি.সি কেন্দ্রীয় অফিস বা অন্যান্য অফিসগুলো দ্বারা আয়োজিত সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স, ও এফ.এ.বি.সি'র সাধারণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১-২০১৬ পর্যন্ত ১১ টি সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এফ.এ.বি.সি বাংলাদেশ মণ্ডলীর মধ্যে নবীকরণ, সংস্কৃত্যায়ন এবং বিশেষ পালকীয় পদ্ধতি ব্যবহারে সহায়তা করেছে। এফ.এ.বি.সি-র পঞ্চাশ বছরের পূর্তি হয় ২০২০ খ্রিস্টাব্দে।

একদিকে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা এবং অন্যদিকে এশিয়া মণ্ডলীর চিন্তাভাবনা ও দিকদর্শন বাংলাদেশের বিশপ সম্মিলনী তথা সমগ্র বাংলাদেশের মণ্ডলীকে বিগত অর্ধশত বছরেরও অধিক সময় ধরে প্রভাবান্বিত করেছে। বিগত পঞ্চাশ বছর ও তার অধিককাল ধরে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে যে নবায়ন, উন্নতি, সাফল্য ও অর্জন হয়েছে, তা বিশ্বজনীন ও এশীয় মণ্ডলীর চিন্তাভাবনা ও দিকদর্শন ভিত্তি করে, নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও দিকদর্শন রচিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে যে-চিন্তাধার ও দিকদর্শন বাস্তবায়িত হয়েছে, তার ফসল বাংলাদেশ মণ্ডলী আনন্দের সাথে সংগ্রহ করেছে; এবং অতীতের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, বর্তমান যুগলক্ষণের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যত একসঙ্গে পথচলার চিন্তাভাবনা ও দিগনির্দেশনা অনুসন্ধান করে যাচ্ছে।

খ ॥ সি.বি.সি.বি-এর কার্যসূচি ও কর্মপদ্ধতি

(১) সিবিসিবি'র সভা প্রতিবছর ৩-৪ বার অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাগুলো বিশপদের মধ্যকার সংঘবদ্ধতা, আদান-প্রদান, সহভাগিতা, মিলন ও ঐক্য, সহযোগিতা, ইত্যাদির পরিচায়ক। বছরে এতবার সভা করা বাংলাদেশ মণ্ডলীই বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে একটি মাইলফলক হয়ে আছে।

(২) কমিশন/সংগঠনের সঙ্গে যৌথ সভা: সিবিসিবি প্রতিবছর অন্ততঃ একবার কমিশনগুলোর সাথে সম্মিলিত ভাবে সভা করে। উক্ত সভায় বিশপগণ ব্যতীত যাজক/সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের উপস্থিতি লক্ষণীয়; দেশীয়

পর্যায়ে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর দৃষ্টান্তমূলক সাক্ষ্যদান। বিশেষ প্রয়োজন ও গুরুত্ব থাকায় সিবিসিবি কয়েকটি কমিশন/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিবছর এক বা একাধিকবার যৌথ সভা করে থাকেন যেমন, কারিতাস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্যাথলিক শিক্ষা বোর্ড, পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারি, বি.সি.আর., বি.ডি.পি.এফ, ইত্যাদি।

(৩) সিবিসিবি আদ-লিমিনা ভিজিট শুরু থেকে প্রতি ৫ বছর অন্তর ও পরবর্তীতে বিগত দু'বারে ৮ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে; শেষটি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ঘটনাটি পোপ মহোদয় ও তাঁর দপ্তরগুলোর সাথে স্থানীয় মণ্ডলীর প্রধানদের মধ্যে মিলন-সাক্ষাৎ, আদান-প্রদান, পারস্পরিক অবদান সহভাগিতা এবং বিশ্বজনীন মণ্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা উদযাপন করা হয়।

(৪) মাণ্ডলিক শিক্ষা প্রচার: সিবিসিবি নিয়মিতভাবে পোপ মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বজনীনপত্র, প্রেরণাপত্র, পরিপত্রগুলো বা পোপের দপ্তর বা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত সমীক্ষা, নির্দেশনা, প্রভৃতি বিষয়, হয় নিজেরা অথবা সংশ্লিষ্ট যাজক/সন্যাসবতী/ভক্তজনগণ অথবা সংশ্লিষ্ট কমিশন/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সাথে একত্রে অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন এবং পালকীয় নির্দেশনা দান করেন। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ মণ্ডলীর কাছে বিশপগণ পালকীয় পত্র প্রেরণ করেন।

(৫) ভাটিকান কর্তৃক অথবা স্থানীয় মণ্ডলীর কর্তৃক কোন বিশেষ বর্ষ উদযাপনের জন্য অথবা দেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিষয় ভিত্তি করে সিবিসিবি সার্কুলার বা পালকীয় পত্র প্রেরণ করে থাকেন।

(৬) এফ.এ.বি.সি দ্বারা আয়োজিত বিভিন্ন প্রোগ্রামের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বিশপগণ একা, বা ভক্তজনগণ বা যাজক/সন্যাসবতীরা অংশগ্রহণ করার জন্য সিবিসিবি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(৭) মাণ্ডলিক নতুন এলাকা/ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা: সিবিসিবি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ধর্মপ্রদেশের সুপারিশ পর্যালোচনা করার পর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট মতামত পেশ করেন। বিগত পঞ্চাশ বছরে যে কয়টি নতুন ধর্মপ্রদেশ ও মহাধর্মপ্রদেশ ঘোষণা করা হয় তা হচ্ছে: ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ (১৯৮৭), রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ (১৯৯০), সিলেট ধর্মপ্রদেশ (২০১১), বরিশাল ধর্মপ্রদেশ (২০০৭-২০১৫), চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসে রূপান্তর (২০১৭)।

(৮) সিবিসিবি, গোটা বাংলাদেশে মণ্ডলীর জন্য, কোন কোন সময় দীর্ঘমেয়াদী আবার কোন সময় স্বল্পমেয়াদী, অনেকের অংশগ্রহণে ও প্রস্তুতিতে পালকীয় পরিকল্পনা, নির্দেশনা, পালকীয় পত্র ও বাস্তবায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকেন, যেমন: মাস্টার পাস্টোরাল প্লান: প্রস্তুতি - ১৯৮১-১৯৮৪; পালকীয় পরিকল্পনা ঘোষণা ১৯৮৫; জাতীয় কর্মশালার চূড়ান্ত বিবৃতি ১৯৯৬, মহান জুবিলী উপলক্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৯৬-২০০০; পালকীয় পত্র: খ্রিস্টীয় জীবন ও সেবার গভীরে যাত্রা - (২০০২), ইত্যাদি। কমবেশী একটি দশক ঘিরে মোট পাঁচ দশকের পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হয়:

১৯৭২-১৯৮৪: নবায়ন ও পালকীয় পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুতি (১২ বছর)

১৯৮৫-১৯৯৫: মাস্টার পালকীয় পরিকল্পনা ও আত্মীকরণ (১০ বছর)

১৯৯৫-২০০০: বার্ষিকী পালকীয় পরিকল্পনা (৫ বছর)

২০০১-২০১১: পালকীয় পরিকল্পনা: মণ্ডলীর গভীরে যাত্রা (১০ বছর)

২০১১-২০২০: পালকীয় পরিকল্পনা: নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়া: সৃষ্টি, কৃষ্টি, ধর্ম, ব্যক্তি, ক্ষুদ্র সমাজ, সেবা (১০)

২০২১-২০৩০: ষষ্ঠ দশক: “মিলন-সমাজ : বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর সাক্ষ্যদান” (১০ বছর)

(৯) জাতীয় বিষয়গুলোর বিষয়ের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ: মণ্ডলী ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও নির্দেশনা দান করেন, যেমন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, কর সংক্রান্ত, মণ্ডলীর নিবন্ধন, বিদেশীদের ভিসা সংক্রান্ত, ধর্মশিক্ষা, উপাসনা, বিদেশী অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ইত্যাদি।

(১০) প্রতিটি ধর্মপ্রদেশ ও তাঁর ধর্মপাল স্বতন্ত্র বিবেচনায় রেখে সিবিসিবি সর্বদা কাজ করে; সিবিসিবি কয়েকটি বিষয় ছাড়া উর্ধতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে কোন ধর্মপ্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে না। মণ্ডলীর আইন সংহিতা দ্বারা সি.বি.সি.বি.-এর নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেন। তবে সি.বি.সি.বি.-এর মধ্যে সংঘবদ্ধতার কারণে, সাধারণতঃ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশপগণ আপন আপন ধর্মপ্রদেশে বাস্তবায়ন করে থাকেন।

গ ৥ সি.বি.সি.বি কমিশন/সংগঠন/সংস্থা/কমিটি ও ক্রমবিবর্তন

সিবিসিবি প্রধানতঃ আন্তঃধর্মপ্রদেশীয় কমিশন, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান/ কমিটি প্রভৃতির মাধ্যমে কাজ করে থাকেন।

সিবিসিবি ও কমিশন/সংগঠনের মধ্যে সংলাপ, মতবিনিময়, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সিবিসিবি বিভিন্ন কমিশন/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও তাদের সহায়তায় বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় লক্ষ্য ও দর্শন অনুসারে পর্যালোচনা, পরিকল্পনা, নির্দেশনা ও কার্যক্রম সম্পাদন করেন।

বিগত পঞ্চাশ বছরের প্রথম ধাপে সিবিসিবি প্রতিটি কমিশনের সাথে নিয়মিত ভাবে একত্রে আলোচনা সভা করত; দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রয়োজন মারফিক নির্দিষ্ট কমিশনের সাথে সিবিসিবি সভা করত; তৃতীয় পর্যায়ে বছরে একবার সকল কমিশন ও সংগঠনের সাথে যৌথ সভা করা হয় যেখানে : অবগতি, সমন্বয়, নানা বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা, কাজের প্রস্তাব করা, ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা হয়।

প্রতিটি কমিশন/সংগঠন/প্রতিষ্ঠান আন্তঃধর্মপ্রদেশীয়, আর সেগুলো নিজস্ব সংবিধান অনুসারে পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি কমিশন/সংগঠনের জন্য একজন সভাপতি-বিশপ নিয়োজিত থাকেন। প্রতিটি কমিশন/সংগঠন ও সংস্থার নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তাকারে কাথলিক ডিরেক্টরিতে লিপিবদ্ধ আছে। প্রয়োজনবোধে নতুন কমিশন ও কমিশনগুলোর মধ্যে নতুন নতুন ডেস্ক স্থাপন করে কমিশনকে নবায়ন, কার্যকরী ও বাস্তব-যোগ্য করে তুলছে। প্রতিটি কমিশন/সংগঠন তার নিজস্ব সংবিধান অনুসারে প্রতি বছর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট থাকে। নিম্নে এ্যাপিসকপাল কমিশনগুলোর নাম, সংখ্যা ও বিবর্তন অতি সংক্ষেপে ইংরেজীতে উল্লেখ করা হল।

1. Ep. Com. for Liturgy and Prayer (EC-LP) - 1966

Evolution: East Pakistan Liturgical Commission (1966); Bangladesh Liturgical Commission (1971); Desk: Charismatic Renewal (1979); Present name and Constituions (2003).

2. Ep. Com. for Catechetics and Biblical Apostolate (EC-CBA) – 1975

Evolution: Translation Committee for Catechism Books (1970); National Social Catechetical Training Center (1973); Catechetical Commission (1975); Desk: Biblical Apostolate (1988); Present Name and Constitutions (2004)

3. Ep. Com. for Family Life (EC-FL) – 1972

Evolution: Family Commission (1972); Christian Family Welfare Committee (1973); Natural Family Planning Center (1976); Family Service Centre (1987); Present Name and Constitutions (2004).

4. Ep. Com. for Health Care (EC-HC) 2003

Evolution: Catholic Nurses Guild (1979); ABCD (); Ministry to the Disabled Person ().

5. Ep. Com. for Justice and Peace (EC-JP) 1974

Evolution: Desk for Migrants and Refugees (2010); Desk for Protection of Children (2018); Desk for Climate Change (2017); Desk for Prison Ministry (2018); Present Name and Constitutions (2004)

6. Ep. Com. for Christian Unity and Inter-Religious Dialogue (EC-CUID) 1974

Evolution: Commission for “Non-Christian and Christian Unity” (1974); Present Name and Constitutions (2004)

7. Ep. Com. for Social Communication (EC-SC) – 1974

Evolution: Pratibeshi (1941), Pratibeshi Prakashoni (1978); Jerry Printing (1982)); Present Name and Constitutions (2004)

8. Ep. Com. for Youth (EC-Y) – 1998

Evolution: Catholic Jubo Shebadol (1976); Commission (1998); Present Name and Consitutions (2004)

9. Ep. Com. for Laity (EC-L) – 2003

Evolution: Christian Communities Program (1976) now a Desk (2008); Desk for Women (2003); Desk for Lay Associations and Organizations (2016); Present Name and Constitutions (2004)

10. Ep. Com. for Clergy and Religious (EC-CR) – 2003

Evolution: Bangladesh Conference For Religious (BCR-1978); Bangadesh Diocesan Priests Fraternity (BDPF – 1985)

11. Ep. Com. for Seminary (EC-S) 1977;

Evolution: Ad Hoc Seminary Commission (1970); Seminary Commission (1974) Ep. Com. for Seminary (1977); Present name and Constitutions – 2004.

12. Ep. Com. for Evangelization and Promotion of PMS (ECE-PMS) – 2004

Evolution: P.M.S. (1972); Present Name and Constitutions – 2004.

- 13. Ep. Com. for Doctrine (2019)**
- 14. Ep. Com. for Theological Concerns (2019)**
- 15. Bangladesh Catholic Education Board (BCEB) – 2009; Reg. 2013.**
Evolution: Bangladesh Christian Parishad (1970); Episcopal Commission for Catholic Education (1985) Bangladesh Christian Education Commission (2003); Present Name and Constitutions (2009).
- 16. Caritas Bangladesh (CB-1976)**
East Pakistan Caritas (1967); Chittagong Organization for Rehabilitation and Development (CORD) – 1970; Christian Organization for Relief and Rehabilitation (CORR) – 1971; CORR Registered 1972; CORR-CARITAS (1976); Silver Jubilee of Caritas (1997); Golden Jubilee of Caritas (2022); Present name and Statutes (1976)
- 17. CBCB Secretariate Bye-laws (2004)**
CBCB was established in 1971; National Center for Pastoral Services (1978); CBCB decided to set up CBCB Secretariat at Mohammadpur (1990); a Deputy-Secretary General initially worked from the Archbishop's House (1995); Seminar for Secretaries (2009); CBCB Center was inaugurated on May 1996. CBCB Trust (Reg.) -2012; Extension of the New Building – 2010-2014-2016.
- 18. Guidelines for For Episcopal Commissions: Relationship between the Episcopal Commissions and the Dioceses" (March 2010)**

Sources/Bibliography

1. Pakistan Catholic Bishops Conference, Minutes, Archive, Archbishop's House, Dhaka
2. East Pakistan Catholic Bishops Meeting, Minutes, Archive, Archbishop's House, Dhaka.
3. Catholic Bishops' Conference of Bangladesh (CBCB), Minutes, Archive Archbishop's House, CBCB Secretariat, Dhaka.
4. CBCB Pastoral Letters and Pastoral Documents, Personal Collections of Cardinal Patrick D'Rozario, csc.
৫. কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, *খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড*, ১ম ও ২য় খণ্ড, ১ অক্টোবর, ২০২১, সিবিসিবি সেন্টার, ঢাকা
6. Catholic Directories 1973-2019.

ব্রত- ২: ঢাকা আর্চবিশপ ভবনের শততম বর্ষপূর্তি উৎসবে বাংলাদেশ মণ্ডলীর কতকগুলো স্মরণীয় মাইলফলক

১. ঢাকায় আর্চবিশপ ভবন নির্মাণ একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর মধ্যে নিহিত আছে অতীত ইতিহাসের প্রকাশ ও ভবিষ্যৎ ভাবনা ও পরিকল্পনার উন্মুক্ত দিগন্ত। এ কারণেই ভবনটি নির্মাণের শততম বর্ষপূর্তি পালন যথাযথ। এই শতবর্ষ পূর্তি-উৎসবটি আয়োজকদের কাছে শুধু একটি নির্মিত ভবনের বিষয় নয়। তাদের প্রেরিত ধারণাপত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, উক্ত ঘটনাটি ঘিরে ঢাকা আর্চডাইয়েসের ঐতিহ্যগত ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ, স্থাপনা-স্থাপত্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অবদান, ইত্যাদি তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন লেখক-লেখিকাকে আহ্বান করা হয়েছে। এই চিন্তার প্রেক্ষাপটেই আমার কিছু তথ্য-সম্মিলিত ও প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস পাচ্ছি।
২. বাংলাদেশে (অতীতে বেঙ্গল/পূর্ববঙ্গ/পূর্বপাকিস্তান নামে অভিহিত) ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে, দিয়াঙ-এ পর্তুগিজ খ্রিস্টানদের প্রথম আগমন, বসতি ও ঘাটি স্থাপন হয়। এই শুরু করে দীর্ঘ একটি যাত্রার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলী বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে মণ্ডলীর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেকগুলো স্মরণীয় মাইলফলক রয়েছে। আর্চবিশপ ভবন নির্মাণ মণ্ডলীর প্রশাসনিক একটি মাইলফলক এবং আরও কয়েকটি মাইলফলক আছে তা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং সেগুলো মণ্ডলীর ইতিহাসকে আরও স্পষ্ট করে তুলবে।
৩. ভারতে পর্তুগিজদের আগমনের পর থেকে প্রশাসনিকভাবে পর্তুগাল রাজ্যের শাসকমহল ও পোপের মধ্যে সম্পাদিত “পাদ্রোয়াদো” চুক্তি অনুসারে মণ্ডলীর বাণীপ্রচারের কাজ চলতে থাকে। চুক্তি অনুসারে মিশনারী পাঠানো, মিশন এলাকা নির্ধারণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পর্তুগিজদের হাতে ন্যস্ত ছিল। বেঙ্গল-মিশন প্রথমে গোয়া ডাইয়েসিস ও কোচিন ডাইয়েসিসের অধীনস্থ ছিল এবং পরবর্তীতে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে মাইলাপুর ডাইয়েসিসের অধীনে অবস্থান করে। এই সময় থেকে আগষ্টিনিয়ান ধর্মসংঘের যাজকগণ দীর্ঘকাল বেঙ্গল-এলাকায় বাণীপ্রচার করেছেন এবং তাদের পাশাপাশি প্রথমদিকে ডমিনিকান, ফ্রান্সিসকান এবং জেসুইট মিশনারিগণ বাণীপ্রচারের কাজ ও পালকীয় দায়িত্ব পালন করতেন। পূর্ববঙ্গে তাদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে চট্টগ্রাম/দিয়াঙ্গ, চান্দেকান (ঈশ্বরীপুর/যশোর), বাকলা ও পাদ্রীশিবপুর (বরিশাল), ভুলুয়া (নোয়াখালি), ভাওয়াল, হাসনাবাদ, শ্রীপুর, ঢাকা শহর, প্রভৃতি এলাকায়।

৪. বঙ্গে অবস্থিত মণ্ডলীর আরেকটি মাইলফলক হল ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল পোপের বিশ্বাস-বিস্তার সংস্থার আওতাধীন “ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব বেঙ্গল” নামে প্রশাসনিক একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তার ১১ বছর পর ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে “ভিকারিয়েট অব ইস্টার্ন বেঙ্গল” প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে পূর্ববঙ্গে “পাদ্রোয়াদো” ব্যবস্থায় থাকা সকল বাণীপ্রচার-কেন্দ্র “ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব ইস্টার্ন বেঙ্গল” প্রতিষ্ঠানের আওতায় চলে যায়। এর ব্যতিক্রম হিসেবে নাগরী, পাদ্রীশিবপুর ও হাসনাবাদ “পাদ্রোয়াদো” ব্যবস্থাপনায় মাইলাপুর ডাইয়োসিসের অধীনেই থেকে যায়। ফলে পূর্ববঙ্গে অবস্থিত মণ্ডলীর মধ্যে দেখা যায় কিছু কালের জন্য দেখা যায় দ্বৈত প্রশাসন, ভুল-বোঝাবুঝি এবং কিছুটা টানাপোড়েনের অবস্থা।
৫. এখানে আরেকটি সত্য উল্লেখ না করলেই নয়; “ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব বেঙ্গল”-এর আওতাধীন বাণীপ্রচারের আরেকটি ধারা পশ্চিমবঙ্গে সমসাময়িক ভাবে চলতে থাকে এবং যা “ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব ইস্টার্ন বেঙ্গল”-এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। “ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব বেঙ্গল”-এর অধীনে থেকে বাংলাদেশে অবস্থিত দিনাজপুর এলাকা, রাজশাহী ও খুলনা এলাকায় পিমে, জেভেরিয়ান ও সালেসিয়ান মিশনারীগণ বাণীপ্রচার করে মণ্ডলী স্থাপন করেছেন। তারা কিছু সরাসরি চট্টগ্রাম ও ঢাকা কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। এ কথাটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।
৬. “ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব ইস্টার্ন বেঙ্গল”-এর প্রথম ধর্মপাল ছিলেন বিশপ টমাস অলিফ, এস.জে। তাঁর ধর্মান্তন ছিল চট্টগ্রাম যেখান থেকে তিনি ভিকারিয়েটের দায়িত্ব পালন করেছেন ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। যদিও ভিকারিয়েটের আসন ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা স্থানান্তরিত হয় তথাপি, ঢাকা ডাইয়োসিস প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভিকারিয়েটে কর্মরত মিশনারীদের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল চট্টগ্রাম। এই সময়ে বেনেডিক্টিন ধর্মসংঘের কয়েকজন ফাদার ভিকারিয়েটে কাজ করতেন। বেনেডিক্টিন সংঘের সর্বশেষ ধর্মপাল ছিলেন বিশপ এডোয়ার্ড বালসিয়েপের, ও.এস.বি. যিনি চট্টগ্রামে বাস করতেন।
৭. পূর্ববঙ্গে পবিত্র ত্রুশ সংঘের প্রথম আগমন ঘটে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের মিলে ৮ জনার প্রথম একটি মিশনারি দল নৌকাযোগে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে বাণী প্রচারের জন্য চট্টগ্রাম শহরে ও ঢাকা লক্ষ্মীবাজারে বাস করতে থাকেন। ঐ সময়ে অনেক মিশনারিদের মৃত্যু ঘটে এবং মিশনারিদের স্বল্পতার সংকট গভীরভাবে অনুভব হয় যার কারণে সাময়িকভাবে পবিত্র ত্রুশ সংঘের বেঙ্গল-মিশন ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। তবে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে আবার পবিত্র ত্রুশ সংঘের মিশনারিগণ পূর্ববঙ্গে ফিরে আসেন।

৮. পূর্ববঙ্গের মণ্ডলীর যাত্রাপথে আরেকটি বিরাট মাইলফলক হল ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ। উক্ত তারিখে পোপের বিশ্বাস-বিস্তার সংস্থা “ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব ইস্টার্ন বেঙ্গল”-কে উন্নীত করে কোলকাতার মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়েসিসের সাথে সংযুক্ত রেখে, ঢাকা-কে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাইয়েসিস রূপে প্রতিষ্ঠা করে। নতুন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ডাইয়েসিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তৎকালীন ঢাকা ও চট্টগ্রামের এলাকা। ঢাকা ডাইয়েসিস প্রতিষ্ঠার পর ডাইয়েসিসের প্রশাসক রূপে ফাদার গ্রেগরী দ্য গ্রুট, ও.এস.বি-কে নিয়োগ করা হয়।

৯. ঢাকা ডাইয়েসিসের প্রথম বিশপরূপে অভিষিক্ত হন ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে বিশপ আগষ্টিন লুয়াজ, সিএসসি (১৮৯১-১৮৯৪); পবিত্র ক্রুশ সংঘের হাতে নতুন ডাইয়েসিসের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়। লক্ষ্মীবাজার তখন ছিল পবিত্র ক্রুশ সংঘের কেন্দ্রীয় স্থান এবং বিশপ হাউজ হিসেবে ব্যবহার করে বিশপগণ ওখানেই বাস করতে থাকেন। বিশপ পিটার যোসেফ হার্থ, সিএসসি (১৮৯৪-১৯০৯), বিশপ ফ্রান্সিস ফ্রেডেরিক লিনেবর্ন, সিএসসি (১৯০৯-১৯১৫) এবং বিশপ যোসেফ আরমাণ্ড ল্য গ্রাঁ, সিএসসি (১৫১৫-১৯২৯) লক্ষ্মীবাজার বিশপ হাউজে বাস করেছেন। বিশপ পিটার হার্থ, সিএসসি, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীবাজারে কাথিড্রাল গির্জা নির্মাণ করেন এবং “হলি ক্রস কাথিড্রাল” নামকরণ করে তা আশীর্বাদ ও উদ্বোধন করেন।

১০. নব-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ডাইয়েসিসের দায়িত্বভার পবিত্র ক্রুশ সংঘের হাতের ন্যস্ত করা হলেও, ডাইয়েসিস পরিচালনার সূচনা-লগ্ন থেকে ঢাকা ডাইয়েসিসকে স্থানীয় মণ্ডলী রূপে গড়ে তোলার ভাবনা ও পরিকল্পনা বিশপদের মধ্যে কাজ করেছে। সেই পরিকল্পনার কিছু ইঙ্গিত আমরা পাই নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশাসনিক মাইলফলকের মধ্যে:

- বিশপ পিটার হার্থ, রোমের নির্দেশে স্থানীয় যাজক গঠনের জন্য বিশপ হাউজে দুজন সেমিনারিয়ান নিয়ে একটি সেমিনারি শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরাতে ক্ষুদ্র পুষ্প মাইনর সেমিনারি প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- বিশপ পিটার হার্থ, বর্তমান হাই কোর্ট-এর চত্তরে এক খণ্ড জমি ক্রয় করেছিলেন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে। উক্ত জমির বদলে পরবর্তীতে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রমনায় জনৈক জনাব নাসিরুদ্দিনের কাছ থেকে এক খণ্ড জমি পেতে সরকার সাহায্য করেন। এই জায়গার উপরেই পরবর্তীতে বিশপ-ভবন নির্মাণ করা হয়।
- ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার বিশপই ছিলেন পবিত্র ক্রুশ সংঘের সুপিরিয়র। এ ব্যবস্থা স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে সহায়ক হবে না বলে বিবেচনা করে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় পবিত্র ক্রুশ সংঘের চ্যাপ্টারের সিদ্ধান্ত অনুসারে, সংঘের

সুপিরিয়র হিসেবে একজন ফাদারকে নিয়োগ দান করা হয় এবং পৃথকভাবে অন্যত্র বিশপভবন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

- বিশপ পিটার হার্শ-এর ক্রয় করা জায়গায়, বর্তমান আর্চবিশপ প্রাসঙ্গে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বিশপভবন নির্মিত হয়। ডাইয়েসিসের তৃতীয় বিশপ, আরমাণ্ড ল্য গ্রাঁ, সিএসসি এই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের মধ্যে রমনার বিশপ ভবনে বাস করতে শুরু করেন। এই ঘটনা স্মরণ করে আজ বিশপভবন নির্মাণের শতবর্ষপূর্তি পালন করা হচ্ছে।
- ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীবাজারের গৃহটি পবিত্র ক্রুশ সংঘের বাসগৃহ হিসেবে তাদের হাতে অর্পণ করা হয়।
- ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে অধ্যাবধি, বিশপভবন এবং পরবর্তীতে আর্চবিশপ ভবনে, বিশপ ও আর্চবিশপগণ বাস করতে থাকেন এবং ভবনটিকে ঘিরে ও তার চত্তরে নির্মিত হয় পর্যায়ক্রমে কাথিড্রাল গির্জা, ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের বাসস্থান, সেমিনারি, প্যারিশ ও পালপুরোহিতের বাসকক্ষ ও কার্যালয়, আর্চডাইয়েসিসের পালকীয় সেন্টার, ডাইয়েসিসান কার্যালয় এবং অবসরপ্রাপ্ত ফাদারদের জন্য যাজক-ভবন।

১১. বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য আরেকটি মাইলফলক হল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ডাইয়েসিস থেকে পৃথক করে পোপ মহোদয় চট্টগ্রামকে একটি নতুন ডাইয়েসিস রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তৎকালীন বৃহত্তর ঢাকা ও ময়মনসিংহ; এবং চট্টগ্রাম ডাইয়েসিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় বৃহত্তর চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও শিলচর (আসাম, ভারত) এবং প্রোম (মিয়ানমার)। ঢাকা ডাইয়েসিসকে আমেরিকান পবিত্র ক্রুশ সংঘের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হয় এবং চট্টগ্রাম ডাইয়েসিসকে কানাডীয় পবিত্র ক্রুশ সংঘের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। একই বছর পূর্ববঙ্গের দিনাজপুর এলাকাকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ডাইয়েসিস রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর ডাইয়েসিস কলকাতার মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়েসিসের সাফ্রাগান হিসেবে যুক্ত থাকে।

১২. ভারত-পাকিস্তান বিভাগের পরবর্তীতে, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয় কর্তৃক ঢাকা ডাইয়েসিস মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়েসিস রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার সাথে সাফ্রাগান ডাইয়েসিস হিসেবে সংযুক্ত থাকে: চট্টগ্রাম, দিনাজপুর ও খুলনা (যশোর) ডাইয়েসিস। আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার, সিএসসি হলেন ঢাকার প্রথম আর্চবিশপ এবং বিশপভবন তখন থেকে আর্চবিশপভবন হিসেবে অভিহিত হতে থাকে।

১৩. এটা সর্বজন বিদিত যে, পবিত্র ক্রুশ সংঘের বিশপদের এবং আর্চবিশপদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল স্থানীয় মণ্ডলী গঠন করা এবং যারা পবিত্র ক্রুশ সংঘে

যাজক হতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তাদেরকে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হবার জন্য প্রেরণা, এমন কি নির্দেশও দেওয়া হত। তাই দেখা যায় যে, ঢাকা থেকে বেশ কয়েকজন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হওয়ার পর, নবিশেষ্ট করে পবিত্র ত্রুশ সংঘে যোগদান করেন। তাদের মধ্যে যিনি ছিলেন ঢাকা আর্চডাইয়েসিস তথা গোটা বঙ্গের প্রথম বাঙালি বিশপ এবং ঢাকার প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ, তিনি হচ্ছেন আর্চবিশপ থিওটটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলি, সিএসসি, যিনি এখন ধন্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের সেবক হিসেবে অভিহিত। ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ফাদার মাইকেল রোজারিও, প্রথমে দিনাজপুরের বিশপ ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনিই ঢাকার আর্চবিশপ রূপে মনোনীত হন।

১৪. মণ্ডলীর প্রশাসনিক কাঠামোর মাইলফলকের বিবরণে ইতি টানার পূর্বে অবশ্যই স্মরণ করতে হয় আরও কয়েকটি ঘটনা যা হল: ঢাকা ডাইয়েসিস থেকে পৃথক করে ময়মনসিংহ (১৯৮৭ খ্রি.) এবং সিলেট (১৯১১ খ্রি.) ডাইয়েসিস স্থাপন করা হয়; দিনাজপুর থেকে রাজশাহী ডাইয়েসিসের জন্ম (১৯৯০ খ্রি.) এবং চট্টগ্রাম থেকে বরিশাল (২০১৫ খ্রি.) ডাইয়েসিস এবং ভারত ও মিয়ানমারে আরও তিনটি ডাইয়েসিসের জন্ম হয়।

বিশেষ দৃষ্টব্য: ১৯ই নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে “আর্চবিশপভবন প্রতিষ্ঠার শতবর্ষী স্থাপত্য উৎসব”-এ নির্ধারিত “জুবিলী-উত্তর দিক-নির্দেশনামূলক সহভাগিতা” শীর্ষক বক্তব্যে নিম্নোক্ত অংশটি এই প্রবন্ধের লেখক উপস্থাপন করেন।

১৫. উপসংহারে বলতে চাই যে, মণ্ডলীতে সকল ব্যক্তি, স্থাপনা ও সেবাকাজের মধ্যে সবসময়ই দুটো দিক থাকে: মানবিক ও ঐশ্বরিক। মণ্ডলীর মস্তক যিশুর বেলাও তাই ছিল এবং তাঁর থেকেই এই দুটো দিকের প্রাপ্তি। এই দুটো দিক কোন সময় পৃথক করে দেখা ঠিক নয়। খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের মধ্যেও আছে মানবিক ও ঐশ্বরিক দুটো দিক; দীক্ষাল্পনের ফলে আমরা যারা মানব-সন্তান তারা হয়েছি ঈশ্বরের সন্তান। এই দুটো সত্তার মধ্যে ভিন্নতা আছে কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নেই, পার্থক্য আছে কিন্তু অনৈক্য নেই; আমরা যারা খ্রিস্টান আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র মানবিকতা বা জাগতিকতাই নেই, আমাদের মধ্যে আছে ঐশ্বরিক অথবা ঈশ্বরীয় দিক। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বিশপভবনটি যখন আশীর্বাদ করা হয়েছিল সেই দিন থেকে এই ভবনটি কোন জাগতিক ইমারত বা অট্টালিকা হিসেবে গণ্য করা হয় নি; আশীর্বাদ অনুষ্ঠান যেন দীক্ষাল্পনের অনুষ্ঠান। যাকিছু জাগতিক তা আশীর্বাদের ফলে হয়ে উঠেছে ধর্মীয়, ঐশ্বরিকতার নিদর্শন। তাই আর্চবিশপভবন শুধু বিল্ডিং নয়, ধর্মীয় ভবন, ধর্মীয় নামকরণ করে “আর্চবিশপ ভবন” করা হয়েছে। আমাদের কাছে আর্চবিশপভবন যেন অভিষিক্ত সেবাকারীর ভবন, মেষপালকের বাসগৃহ, তাঁর সহকর্মী যাজকদের গৃহ, সেবার কার্যালয়, আর্চডাইয়েসিসের সকলার –

ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী ও যাজকদের মিলন-গৃহ, ঐক্য ও মিলনের চিহ্ন, অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলীর নিদর্শন, মিশনকর্মের উদ্ভাবন; জৈনিক ভক্ত একবার আর্চবিশপ হাউজে এসে আমাকে বলেছিল: “আমরা বাবার বাড়ি, পিতার ঘরে এসেছি, তাই আমরা আনন্দিত”।

১৬. বিগত শতবর্ষ ধরে আর্চবিশপ ভবনটি কমবেশী উক্ত সাক্ষ্যই তো দিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও দিয়ে যাবে। যারা এই গৃহের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যারা গৃহটি নির্মাণ করার জন্য খ্রিস্টীয় দয়ারকাজের দায়িত্ব পালন করে গেছেন, যারা এই গৃহে বাস করে সেবাকার্য করে গেছেন তাদেরকে আজ শুধু স্মরণই করি না; তাদের পায়ে প্রণিপাত করি ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে, কারণ তারা “পবিত্র” ছিলেন; তাদের পবিত্রতা ছিল যিশুর যাজকীয় প্রার্থনা, “তারা যেন এক হয়”-এর সাধনা। তাই ভবনটির শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন হচ্ছে একটি সুন্দর “তীর্থমুহূর্ত”, “মিলন-তীর্থ”, আর্চবিশপভবন যেন একটি “তীর্থস্থান”। প্রার্থনা ও প্রত্যাশায় আমরা আছি – এই ভবন থেকেই একদিন সাধুতার একটি মহান বাণী ছড়িয়ে পড়বে বাংলাদেশ ও বিশ্বমণ্ডলীর সর্বত্র, যে-দিন প্রথম বাঙালি বিশপ ও আর্চবিশপ থিয়োটনিয়াস অমল গাঙ্গুলি ধন্যশ্রেণীভুক্ত বলে ঘোষিত হবে। প্রভুর মহিমা প্রকাশিত হোক।

১৭. আমাকে বলা হয়েছে জুবিলী-উত্তর দিক-নির্দেশনামূলক সহভাগিতা করতে। এ কাজটি করতে আমি সত্যিই অপারগ। যখন কর্তৃপক্ষ ছিলাম তখন অনেক দিগনির্দেশনা দিয়েছি এবং সেকাজে এতোটুকু কার্পণ্য করিনি। তবে বর্তমানে যেহেতু কার্ডিনাল হিসেবে পোপের সঙ্গী হয়ে আছি, তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করছি এবং তাঁর কথা সমগ্র মণ্ডলীতে প্রচার করার দায়িত্ব পেয়েছি, সেহেতু সম্প্রতি সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী প্রসঙ্গে তার কিছু নির্দেশনা তুলে ধরছি:

(ক) পোপ মহোদয় পরিস্কার ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যদিও দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা ৬০ বছর পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তথাপি মণ্ডলী সম্বন্ধে মহাসভার ধারণা ও শিক্ষা এখনও অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে এবং অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হয় নি। অতএব পুনরায় পোপ ফ্রান্সিস “সিনড-বিশিষ্ট” মণ্ডলী বিষয়টি আলোচনায় এনেছেন মূলতঃ দ্বিতীয় ভাটিকান সভার শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে।

(খ) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা অনুসারে মণ্ডলী মূলতঃ দীক্ষাশ্রুত ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণকে নিয়ে মিলনসমাজ-মূলক, অংশগ্রহণ-মূলক একটি মিশনারি মণ্ডলী। এই বিষয়টা বুঝানোর জন্য ও মণ্ডলীর সকল চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম ও ধ্যান-সাধনা সবার সামনে তুলে ধরার জন্য “ক্লারিকালিজম” বিষয়ে পোপ মহোদয় কঠিন কথা উচ্চারণ করেছেন

এবং এই “ক্লারিকালিজম” মণ্ডলীতে কীভাবে কাজ করে তা চোখে আসুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। “ক্লারিকালিজম”- একটি মনোভাব, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যাজক-কেন্দ্রীক মতবাদ, যা মঙ্গলসমাচারের পরিপন্থী। “ক্লারিকালিজম” সেবাকারী যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণ – প্রায় সবার মধ্যে কমবেশী দেখা যায়। “ক্লারিকালিজম” মণ্ডলীতে কী করে সে সম্বন্ধে পোপ মহোদয় কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন: “ক্লারিকালিজম” মণ্ডলীতে “চাবুকস্বরূপ” যার আঘাতে “ক্ষত” সৃষ্টি করে; জাগতিক মনোভাব দ্বারা “বধু-সম” মণ্ডলীর শ্রীমুখ “মলিন” করে ফেলে; মণ্ডলীর ভক্তবিশ্বাসীদেরকে “দাসত্বে” বেধে রাখে। সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর গঠন-প্রক্রিয়ায় একসঙ্গে পথচলা মঙ্গলসমাচার বিরোধী “ক্লারিকালিজম” মনোভাব ও ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনতে মণ্ডলীকে সক্ষম করবে, পোপ মহোদয় তাই ভাবছেন।

(গ) পোপ মহোদয় স্মরণ করিয়ে দেন যে, “আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা, আমরা এমন মণ্ডলী হব যা মানুষকে মমতা দিয়ে দেখবে। এমন মণ্ডলী হব যা ঐক্য ও আত্মত্ববন্ধনে আবদ্ধ, যারা উদাসীন তাদের মধ্যে মণ্ডলী প্রেম জাগ্রত করবে, তাদের জন্য এমন পথ উন্মুক্ত করবে যেন বিশ্বাসের সৌন্দর্য দেখে জনগণ আকৃষ্ট হয়। এমন মণ্ডলী হব যার প্রাণকেন্দ্রে থাকবে ঈশ্বর, যে-মণ্ডলী অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন নয়, বাহ্যিকভাবে কারো প্রতি নিষ্ঠুর না হয়। এভাবেই তো যিশু তার মণ্ডলীকে দেখতে চান, যে মণ্ডলী হয়ে উঠবে তাঁর আপন বধু”। যিশু এমন মণ্ডলী দেখতে চান, যে অন্যের “ঘারে বোঝা চাপিয়ে দেবে না, বরঞ্চ বারবার এই বলে আহ্বান করবে: ‘এসো, তোমরা যারা শ্রান্ত ও নির্যাতিত, এসো, তোমরা যারা পথ হারিয়ে ফেলেছো অথবা মনে করছো তোমরা অনেক দূরে সরে গেছো, এসো, তোমরা যারা প্রত্যাশার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছো, তোমরা এসো, তোমাদের জন্য মণ্ডলী তোমাদের পাশে আছে।’ মণ্ডলীর দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত, প্রত্যেকের, প্রত্যেকের জন্য উন্মুক্ত।”

(ঘ) পোপ মহোদয় আরও বললেন: “আমাদের সামনে যে সকল কষ্ট ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেখানে যিশুর আশীর্বাদিত এবং স্বাগত দৃষ্টিতলে অবস্থান করে আমরা যেন বিপজ্জনক প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকি, অর্থ্যাৎ জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে মণ্ডলীকে যেন কঠোর করে না তুলি; আবার মণ্ডলীকে যেন এমন উদাসীন করে না ফেলি, যে মণ্ডলী জগতের নানা ফ্যাশনের প্রতি গা ভাসিয়ে দেবে; ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে মণ্ডলী যেন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে না রাখে।”

- (ঙ) পোপ ফ্রান্সিস মণ্ডলীর আদি পিতৃগণের ধারণা উল্লেখ করে বলেন যে, মণ্ডলীর পরিচালক হচ্ছেন পবিত্র আত্মা: মানবজীবনের পরিত্রাণ পূর্ণভাবে সাধিত হয় পবিত্র আত্মারই দ্বারা। (ক) মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা গভীরতা ও বিচিত্রতা উজ্জ্বল করে তোলেন: পঞ্চশতমীর মতো মণ্ডলীতে তিনি বাড় সৃষ্টি করেন। (খ) পরিত্রাণ ইতিহাসে পবিত্র আত্মা সম্প্রীতি সৃষ্টি করেন যার ফলে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে মিলনের বন্ধন দৃঢ় হয়। (গ) পবিত্র আত্মা হাত ধরে মণ্ডলীকে পরিচালনা করেন এবং সর্বদাই মণ্ডলীকে সাক্ষ্য প্রদান করেন। (ঘ) পবিত্র আত্মাই মণ্ডলীকে নবীন করে সৃষ্টি করেন। (ঙ) পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেন। (চ) আত্মা দ্বারা পরিচালিত ভক্তজনগণের বিশ্বাস ও নৈতিকতা অদ্রোহ বলেই গণ্য হয় – যেমন শিক্ষা দেয় দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা।
- (চ) পোপ মহোদয় বলেন: “এসো একসঙ্গে পথ চলি: বিনম্রতার সাথে, আগ্রহভরে ও আনন্দচিত্তে পথ চলি। সিনডের শেষে পোপ মহোদয় গোটা মণ্ডলীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন: ঈশ্বরের কাজ দেখে তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর আরাধনা করা এবং অপরকে সেবা কর। আরাধনা ও সেবা – এই দুটো কাজ নিয়ে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হও।

Sources Consulted

1. D'COSTA, Mr. Jerome, *Bangladesh Catholic Mondoli*, Vol. 1. Dhaka, 1988.
2. CAMPOS, J. J. A., *History of the Portuguese in Bengal*, Calcutta & London, Butterworth & Co., 1919. Reprinted with an Introduction by B.P. Ambashthya, Pub. by Janaki Prakashan, Ashopk Rajpath, Chauhatta, Patna 800004, 1979. Campos heavily relies on information given by Joao De BARROS, *Decade de Asia*, Lisboa, 1777. Barros wrote voluminous history which contains events in Chittagong under Arakan and Mughal regime.
3. LePAILLEUR, Bishop Alfred, the first Bishop of Chittagong, *Le District de Chittagong et Notre Mission Catholique*, Vol. I, and *Le Diocese de Chittagong au Bengale*, Vol. II, Manuscript, written in 1943, Bishop's House Chittagong.
For early History of the Christianity in Bengal Bishop LePAILLEUR heavily depends on the brochure named "*Première Missio organisée au Bengal*" by Rev. Fr. Théo Richer, s.j.
4. Bishop Patrick D'Rozario, csc., *Jubilee-2000 Souvenir, October, 2000*
5. Fr. Edmund Goedert, csc., *The Churches of Augustinians*, 30-37.

ৱচনা- ৬: জাতীয় উচ্চ সেমিনারি প্রতিষ্ঠার পূর্বকথা

যুদ্ধ কোন একটি মূল্যবোধ নয় যা মানুষ বাসনা করে। তথাপি যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধের নজির মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এবং বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অনায়সে দেখা যায়। যুদ্ধ চায়না কিন্তু মানুষ যুদ্ধ ঘটায় তাই ঘটে যায়। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যেও ঘটে গেল ১৯৭১ শতকে একটি যুদ্ধ। যার ফলে আমরা পেয়েছি সার্বভৌম একটা নতুন রাষ্ট্র – বাংলাদেশ।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার পরপরই অনেক কিছুই নতুন শুরু হয়। এর একমাত্র কারণ নতুন দেশের রয়েছে নতুন চাহিদা। চাহিদা পূরণের জন্য একদিকে নতুন সৃষ্টি আবার অন্যদিকে দেশ ও সমাজকে নতুন পরিস্থিতিতে নির্মাণ করার জন্য নতুন নতুন অবকাঠামোর উদ্ভাবন।

বাংলাদেশ মেজর সেমিনারি পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্বপাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধের পরবর্তীকালীন সেই ধরনের একদিকে ফলশ্রুতি আবার অন্যদিকে নতুন সৃষ্টি।

বর্তমানে যাকে আমরা “পবিত্র আত্মা মেজর সেমিনারি” বলি এবং যার পঞ্চাশ বছরের পূর্তি এবং গৌরবময় সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি, তার পূর্বের নাম ছিল “জাতীয় মেজর সেমিনারী” এবং তারও পূর্বে সদ্যজাত প্রতিষ্ঠানটির প্রথম নাম ছিল “বাংলাদেশ মেজর সেমিনারি”, যার আনুষ্ঠানিক জন্ম ঘটে ১লা আগস্ট, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে, নটর ডেম কলেজের ম্যাথিস হাউজ আবাসনে।

ক ৥ ভারত ও পাকিস্তান আমলে সেমিনারি ব্যবস্থা

মিশন দেশে যখনই একটি ডাইয়েসিস প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন সাধারণত কাথলিক মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের নির্দেশসহ নিয়োজিত ধর্মপালের একটি বাসনা থাকে স্থানীয় মণ্ডলী গঠন করার জন্য একটি সেমিনারি নির্মাণ করা।^[১] বাংলাদেশ মণ্ডলীর দিকে তাকালে তার কোন ব্যত্যয় দেখি না। প্রায় প্রতিটি ডাইয়েসিসে অন্ততঃপক্ষে একটি মাইনর সেমিনারি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভারত ও পাকিস্তান আমলে সেই প্রচলন আমরা দেখে আসছি।

কলেজ বা ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে দেশের মধ্যে একাধিক সেমিনারি থাকতে পারে। তাই পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানেও একটি ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারি ছিল যা মূলত ঢাকা আর্চবিশপ হাউজে অবস্থিত ছিল।

পরবর্তিতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সন্মিলনী ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে নটর ডেম কলেজে অধ্যায়নরত সেমিনারিয়ানদের নিয়ে একটি ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ফাদার থিওটোনিয়াস গমেজ, সিএসসি-কে প্রথম রেক্টর হিসেবে নিয়োগদান করেন।

করাচী খ্রিস্টরাজা উচ্চ সেমিনারি

প্রত্যেক ডাইয়েসিসে একটি মেজর সেমিনারী থাকা নানা কারণে সম্ভব নয় এবং এমন কি কাম্যও নয়। সেই হেতু পাকিস্তান আমলে জাতীয় পর্যায়ে করাচীতে একটি মাত্র সেমিনারি ছিল যার নাম “খ্রিস্টরাজা উচ্চ সেমিনারি”।

করাচীতে উচ্চ সেমিনারি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে, বাংলাদেশের বিভিন্ন ডাইয়েসিস এবং সন্ন্যাসব্রতী ধর্মসংঘ দেশের বাইরে মেজর সেমিনারির দর্শন শাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র পড়াশুনার জন্য ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইতালি, আমেরিকা, কানাডা বা অন্যদেশে পড়াশুনা করে যাজকীয় অভিষেকের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে যাজক হয়েছেন।

উনিশশত ষাট দশকে করাচীর “খ্রিস্টরাজা উচ্চ সেমিনারি”-তে পড়াশুনা করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রথম যিনি ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হয়েছেন তার নাম ফাদার জন কস্তা। ঢাকাবাসী জন কস্তা ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে যাজকপদে অভিষিক্ত হন। করাচীতে ছ’বছর পড়াশুনা করার পর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ফাদার আবেল রোজারিও, ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সিমা ও ফাদার থিওডোর মজুমদার যাজকপদে অভিষিক্ত হন। করাচী থেকে পড়াশুনা শেষ করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, সিএসসি ও ফাদার বার্নার্ড পালমা এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ফাদার প্যাট্রিক ডি’রোজারিও, সিএসসি (বাংলাদেশে), ফাদার জ্যোতি আলেক্সিউস গমেজ (করাচীতে), এবং ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ফাদার হিউবার্ট অমূল্য গমেজ (করাচীতে) ফাদার লাজারুস গমেজ, সিএসসি (বাংলাদেশে – পরে যাজকপদ ত্যাগ করেন) এবং ফাদার আন্তনী মনোহর কোড়াইয়া (করাচীতে) যাজকীয় অভিষেক গ্রহণ করেন।

যুদ্ধের কারণে করাচী খ্রিস্টরাজা উচ্চ সেমিনারিতে পড়াশুনা শেষ না করে, বাংলাদেশের সেমিনারিয়ানগণ পাকিস্তান থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের সহায়তায় আফগানিস্তান হয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে। পাকিস্তানে আটকা অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের ২১ জন সেমিনারিয়ানের মধ্যে ৩ জন পাকিস্তান থাকাকালীন যাজকপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; ৫ জন ভারতের পুনা সেমিনারিতে পড়াশুনা শেষ করে স্বাধীন বাংলাদেশে অভিষিক্ত হয়েছেন; ২ জন কোলকাতা মর্নিং স্টারে পড়াশুনা করে যাজক হন এবং ৪ জন মর্নিং স্টার কলেজে কিছু কাল থাকার পরে বাংলাদেশ মেজর সেমিনারিতে যোগদান করেন; আর বাকীরা সেমিনারি ত্যাগ করে চলে যায়।

গ ৯ বাংলাদেশে মেজর সেমিনারী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এবং বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সেমিনারিয়ানগণ ফিরে আসার পর বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ মণ্ডলী মেজর সেমিনারি বিষয় নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন। মণ্ডলীর পুরোহিতদের মধ্যেও অতি গুরুত্বের সাথে বিষয়টি আলোচনা হতে থাকে।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সিবিসিবি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ফাদার থিওটোনিয়াস গমেজকে আহ্বায়ক করে, চার সদস্যবিশিষ্ট এক কমিটি গঠন করেন যার মূল কাজ ছিল: বাংলাদেশে মেজর সেমিনারি শুরু করার প্রয়োজনীয়তা, যথার্থতা ও সম্ভাবনা যাচাই করা। কমিটিতে ছিলেন: ফাদার থিওটোনিয়াস গমেজ, আহ্বায়ক (ঢাকা), ফাদার যোসেফ প্যাটনোড সিএসসি (চট্টগ্রাম), ফাদার ক্রেস্টানি এস. এক্স (খুলনা) এবং ফাদার রুসকোনি, পিমে (দিনাজপুর)।

জানুয়ারি ১, ১৯৭৩ খ্রি. আলোচনা

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার আলোকে ফাদার যোসেফ প্যাটনোড, সিএসসি একটি লিখিত বক্তব্য কমিটির সদস্যসহ অনেকের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি যাজকদের ভূমিকা ও সেবাকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। যাজকদের ভূমিকা পালন করার জন্য তিনি প্রশ্ন করেন: তাদের জন্য কি ধরনের গঠন প্রয়োজন? এবং তা কীভাবে দেওয়া যায়? যাজকদের সেবাকর্ম কী হবে?

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক জগত ও মণ্ডলীর যুগলক্ষণগুলো কী? জনগণের জন্য বর্তমান যুগে কী ধরনের যাজক দরকার? মহাসভার নির্দেশ অনুসারে কোন্ কোন্ দিকে আমাদের মন-মানসিকতা ও অবকাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন?

বাংলাদেশীকরণের নিদর্শন স্বরূপ চারজন স্থানীয় বিশপ পাওয়া গেছে, বাংলাদেশ মণ্ডলীকে বাংলাদেশীকরণে জন্য স্থানীয় যাজকদের কী ধরনের রূপরেখা বা আদর্শ হবে? কী ধরনের দেশীয় যাজক দরকার? কোন ধরনের ব্যক্তিকে যাজকীয় অভিষেক দিতে হবে? এই চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নগুলো বিভিন্ন মহলে আলোচিত হতে থাকে।

জানুয়ারি ৫, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ: ফাদার থিওটোনিয়াস গমেজ

ফাদার থিওটোনিয়াস গমেজ বাংলাদেশের বিশপদের অবহিত করে বলেন যে, করাচী থেকে সেমিনারিয়ানগণ চলে আসার পর বিভিন্ন মহলে বাংলাদেশের জন্য মেজর সেমিনারি স্থাপনের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা শুরু হয়। অনেকে মত দিয়েছেন যে, আগের মতো সেমিনারিয়ানদের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সেমিনারিতে পাঠানো যেতে পারে। সেমিনারিতে পড়ানোর জন্য দক্ষ জনবল আমাদের নেই, অর্থবল নেই ও অবকাঠামোও নেই। আবার অনেকে বলেন যে, বাংলাদেশে মেজর সেমিনারির একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, তবে শুধু সেমিনারিয়ানদের জন্য নয় বরং গোটা বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলীর জন্য প্রয়োজন আছে।

যদিও পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, বাংলাদেশে মেজর সেমিনারি শুরু হবে। তবে ফাদার থিওটোনিয়াস বিশপদের কাছে প্রস্তাব করেন যে: এখন সময় হয়েছে যখন সেমিনারি শুরু করার যুক্তি বিশদভাবে আলোচনা করে বিশপগণ যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বিশপগণ যেন স্পষ্ট করেন কেন আমরা সেমিনারি চাই? কী উদ্দেশ্যে আমরা সেমিনারি চাই?

জানুয়ারি ২৭, ১৯৭৩ খ্রি.: ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা ও ফাদার প্যাট্রিক ডি'রোজারিও-এর প্রস্তাব

বাংলাদেশে মেজর সেমিনারি বিষয়ে যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয় এবং মতামত আহ্বান করা হয় তারই প্রেক্ষাপটে, ফা: বেঞ্জামিন, সিএসসি ও ফা: প্যাট্রিক, সিএসসি যৌথভাবে লিখিত আকারে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং তা বিবেচনা করার জন্য বিশপদের নিকট প্রস্তাব করেন। তারা যে কথা বলেছেন তা সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলায় নিম্নে তুলে ধরি:

(ক) সেমিনারির উদ্দেশ্য হবে:

প্রস্তাবিত মেজর সেমিনারি শুধু সেমিনারিয়ানদের জন্যই নয় বরং আরও যে সমস্ত কারণ রয়েছে তারা তা উল্লেখ করে বলেন:

- ভবিষ্যৎ যাজক গঠনের জন্য সেমিনারি প্রয়োজন
- সেমিনারি হবে ঐশতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার কেন্দ্র
- ঐশতাত্ত্বিক বিষয়ে সেমিনারির স্টাফগণ বাংলাদেশ মণ্ডলীকে পরামর্শ দান করবেন
- সেমিনারি যেন ভক্তজনগণ, কাটেখিস্ট, ব্রাদার ও সিস্টারদের জন্য প্রশিক্ষণ ও যাজকদের চলমান নবায়নের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
- সেমিনার, ধ্যানসভা ও ক্ষুদ্র কোর্স পরিচালনার জন্য সেমিনারির স্টাফ মণ্ডলীকে সহায়তা করবেন।
- সেমিনারি স্থানীয় ঐশতত্ত্ব বিকাশে সহায়তা প্রদান করবে।
- সেমিনারি, খ্রিস্টীয় সাহিত্য প্রণয়নে প্রেরণা যোগাবে।

(খ) সেমিনারি স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়:

- অতি সত্ত্বর একটি কমিটি গঠন করা হোক যার কাজ হবে: সেমিনারি প্রেফেসর খোঁজ করা, নতুন সেমিনারির স্থান নির্ধারণ করা, আদিবাসীদের মধ্য থেকে সেমিনারিতে শিক্ষকতার জন্য গঠনের ব্যবস্থা করা, অন্য সেমিনারির সাথে আলোচান্তে সিলাবাস তৈরী করা, এবং সেমিনারির ট্রেনিং যেন স্থানীয় সংস্কৃতি অনুসরণে হয়।
- ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করার জন্য নিম্নোক্ত চারজন পুরোহিতের মধ্যে অন্ততঃ তিনজনকে যেন বিদেশে প্রেরণ করা হয়: ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা, ফাদার বার্নার্ড পালমা, ফাদার প্যাট্রিক ডি'রোজারিও এবং ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা।

ঘ ॥ বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সিদ্ধান্তসমূহ:

সিবিসিবি একে একে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশনা প্রদান করেন তা হল নিম্নরূপ:

- (১) বাংলাদেশ মেজর সেমিনারি প্রতিষ্ঠার জন্য ফাদার পলিনুস কস্তাকে নিয়োগ দান করেন এবং প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দান করেন ।
- (২) কোন একটি ধর্মসংঘকে সেমিনারি পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দেয়া যায় কি-না সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য সিবিসিবি ফাদার পলিনুস কস্তাকে নির্দেশনা দান করেন ।
- (৩) একাধিক সেমিনারি পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ফাদার পলিনুসকে অনুরোধ করেন ।
- (৪) প্রাথমিকভাবে নটর ডেম কলেজের ম্যাথিস হাউজে মেজর সেমিনারি শুরু করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন ।
- (৫) ভবিষ্যতে সেমিনারিতে শিক্ষকতার জন্য ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা ও ফাদার বার্ণাড পালমাকে রোমে এবং ফাদার প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি-কে বেলজিয়ামের ফ্লেমিশ লুভেইন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা জন্য ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেরণ করা হয় ।
- (৬) করাচী থেকে ফিরে আশা সেমিনারিয়ানদের আপাততঃ ভারতের পুনা সেমিনারিতে এবং কোলকাতার মনিং স্টার কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা দান করেন ।
- (৭) ইতোমধ্যে ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের ত্রয়কৃত বনানীর জায়গায় নতুন ও স্থায়ীভাবে সেমিনারি নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

ঙ ॥ বাংলাদেশ মেজর সেমিনারি উদ্বোধন: ১লা আগস্ট, ১৯৭৩ খ্রি.:

- (১) ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ ১লা আগস্ট নটর ডেম কলেজের ম্যাথিস হাউসে উচ্চ সেমিনারি শুরু হয় ।
- (২) মেজর সেমিনারির প্রথম পরিচালক বা রেক্টর হিসেবে বিশপগণ ফাদার পৌলিনিস কস্তাকে নিয়োগ করেন ।
- (৩) বাংলাদেশ মেজর সেমিনারির সূচনা লগ্নে, বিশপদের নির্দেশ মোতাবেক ফাদার পল হাওয়ার্ড, ওএমআই, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেকগুলো সেমিনারি পরিদর্শন করেছেন, তাদের ব্যবস্থাপনা, পাঠ্যক্রম ও অভিজ্ঞতা তিনি সংশ্লিষ্টদের সাথে লিখিত আকারে সহভাগিতা করেছেন ।
- (৪) প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রীলঙ্কার প্রভিসের ওএমআই ধর্মসংঘ বাংলাদেশ মেজর সেমিনারির জন্য তিন জন প্রফেসর দেওয়ার জন্য রাজি হন । তারা হলেন ফাদার

পল হাওয়ার্ড, ওএমআই, ফাদার কার্ল কেলী, ওএমআই এবং ফাদার ফিলিপ ডিসানাইয়িকা, ওএমআই।

(৫) করাচীর খ্রিস্টরাজা উচ্চ সেমিনারির প্রাক্তন রেস্তর ফাদার ইনোসেন্ট, ওএফএম এবং প্রাক্তন ভাইস রেস্তর ফাদার আর্নেস্ট বোয়ার্স, ওএফএম বাংলাদেশের মেজর সেমিনারিতে সেবা দিতে রাজি হন। তারা উভয়েই হলান্ডবাসী ফ্রান্সিসকান ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্য। তারা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আসেন।

(৬) বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ, সিএসসি, ফাদার ভিটে দেল প্রেটে, পিমে-সহ আরও কয়েকজন প্রথম দিকে সেমিনারিতে অধ্যাপনা করেন।

চ ॥ বনানীতে মেজর সেমিনারী স্থানান্তরিত ১৯৭৬ খ্রি.

প্রাথমিক পর্যায়ে বনানীতে সেমিনারি বিল্ডিং নির্মাণ করতে অর্থের সমস্যা ছিল। তথাপি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসের মধ্যে বনানীতে মেজর সেমিনারির প্রথম ধাপের কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং নটর ডেম কলেজের ম্যাথিস হাউজ থেকে মেজর সেমিনারি বনানীতে স্থানান্তরিত হয়।

একই বছর, অর্থাৎ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে ফাদার ফ্রান্সিস সীমা গমেজ উপসনা বিষয়ে এবং ফাদার প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি নীতিশাস্ত্র বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন।

উপসংহার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরপরই বাংলাদেশ মণ্ডলী জাতি গঠনে, দেশ নির্মাণে এবং মণ্ডলীর পরিপক্বতা ও সেবার জন্য অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্থাপন করেছে তার মধ্যে “পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারি” সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলাদেশের বিশপগণ যে দূরদর্শী চিন্তা নিয়ে, চ্যালেঞ্জপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং চলমান পরিচালনা দিয়ে যাচ্ছেন তা যে কত মহৎ, প্রাবৃত্তিক ও ফলপ্রসূ অতি প্রচলিত একটি প্রবচন উল্লেখ করেই ব্যক্ত করা যায়: “বৃক্ষ তোমার নাম কী – ফলে পরিচয়!”

আজ অনেক গর্বের সাথে ও যথার্থতার সাথে বাংলাদেশ মণ্ডলী “পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারি”-র পঞ্চাশ বছরের গৌরবময় সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে।

ভাবনাটা খুবই বিস্মিত করছে যে, বাংলাদেশের মেজর সেমিনারির পঞ্চাশ বছরের পথচলার সূচনা হয়েছিল কেবলমাত্র দু'বছরকালীন চিন্তা-ভাবনার ফলে। বিস্ময়কর প্রভুর পরিচালনা।

তথ্যের উৎস:

ঢাকা আর্চবিশপ হাইজের আর্কাইভ: সিবিসিবি মিনিটস, মেজর সেমিনারি ফাইলসমূহ, সংশ্লিষ্টদের সাথে আর্চবিশপের চিঠিপত্র, ইত্যাদি।

ব্রত- ৪: পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারির সুবর্ণ জয়ন্তী : ধর্মোপদেশ: স্থানীয় মণ্ডলী বিবর্তনে গৌরবময় পঞ্চাশ বছর

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

১২৬ নং সামসঙ্গীতে আছে:

“সত্যিই তো, আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাজ কতোই না বিচিত্র!

আর আমরাও তাই কত আনন্দিত ..

যারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বীজ বুনে যায়,

আনন্দের গান গাইতে-গাইতেই তারা ফসল তুলে আনে।”

এই কথাগুলো দিয়ে “পবিত্র আত্মা মেজর সেমিনারি: স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে গৌরবময় পঞ্চাশ বছর” পূর্তি উৎসবের খ্রিস্টমাগে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমি আপনাদের সবাইকে আহ্বান করছি। পবিত্র আত্মা মেজর সেমিনারি সত্যিই ঈশ্বরের কাজ। তিনি অবশ্য ব্যবহার করেছেন অনেককে যারা চোখের জলে বীজ বপন করেছেন আর আজ আমরা আনন্দে তার ফসল সংগ্রহ করছি।

(প্রকাশিত স্মরণিকা: “পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী প্রতিষ্ঠার পূর্বকথা” নামে আমার একটি লেখা আছে এবং ইংরেজীতে আমার একটা শুভেচ্ছা বানীও আছে। ওখানে রচিত কথা না বলে আজকের শাস্ত্রপাঠে যেরমিয়া: ৩:১৪-১৭; ১করি ১২:৪-১১; যোহন ১০:১১-১৮- এর উপর ভিত্তি করে আমি আমার ধ্যান সহভাগিতা করছি।)

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারির পঞ্চাশ বছরের জয়ন্তী পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলী অবশ্যই গর্বের সাথে স্বীকার করবে যে, এই সেমিনারিটি বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের একটি মহান কীর্তি এবং স্থানীয় মণ্ডলীর অতীব প্রাণের একটি প্রতিষ্ঠান।

পবিত্র আত্মা সেমিনারিটি পবিত্র আত্মারই একটি মহান দান। স্বাধীন বাংলাদেশের শুভ জন্ম-লগ্নে পবিত্র আত্মার এই দানটি বিগত পঞ্চাশ বছরের যাত্রাকালে অভিব্যক্ত হয়েছে বিচিত্র রূপে। আত্মারই পরিচালনে ও দেশের রূপ-রং ও গন্ধ-রসে গঠিত হয়েছে মণ্ডলীর অন্তর, উদ্ভাবিত হয়েছে প্রাণের উৎসধারা যা প্রবাহিত হয়েছে সর্বত্র - দেশের ঘরে ও বাইরে; আর পরিভূষিত করেছে মণ্ডলীকে আত্মার বিচিত্র দানে, বহু সাজে, এবং চারশতাধিক সেবাকর্মী গঠনদানে।

আজকের দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠে পলের কথায় তাই অতি স্বাচ্ছন্দে আমরা বলতে পারি: “বহু আত্মিক দান, কিন্তু দাতা যিনি, পবিত্র আত্মা তিনি এক। - “সমস্ত-কিছুই সেই এক ও অদ্বিতীয় আত্মারই কাজ” - তাঁরই অভিব্যক্তি। তাই আত্মারই অনুপ্রাণনে আমাদের অন্তর-হৃদয় ভরপুর, প্রভুর প্রশংসা-ধন্যবাদ ও আনন্দ-গানে প্রাণ আমাদের উচ্ছসিত, এবং আত্মার কর্ম-কীর্তিতে অবাক ও অভিভূত আমাদের অন্তর-চিত্ত। তাই আমাদের নিবেদন: হে পবিত্র আত্মন, গ্রহণ করো আমাদের বিনম্র ভক্তি-অঞ্জলি, এবং অর্ধশতাব্দির কৃতজ্ঞতার ডালি।

মঙ্গলসমাচারে যিশুর কথা শুনেছি: “আমি উত্তম মেষপালক”। যিশুর এই বাণীই ছিল প্রাণ-প্রিয় সেমিনারির বিরামহীন ও চলমান ভাবনা; এ বাণীই ছিল যাজক হওয়া ও গঠন দেওয়ার রূপরেখা ও আদর্শ; এই মন্ত্রটিই ছিল পথচলার মাপকাঠি এবং ভবিষ্যতের আলোক-দিশা। যিশুর এই কথাকে নিজের করে নিতে গিয়ে কতোবার আমরা খতমতো খেয়েছি জানা-অজানা অতৃপ্তিতে; আবার কতবার উত্তম মেষপালকের অনুকরণে ‘জীবন-বিসর্জন’ দেওয়ার সাধনায় উপলব্ধি করেছি তৃপ্তি ও স্বস্তির আনন্দ।

সেমিনারির গর্ভধারণ মুহূর্ত থেকে, পিতৃ-মাতৃসম ধর্মপালদের কাছ থেকে পেয়েছি বিজ্ঞ নির্দেশনা, পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধনে এগিয়ে এসেছে দেশী-বিদেশী কত ধর্মপ্রদেশীয় যাজক, সন্ন্যাসসংঘের কত সন্ন্যাসব্রতী পুরুষ ও নারী এবং জনগণ থেকে কত বিজ্ঞজন – যাদের পরিচালনা, অধ্যাপনা ও আধ্যাত্মিকতা আজ স্মরণ করি বিনম্র চিন্তে, আর বলিষ্ঠ অভিবাদনে সজোরে উচ্চারণ করি তাদের অবদান ও কীর্তি-গাঁথা।

“আমি আমার মেষগুলিকে জানি আর আমার মেষগুলিও আমাকে জানে” – যিশুর এই উক্তি আমাদের যাজকীয় জীবনে “জানা”র মধ্যে যতটুকু উপলব্ধি করেছি ঠিক ততখানি হয়তো উপলব্ধি হয় নি “ভালবাসা”র মধ্যে। যতটুকু যিশুর এই উক্তি সত্য হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনে, ততটুকুর জন্য আনন্দমনে প্রভুর প্রশংসা করি এবং জয়ন্তী উৎসবে যিশুর এই উক্তিকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করি।

আগে যেমন বলেছি পবিত্র আত্মার সেমিনারি বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলীর একটি প্রাণের প্রতিষ্ঠান। মণ্ডলীর প্রাণের মধ্যে আছে যাজক, আছে সন্ন্যাসব্রতী পুরুষ ও নারী আর আছে আমাদের প্রাণপ্রিয় ভক্তজনগণ। পঞ্চাশ বছর পূর্বে সেমিনারি প্রতিষ্ঠার সূচনা-লগ্নে, মতামত ব্যক্ত হয়েছিল যে, প্রস্তাবিত সেমিনারিটি শুধু সেমিনারিয়ানদের জন্য নয়, বরং এখানে গঠন পাবে ভাবী যাজকদের পাশাপাশী সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার ও সিস্টারগণ এবং মণ্ডলীর ভক্তজনগণ। আরও স্বপ্ন ছিল সেমিনারি হবে স্থানীয় মণ্ডলীর ঐশতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা ও আধ্যাত্মিকতা বিকাশের একটি কেন্দ্র। এখান থেকে উদ্ভাবিত হবে খ্রিস্টীয় বাংলা সাহিত্য রচনা। এই ক্ষেত্রে কোনো মনোযোগ যে দেয়া হয়নি তা নয়। একাধিক সময়ে, বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার জন্য মণ্ডলী উপকৃত ও

সেমিনারির প্রতি এই জয়ন্তী উৎসবে মণ্ডলী কৃতজ্ঞ। তবে এই বিষয়ে সেমিনারির সেবাকে সম্প্রসারিত করা এবং ঐশতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতায় গভীরতা লাভ এবং খ্রিস্টীয় সাহিত্য বিকাশ-সাধনের একটি জোরদার আবেদন সর্বদাই শোনা গেছে। এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ, সুবর্ণ জয়ন্তীকে আরও সুদূরপ্রসারী করে তুলবে এবং উৎকর্ষের গভীরতায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে যাবে।

প্রথম শাস্ত্রপাঠে আমরা যেরেমিয়ার মুখ থেকে এই কথা শুনেছি: “আমি তোমাদের আমার হৃদয়ের মতো পালকদের দেব, তারা সদৃজ্ঞানে ও সুবুদ্ধিতে তোমাদের চরাবে।” (যেরেমিয়া ৩:১৫)। পরমেশ্বরের এই প্রাবক্তিক উক্তি সেমিনারির বিগত ৫০ বছরে কার্যকর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে যেরেমিয়ার কথার মধ্যে আমরা আজ শুনতে পারছি ভাবী প্রতিশ্রুতি ও নতুনের আহ্বান।

সম্প্রতিকালে আমরা জগতে ও মণ্ডলীতে বিচিত্র ও নতুন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছি; সেখানে দেখছি নতুন বিষয়, নতুন ধারণা, নতুন আহ্বান; আসলে কিন্তু তা অতি পুরাতন, মঙ্গলসমাচার মূর্তায়নের জন্য আনন্দময় আহ্বান। আর এই প্রসঙ্গে: “আমি তোমাদের আমার হৃদয়ের মতো পালকদের দেব, তারা সদৃজ্ঞানে ও সুবুদ্ধিতে তোমাদের চরাবে” (যেরেমিয়া: ৩:১৫) – যেরেমিয়ার এই বাণী আমরা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রাবক্তিক বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে চাই।

মণ্ডলীকে নবায়ন করার ভাবনা এসেছে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা থেকে – যার সূচনা হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। আজ ষাট বছরের ইতিহাসের মধ্যে বাংলাদেশের পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারি পঞ্চাশ বছরের পথচলা অতিক্রম করেছে। এই সুবর্ণ জয়ন্তী-লগ্নে দাঁড়িয়ে, বর্তমান পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের কাছ থেকে এই উক্তি শুনছি: “দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভাকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে।” এই উদ্দেশ্যে তিনি ডাক দিয়েছেন “সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী” গড়ার কাজে।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে যিশুর মঙ্গলসমাচার হবে সবার জন্য একমাত্র চলার পথ। মঙ্গলসমাচারপ্রসূত হবে সবার জীবন, মঙ্গলবাণীর আনন্দময় ঘোষণা হবে তাদের একমাত্র মিশন। এই মিশনের লক্ষ্যে মণ্ডলী একসঙ্গে পথ চলবে। মণ্ডলীকে হতে হবে মিলন-সমাজ – অন্যান্য মণ্ডলী ও ঐশজগণকে নিয়ে মিলন-সমাজ এবং যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনের মিলন-সমাজ। বর্তমান সময়ে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন তা ব্যক্তি ও সমবেতভাবে, ধ্যানে ও প্রার্থনায়, আত্মিক অবধারণের মাধ্যমে সবাই তা শ্রবণ করবে। মিলন-সমাজে সবার অংশগ্রহণে মণ্ডলী একসঙ্গে পথ চলবে। ধর্মপাল-যাজক-সন্ন্যাসব্রতী-ভক্তজনগণ – তাদের আপন আপন মর্যাদা ও মিশন অনুসারে অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলী গড়ে তুলতে সহযাত্রী হবে।

এই ধরনের মিশনধর্মী ও অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলীকে গঠন করতে হলে যে-ধরনের যাজক প্রয়োজন হবে, তার ইঙ্গিত পাই যেরেমিয়ার প্রবক্তার মুখে, অর্থাৎ যাজক হবেন পরমেশ্বরের “হৃদয়ের মতো পালক” – সর্বশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতা, তারা “সদৃশ্য ও সুবুদ্ধিতে চারন করবে” – হৃদয়ের মতো উত্তম মেঘপালকের বৈশিষ্ট্য।

পোপ ফ্রান্সিস সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে যাজকদের পরিচয় আরও বাস্তব করে বলেছেন যে, “তাদের গায়ে থাকবে মেঘের গন্ধ”, তারা হবেন “ক্লারিকালিজম” থেকে মুক্ত, তারা হবেন পা-ধোয়ানোর কাছে নিয়োজিত সেবাকর্মী-কর্তৃপক্ষ।

যাজক হবেন মঙ্গলসমাচার-বোধী ব্যক্তি; তিনি হবেন দীন-দুঃখী, পাপীতাপী, হারিয়ে-যাওয়া, পিছিয়ে-পড়া এবং দুর্ভাগাদের দরদী বন্ধু; তিনি হবেন ক্ষমাদানকারী সেবক, মিলন-সাধক ও শান্তি স্থাপক; তিনি হবেন প্রকৃতি- প্রেমিক, অভিবাসীদের সহযাত্রী, শিশু ও নারীদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষাকারী সেবক। সংক্ষেপে তিনি হবেন “সিনড-বিশিষ্ট” মণ্ডলীর যাজক।

যাজকদেরকে পরমেশ্বরের “হৃদয়ের পালক” হতে হলে, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, প্রথমেই প্রয়োজন “পরিবর্তন” – চিন্তাধারার কাঠামো পরিবর্তন এবং হৃদয়ের পরিবর্তন।

তাই প্রিয়জনরা, সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে, আমরা সকল ফসল-প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের জয়কীর্তন করি, নশ্রভাবে স্বীকার করি অতীতের সকল অযোগ্যতা এবং ভবিষ্যত যাজক হওয়া ও যাজকীয় গঠনকাজে সিনড-প্রক্রিয়ায় পথচলার অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করি।

পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের কথা অনুসারে পবিত্র আত্মা সেমিনারী হবে “School of the Gospel”, “যিশুর মঙ্গলসমার শিক্ষালয়”। এ মহৎ কাজে ঈশ্বর আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন। আমেন।

ৱচনা- ৫ : স্মৃতিয় মণ্ডলীর উত্থানে নটর ডেম কলেজের অবদান

নটর ডেম কলেজের পাঁচাত্তর বছরের পূর্তি একটি শুভ মুহূর্ত। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির হীরক জয়ন্তী উৎসব একটি মিলন-মোহনা – একদিকে মানুষের মিলন-মোহনা আবার অন্য দিকে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত – এই ত্রিকালের মিলন-মোহনা। এই মিলন-মোহনায় দাঁড়িয়ে অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখছি তার আদি ও গোড়াপত্তন, বর্তমানকে লক্ষ্য করে দেখছি তার কীর্তি ও অবদান এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে জাগ্রত হচ্ছে নতুন স্বপ্ন ও অঙ্গীকার। এখানেই তো জয়ন্তী উৎসবের সার্থকতা।

নটর ডেম কলেজের গোড়ার কথা

নটর ডেম কলেজ কাথলিক চার্চ-এর (মণ্ডলীর) একটি প্রতিষ্ঠান। আদিটা কিছু স্থানীয় নয় বরং বিশ্বজনীন। প্রায় সোয়া দুই সহস্রাব্দ পূর্বে প্রভু যিশু এই পৃথিবী থেকে স্বর্গধামে চলে যাবার আগে তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করেছিলেন এই বলে: “যাও, সমস্ত জাতির মানুষের কাছে যাও, তাদের শিক্ষা দাও”। যিশুর শিষ্যেরা যুগের পরিক্রমায় ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে যিশুর সেই অমৃতবাণী নিয়ে। তারও পনেরোটি শতক পর সমুদ্রপথে যাত্রা করে যিশুর শিষ্যদের উত্তরাধিকারী মিশনারিরা বঙ্গভূমিতে এসে পৌঁছলো। বিদেশ থেকে মিশনারিরা যখন ও যেখানেই গেছেন প্রথমেই তারা মানুষকে শিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে নিয়ে গেছেন। একই ধারাবাহিকতায় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কাথলিক চার্চের একটি মিশনারি ধর্মসংঘ – “হলি ট্রাস সংঘ” হিসেবে যারা পরিচিত – তারা বঙ্গভূমিতে আগমন করেন। তারা পুরনো ঢাকা শহরে লক্ষীবাজারে অবস্থান করে শিক্ষাসেবার কাজ শুরু করেন।

সেন্ট গ্রেগরি নামে শিশু শ্রেণি থেকে শুরু করে, পর্যায়ক্রমে প্রাইমারী, জুনিয়র এবং হাইস্কুল হিসেবে সুদীর্ঘ বছর ধরে অবস্থান করে পরিশেষে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে এক পর্যায়ে “সেন্ট গ্রেগরি কলেজ” প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট গ্রেগরি কলেজের নাম পরিবর্তন করে মতিঝিল এলাকার নতুন ক্যাম্পাসে “নটর ডেম কলেজ” নামে নতুন পরিচয় লাভ করে। গ্রেগরি কলেজের প্রতিষ্ঠা বছর থেকে গণনা করে বর্তমানে নটর ডেম কলেজটি তার হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে। কলেজের নাম পরিবর্তনের পেছনে যে কারণটি ছিল তা হল গ্রেগরি কলেজের প্রাথমিক অবস্থায় যে সমস্ত আমেরিকান হলি ট্রাস মিশনারি ফাদারগণ বাংলাদেশে এসে কলেজে কাজ ও অধ্যাপনা করতেন তারা প্রায় সবাই যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত প্রখ্যাত নটর ডেম ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করেছেন এবং সেখান থেকে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করে বাংলাদেশে এসেছেন। হলি ট্রাস ইন্ডিয়ানা ফাদার-প্রোভিস-এর অধীনস্থ নটর ডেম

ইউনিভার্সিটির সহায়তায়, জনবল ও অর্থবল দিয়ে ঢাকার নটর ডেম কলেজের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এই সব কারণেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নাম “নটর ডেম কলেজ” রাখা হয়।

“হলি ক্রস সংঘ” বিশ্বজনীন কাথলিক চার্চ বা মণ্ডলীর একটি ধর্মসংঘ। ধর্মসংঘের কাজ কাথলিক চার্চের মিশন সম্পন্ন করা, আবার কাথলিক চার্চের মিশনও সম্পাদিত হয়ে থাকে ধর্মসংঘের উদ্যোগ, আদর্শ, বিশেষত্ব অনুযায়ী সেবাকর্মের মাধ্যমে। অতএব চার্চ এবং হলিক্রস ধর্মসংঘ, বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলীতে পরস্পর সম্পূরকতার ভাব নিয়ে সেবাকাজ সম্পন্ন করে থাকে। এই কথা অনুসরণে বলা যায় যে, নটর ডেম কলেজটি বাংলাদেশ কাথলিক চার্চের আওতাভুক্ত হলি ক্রস ধর্মসংঘ দ্বারা পরিচালিত। নটর ডেম কলেজ যে-ভূমিকা ও অবদান দেশব্যাপী বৃহত্তর সমাজে এবং স্থানীয় মণ্ডলীতে রেখে যাচ্ছে তা স্থানীয় মণ্ডলী ও হলি ক্রস সংঘ – শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়েরই অবদান।

বিগত পঁচাত্তর বছর ধরে চার্চের মিশন-দায়িত্বের অংশীদার হিসেবে নটর ডেম কলেজ দেশ, জাতি ও জনগণের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রমধর্মী ও অতুলনীয় সেবা ও বিরাট অবদান রেখে যাচ্ছে। আশা করি এ বিষয়ে পৃথকভাবে বহুজনের আলোচনা স্মরণিকায় স্থান পাবে। বাংলাদেশে চার্চের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই কাথলিক চার্চ, দেশ ও জাতি নির্মাণের জন্য, প্রয়োজনের তাগিদে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে, যার মধ্যে নটর ডেম কলেজ অন্যতম। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার মাত্র দুবছরের মাথায় সেন্ট থ্রেগরি কলেজ (নটর ডেম কলেজের প্রথম নাম) স্থাপন করা হয়; তারই পঁচাত্তর বছরের পূর্তি বা হীরক জয়ন্তী পালন করছি। ঠিক একই ভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই দেশ ও জাতি নির্মাণের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর সাথে কাথলিক চার্চেরও অনেক প্রতিষ্ঠান সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে। এই ধারাটা একটা তাৎপর্য বহন করে: জনগণের আশু চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের কাথলিক চার্চ বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে থাকে।

নটর ডেম কলেজের অবদান

হলি ক্রস সংঘ-সহ স্থানীয় মণ্ডলী বা চার্চের জন্য, শিক্ষাক্ষেত্রে নটর ডেম কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানসমূহ চিহ্নিত করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন:

- ১) নটর ডেম কলেজ বিগত দশকগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী, ব্যতিক্রমধর্মী, আদর্শিক, মূলবোধসম্পন্ন এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা দান করেছে, সুনামধারী ও সুখ্যাতিপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বিগত বছরগুলোতে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে; নটর ডেম কলেজ একটি অনুকরণীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশ ও সরকারের নিকট স্বীকৃতি লাভ করেছে।

- ২) নটর ডেম কলেজের লক্ষ্য মানুষ গড়া, আলোকিত মানুষ গঠন করা; পরীক্ষায় পাশ করা বা ভাল ফল পাওয়া প্রধান উদ্দেশ্য নয়।
- ৩) শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি, মানবিক ভ্রাতৃত্ব এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্র গঠনে নটর ডেম কলেজ অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রাকৃতিক, মানবিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের চর্চা, দেহ-মন-আত্মার সমন্বিত বিকাশ সাধন, সৃষ্টি ও পরিবেশের প্রতি এবং দরিদ্র ও বিপর্যস্ত মানুষের প্রতি যত্ন ও ভালবাসা, প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্যকে সর্বজনীন করে নটর ডেম কলেজ পরিচালিত হচ্ছে।
- ৪) জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সকলের জন্য নটর ডেম কলেজ উন্মুক্ত। তবে যিশুর শিক্ষা অনুসারে নটর ডেম কলেজ দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এর ফলে গ্রাম থেকে আসা শিক্ষার্থীরা, দরিদ্র ছেলেরা এবং আদিবাসী বা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ছেলেরা পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এই নীতি আছে বলে স্থানীয় মণ্ডলীর প্রান্তিক ছেলেরা ভাল শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং অন্যদের সাথে সমান কাতারে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। নটর ডেম কলেজটি যেন সবাইকে নিয়ে: বাঙালি ও আদিবাসী/ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর ছেলেরা, বিভিন্ন ধর্মের ছেলেদের নিয়ে একটি পরিবার ও মিলন সমাজ হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে।
- ৫) বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের সংখ্যা খুবই নগন্য, ক্ষুদ্র যেমন জনগোষ্ঠি, সম্ভাবনা তেমনি সীমিত। তথাপি শিক্ষা ক্ষেত্রে, নটর ডেম কলেজের মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজে খ্রিস্টমণ্ডলীর ধারণা, আদর্শ, তার উপস্থিতি ও শুভ প্রভাব খুবই পরিচিত ও ব্যাপক। স্থানীয় মণ্ডলী এই অবদানের জন্য নটর ডেম কলেজের নিকট কৃতজ্ঞ।
- ৬) কলেজের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে মণ্ডলীর যাজক-প্রার্থী এবং সন্ন্যাসব্রতী যাজক ও ব্রাদারগণ নটর ডেম কলেজের মতো শ্রেষ্ঠ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করার সুযোগে পেয়েছে। নটর ডেম কলেজে বি.এ. ডিগ্রী কোর্স অব্যাহত রাখা হয় প্রধানত ভাবী যাজক প্রার্থীদের পড়াশুনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। দেশের প্রান্তিক অঞ্চল থেকে আসা সেমিনারিয়ানগণ, বিভিন্ন সেমিনারিতে বাস করে নটর ডেম কলেজে বি.এ. পড়াশুনা করার সুযোগ পাচ্ছে কেননা তাদের জন্য বি.এ. ডিগ্রী লাভ করা পরিবর্তী ধাপের জন্য বাধ্যতামূলক। বি.এ. ডিগ্রী চলমান রাখার জন্য এবং তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করার জন্য নটর ডেম কলেজকে অনেক ত্যাগস্বীকার করতে

হয়েছে। তথাপি যে-মণ্ডলী সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ দিতে চায় সেই মণ্ডলীর সেবাকর্মী যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীরা যদি ভাল শিক্ষা ও গঠন না পায় তাহলে স্থানীয় মণ্ডলী ও হলি ক্রস সংঘের শিক্ষা-সেবা ব্যাহত হবে। হলি ক্রস সংঘ-সহ স্থানীয় মণ্ডলী এই অবদানের জন্য অনেক কৃতজ্ঞ। মণ্ডলীর যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীবৃন্দ ছাড়াও অনেক খ্রিস্টবিশ্বাসীরা এই কলেজে পড়াশুনা করে বৃহত্তর সমাজে এবং খ্রিস্টমণ্ডলীতে নেতৃত্ব ও সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এর জন্যও স্থানীয় মণ্ডলী হলি ক্রস সংঘ এবং নটর ডেম কলেজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

- ৭) স্থানীয় মণ্ডলীর একটি মিশন হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক, মানবিক ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতার মূল্যবোধসম্পন্ন একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই ক্ষেত্রে নটর ডেম কলেজ একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। নটর ডেম কলেজ চার্চের একটি প্রতিষ্ঠান হলেও সেখানে সবার মধ্যে রয়েছে একটি সুন্দর সম্পর্ক। নটর ডেম কলেজের পরিচালনার ভার হলি ক্রস সংঘের ফাদারদের হাতে ন্যস্ত থাকলেও, পরিচালনায়, প্রশাসনে, শিক্ষকমণ্ডলীতে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং আন্তঃধর্মীয় একটা সুসম্পর্ক রয়েছে। এদিক থেকে নটর ডেম কলেজও একটি দৃষ্টান্তমূলক অবদান রেখে যাচ্ছে।
- ৮) নটর ডেম কলেজের সূচনা মুহূর্ত থেকে, পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এক মুহূর্তে হলি ক্রস সংঘ, কলেজের সহায়তায় ওয়ার্ক প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে যেখানে দরিদ্র ছেলেরা কিছু আয় করে শিক্ষা ব্যয় ও হোস্টেল খরচ বহন করতে পারে। এই দিক থেকেও স্থানীয় মণ্ডলী নটর ডেম কলেজ দ্বারা বেশ উপকৃত হচ্ছে।
- ৯) পরিশেষে বলা যায় যে, বৃহত্তর দেশের জনগণের সেবার পাশাপাশি স্থানীয় মণ্ডলীকে বাংলাদেশের মাটিতে সুপ্রোথিত করতে, শিক্ষায় সম্পদশালী করতে, সেবাকর্মী গঠন করতে, শিক্ষিতদের নেতৃত্ব বৃদ্ধি করতে, বঞ্চিত মানুষের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দিতে, ভাল শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে, দরিদ্রদের সেবা করতে, সব ধর্ম ও শ্রেণীর মানুষের সাথে মিলন সৃষ্টি করতে, খ্রিস্টীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ তুলে ধরতে, ... আরও কতো ভাবে, নটর ডেম কলেজ বিগত ৭৫ বছর ধরে বর্ণাশ্রম ও অসংখ্য অবদান রেখে যাচ্ছে তার জন্য হীরক জয়ন্তীতে স্থানীয় মণ্ডলী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

নটর ডেম কলেজের জন্য ভাবী স্বপ্ন

হীরক জয়ন্তী উৎসবে ভবিষ্যতের জন্য আমি দুটো স্বপ্ন তুলে ধরাছি। প্রথম স্বপ্নটা হচ্ছে: নটর ডেম কলেজ যেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলীর নৈতিক গঠন আরও জোরদার করে এবং সকল গৃহীত পদক্ষেপের প্রত্যাশিত ফল উৎপাদনে নজর রাখে। দেশ গড়া, নেতৃত্ব দান ও সেবাকাজে নটরডেমিয়ানরা যেন কোন ভাবে দুর্নীতির দোষে দৃষ্ণীয় না হয়; দুর্নীতির কারণে তারা যেন প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত না হয়। দুর্নীতি দেশের উন্নয়নে বিরাট শত্রু। দুর্নীতির বিপরীতে চলতে হবে এবং সামর্থ অনুসারে তা ঠেকাতে হবে।

দ্বিতীয় স্বপ্ন হচ্ছে: নটর ডেম কলেজ সবাইকে নিয়ে এমন একটি পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলবে যা হবে বৃহত্তর দেশ ও জাতি, এমন কি বিশ্বের একটি নিদর্শন স্বরূপ। এই বিশ্বে আমরা সবাই ভাইবোন, তা আমরা যে ধর্মেরই হই না কেন, যে কৃষ্টি ও জাতিরই হই না কেন। নটর ডেম কলেজের পরিবারের মধ্যে এমন একটি কৃষ্টি গড়ে উঠবে যেখানে একটি ধর্ম বা কৃষ্টি বা জাতিগোষ্ঠির লোক অপরকে শ্রদ্ধা-সম্মান করবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের মানবব্যক্তি মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করবে। মানবিকতা ও মানবিক ভ্রাতৃত্বে গঠন হবে নটর ডেমের শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি। মানব-ভ্রাতৃত্বের অভাবই প্রকাশ করছে আমাদের দেশ, সমাজ ও বিশ্বের মূল সমস্যা। নটর ডেম কলেজ পারবে আমার বিশ্বাস এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে।

রচনা- ৬ : অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট : প্রাচ্যের প্রতিষ্ঠান

এই বাণীটা লিখতে গিয়ে আমার অন্তরে আছে অত্যন্ত আনন্দময় একটি অনুভূতি, এ কারণে যে, আগামী ৩০-৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে “অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট”-এর পঁচাত্তর বছরের পূর্তি উদ্‌যাপন করা হবে। বড়ো সৌভাগ্য হবে আমরা যদি উপস্থিত থাকতে পারি। “অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট”-এর সাথে আমার দীর্ঘ ৬৮ বছরের সখ্যতা, আনা-গোনা, সংযোগ, বসবাস ও কর্মস্থল। বহুদিনের একটি ইতিহাস দৃশ্যমান হয়ে আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ঘিরে, কানাডা থেকে আগত হলি ক্রস মিশনারি ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারদের সাথে আমার দীর্ঘ সময়ের পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল। তবে দুঃখের বিষয় যে, তারা আজ কেউ জীবিত নেই। আনন্দময় স্মৃতির সাথে দুঃখের অনুভূতিটা মিশে আছে। এ কারণেই হয়তো স্মৃতিটা এতো মধুর ও আবেগিক।

“অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট” নামকরণ হয়েছে তার জন্মের ৯ বছর পরে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। নামকরণের পূর্বে তিনভাবে প্রতিষ্ঠানটি আখ্যায়িত হয়েছিল তার কার্যক্রমের মাধ্যমে: (ক) বিদেশী মিশনারীদের গঠন-গৃহ (খ) সেক্রেড হার্ট স্কলাস্টিকেট এবং (গ) হলিক্রস নবিসিয়েট। আপন জন্মের আগে “অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট” জন্ম দিয়েছে আরও তিনটি প্রতিষ্ঠান, নিজের জন্মের প্রস্তুতি স্বরূপ। এ যেন দীক্ষাগুরু যোহনের মতো পূর্ব-প্রস্তুতির ভূমিকা।

তিন দশক ধরে “অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট” তার আপন সত্তার বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে অনেকটা নিষ্ক্রিয় করে বৃহৎ আকারে আপন গর্ভে ধারণ করল আরও দুটো প্রতিষ্ঠান: (ক) হলিক্রস নবিসিয়েট এবং (খ) “পালকীয় সেবাকেন্দ্র ও ধ্যানাশ্রম”। দীক্ষাগুরু যোহনের উক্তি আবার সত্য হল: “তুমি বৃদ্ধি পাবে এবং আমি হাস্য পাব”।

“অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট” অতীতকে ধরে রেখে এবং নতুনদের আবির্ভাব ঘটিয়ে আপন স্বকীয় সত্তায় পঁচাত্তর বছরের ইতিহাস এবং কার্যক্রম নিশ্চিত করে রাখছে। “অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট”-টি অপরের তরে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েই আপনকে করে রেখেছে চলমান ও প্রগতিশীল। তাই নির্দিষ্টস্বয়ং সবাই তাকে ডাকে “অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট” নামে।

“অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট”-এর প্লাটিনাম জুবিলীর আয়োজনে নিজ থেকেই অনুপ্রাণিত হলাম একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখতে। এই উৎসবেই উন্মোচিত হচ্ছে ইতিহাসের একটি ছোট্ট বই। “হলি ক্রস নবিসিয়েট” এবং “অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট: পালকীয় সেবাকেন্দ্র ও ধ্যানাশ্রম” – এ দুটো ভাগে ইতিহাসটি রচনা করা হয়েছে।

বিগত শতাব্দির চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাট দশকে “পাশ্চাত্য” মণ্ডলী বিশেষভাবে “প্রাচ্য”-এর প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছিল। মণ্ডলীর ঐশতাত্ত্বিক ও ঔপাসনিক দিক, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভাষা-সঙ্গীত, আদর্শ, নীতি ও মূল্যবোধ, চিন্তাধারায় সেই মনোযোগের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। কানাডার হলিক্রস ফাদার-ব্রাদার ও সিস্টারদের মধ্যে সেই “প্রাচ্য” ভাব আদান-প্রদান করার জন্য মন্ট্রিয়াল থেকে ফরাসী ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হত যার নাম ছিল: ORIENT (“ওরিয়ঁ”), অর্থাৎ “প্রাচ্য”। পত্রিকাটি ১৯৫২-১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচ্যের প্রতি তাদের মনোযোগ ও গুরুত্বের কারণেই মূলতঃ “অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট” (ORIENTAL INSTITUTE) নামকরণ করা হয়। নামকরণের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠানটির ৭৫ বছরের ইতিহাস ও কার্যক্রমের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

“অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট” শীর্ষক প্রতিষ্ঠানটি ঘিরে বিগত ৭৫ বছরে যা-কিছু গুরুত্ব পেয়েছে তার একটি ক্ষুদ্র তালিকা এখানে তুলে ধরছি: (১) নবাগত মিশনারীদের জন্য বাংলা ভাষা, প্রাচ্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সঙ্গীত, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে গঠন; (২) নোয়াখালী হলিক্রস নবিশিয়েট করা প্রথম সন্ন্যাসব্রতী যাজকপ্রার্থী ও ব্রাদারদের গঠন-গৃহ: “সেক্রেড হার্ট স্কলাস্টিকেট”, যেখানে তারা আই.এস.সি ও বি.এস.সি পড়াশুনা করত। (৩) নবাগত মিশনারীদের জন্য প্রেরিতিক ও পালকীয় প্রস্তুতি: দেশীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম ও সংলাপ সম্বন্ধে গঠন। (৪) দেশের ভাবি ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারদেরকে দেশীয় কৃষ্টি ও ভাবধারায় গঠন। (৫) দেশের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা ও গঠন। (৬) হলিক্রস নবিশিয়েট: হলিক্রস ব্রাদার ও ফাদারদের প্রার্থীদের জন্য নবিশিয়েটের গঠন। (৭) “অরিয়েন্টাল অ্যাকাডেমি অব মিউজিক” – সঙ্গীত শিক্ষা ও ডিপ্লোমা প্রদান। (৮) উপাসনার জন্য গান ও বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা, স্বরলিপিসহ গান রচনা, সুর ও কণ্ঠ শিক্ষা; (৯) পালকীয় সেবাদলের বাসস্থান ও কার্যালয়; (১০) “অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট” ছিল দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা অনুসারে বাংলাদেশ মণ্ডলীর নবায়নের একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে বহু কর্মসূচি: সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স, শিক্ষা কোর্স, মণ্ডলীর ঐশতত্ত্ব, মণ্ডলীর ধারণা, মিশন, উপাসনা, বাইবেল শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, যুবগঠন, ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ, বাংলাদেশ মণ্ডলীর পালকীয় পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষা ও গঠন, যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী

জীবনের চলমান গঠন, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমণ্ডলিক সংলাপ ও কর্মসূচি, জনপ্রতিনিধিদের ও নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণ, ধর্মীয় সংগীত, কর্মীদের গঠন ও প্রশিক্ষণ, সমাজ-উন্নয়ন, কো-অপারেটিভ ও ক্রেডিট ইউনিয়ন, ইত্যাদি।

বিগত পাঁচাত্তর বছর ধরে “অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট”-এর আওতাভুক্ত ও পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠান বরিশাল কারিতাস ও ভেতরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, তাদের নিজস্ব, পুরাতন ও নতুন এবং সংস্কারিত কার্ঠামো-অবকার্ঠামোসহ পাশাপাশি অবস্থান করে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে কাজ করে আসছে।

পরিশেষে “অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট” ছিল দেশীয় মণ্ডলীর জন্য একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্কুল-কলেজ ছাড়া বাংলার মণ্ডলীতে এই ধরনের শিক্ষা ও গঠনের জন্য প্রতিষ্ঠান যুগের প্রয়োজনে উদ্ভব হয়েছে এবং যুগের চাহিদা পূরণ করে এসেছে। সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত বিদেশী ও দেশী হলি ক্রস ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার, লে-মিশনারী, স্থানীয় শিল্পী, শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মী ও কর্মচারী, যারা তাদের স্বপ্ন, বুদ্ধি, মেধা, শ্রম, সেবা, ত্যাগ ও অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত ও পরিচালিত করেছেন এবং দীর্ঘকাল ধরে মণ্ডলীতে অবদান রেখে গেছেন তাদেরকে আমরা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এবং অভিনন্দন জানাই। তাদের চোখের জলে বোনা বীজ থেকে আমরা আজ জয়ন্তীর আনন্দ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে ফসল সংগ্রহ করে চলছি।

“অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট”-এর পূর্ব পথিকৃতদের সংখ্যা ছিল খুবই স্বল্প কিন্তু অবদান রেখে গেছেন অসংখ্য। বর্তমানে হলি ক্রস ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের সংখ্যা অনেক, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিসর সম্প্রসারিত হয়েছে। আমরা কি সবাই মিলে একসঙ্গে সাম্প্রতিক যুগের লক্ষণ যাচাই করতে পারি না? বর্তমান প্রেক্ষাপটে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের মতো একটি “অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট”-এর স্বপ্ন আমরা কি দেখতে পারি না? মণ্ডলীর জন্য হলি ক্রস ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারগণ একত্রে মিলে, নিজেদের গঠন ও উন্নয়নের জন্য এবং বাংলাদেশের মণ্ডলীর জন্য প্রাচ্যের দর্শন-ভাবধারা-কর্মপ্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ হয়ে “অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট”-এর মতো ব্যতিক্রমধর্মী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা কি ভাবতে পারি না? – যেখানে বাংলাদেশ ও মণ্ডলীর জন্য থাকবে: বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলমান শিক্ষা, গঠন ও প্রশিক্ষণ, তথ্য ও গবেষণাকেন্দ্র, সামাজ উন্নয়ন ও সমাজ বিশ্লেষণ, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক বিষয় অধ্যয়ন ও সংলাপ, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ অন্বেষণ ও চর্চা, পালকীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা, ইত্যাদি। উপসংহারে এই প্রশ্নগুলো সবার চিন্তার জন্য রেখে গেলাম। প্রত্যাশা একদিন স্বপ্ন পূরণ হবে – ব্যক্তির স্বপ্ন নয়, বরং মণ্ডলী এবং হলি ক্রস সংঘের স্বপ্ন।

চরচর- ৭: ঢরকর খ্রিস্টরন কো-অপররেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন: সগুদশক পূর্তিস্থলে সগুবরণী

ঢরকর ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট জররুরীভাবে ফোন করে আমাকে অনুরোধ করলেন ঢরকর খ্রিস্টরন কো-অপররেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার সন্তর বছর পূর্তিতে ফাদার চার্লস ইয়িং, সিএসসি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখতে। প্রেসিডেন্টের ধারণা যে, আমি ফাদার ইয়িংকে ভালভাবে চিনি, ব্যক্তিগত ভাবে তার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। তাই কয়েক ঘন্টার মধ্যে লেখাটা দেওয়া আমার জন্য কোনো ব্যাপারই নর। আসলে ফাদার ইয়িং-এর সাথে আমি ততো পরিচিত ছিলাম নর, তার সাথে আমার অভিজ্ঞতা বলতে তেমন কিছুই নেই। তথাপি প্রেসিডেন্টের একান্ত অনুরোধ যে, সন্তর বছর পূর্তিতে আমি যেন অন্ততঃ একটি বরণী লিখে পাঠাই।

বাংলাদেশে “ক্রেডিট ইউনিয়নের জনক” বলে যিনি পরিচিত এবং “ঢরকর খ্রিস্টরন কো-অপররেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের স্থপতি” বলে যিনি অভিহিত সেই শ্রদ্ধাভাজন ফাদার চার্লস ইয়িং-এর প্রতি নিবেদন করি আমাদের অফুরান ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং গভীর কৃতজ্ঞতা। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই, সকল ক্রেডিট ইউনিয়নের অগ্রদূত, ঢরকর খ্রিস্টরন কো-অপররেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন নামে যে অভিনব প্রতিষ্ঠানটি সূচনা হয়েছিল, তার সন্তর বছর পূর্তিতে আমরা উপলব্ধি করছি যে, সেই প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত দ্রুততম গতিতে খ্রিস্টরন সমাজের মধ্যে একটি বিরটি অর্থনৈতিক বিপ্লব এবং আমূল সামাজিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। যারা সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত ঢরকর ক্রেডিটে নেতৃত্ব, সেবা এবং অবদান রেখেছেন তাদের সবার প্রতি রইল আমাদের সাধুবাদ।

ঢরকর খ্রিস্টরন কো-অপররেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সগুদশক বার্ষিকীতে স্মরণ করি ঢরকর ক্রেডিট ইউনিয়ন সহ আরো অনেক ক্রেডিট ইউনিয়ন যাদের সাথে বিগত কয়েকটি দশকের যাত্রাকালে আমার মনের মধ্যে যে-ভাবনাগুলো জাগ্রত হয়েছে তার যৌক্তিকতাপূর্ণ আলোচনা ও বিশ্লেষণ নর করে, সহজ-সরল ভাষায় সকল ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরি।

এক: খ্রিস্টরন ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো মণ্ডলীর সংশ্লিষ্ট সামাজিক শিক্ষা দ্বারা কতটুকু পরিচালিত তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা?

দুই: একত্রে একাধিকবার ছোট ছোট দলে বসে পরস্পরের কথা শ্রবণ করা।
ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে ঈশ্বর খ্রিস্টরন সমাজকে কী বলছেন তা শ্রবণ করা।

তিন: ফাদার ইয়াং-এর কথা: “আমাদের সঞ্চয়গুলো হল ঘোড়া আর ঋণগুলো হচ্ছে গাড়ি। আমরা যেন কখনও ঘোড়ার আগে গাড়ি না রাখি” – এই উক্তির প্রেক্ষাপটে বর্তমান ক্রেডিট ইউনিয়ন নিয়ে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা।

চার: গ্রাম বা নির্দিষ্ট একটি তৃণমূল এলাকায় ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজের সমন্বিত উন্নয়নকাজে কীভাবে সম্পৃক্ত আছে এবং স্থানীয় খ্রিস্টান সমাজ বা মণ্ডলীর মধ্যকার সম্পর্ক কীরূপ তা নিয়ে আলোচনা করা।

পাঁচ: সাম্প্রতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে, ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় একটি বাস্তবধর্মী সমীক্ষণ ও গবেষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতের পথচলা চিহ্নিত করা।

ছয়: স্থানীয় খ্রিস্টান সমাজের টেকসই উন্নয়নের জন্য ক্রেডিট ইউনিয়নের ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সাত: এ বছরে মণ্ডলী জুবিলী ২০২৫ খ্রি. বর্ষকে পুণ্যবর্ষ রূপে পালন করছে। জুবিলীর সামাজিক একটি দিক হচ্ছে হতদরিদ্র মানুষ যেন দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। যারা ঋণগ্রস্থ তাদের মধ্যে যারা অতি দরিদ্র তারা কি ঋণমুক্ত হতে পারে? তাদের ঋণ মওকুফ করে ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো জুবিলী বর্ষ উদ্‌যাপন করার সুযোগ গ্রহণ করার উদ্যোগ নিতে পারে?।

উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে তথ্য-সংগ্রহ, পর্যালোচনা, অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং ভবিষ্যৎ নির্দেশনা গ্রহণ করার আহ্বান জানাই সমবায়ী সকল পরিবারের কাছে। সামাজিক ক্ষেত্রে যিশুর মঙ্গলবাণী প্রচার ও মঙ্গলবাণীর মূল্যবোধ দৃশ্যমান করে তোলা খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বিগতকালের সকল সফলতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি এবং ভবিষ্যত উন্নয়নের প্রত্যাশায় একসঙ্গে পথ চলি।

সপ্তম ভাগ: পবিত্র ত্রুশ সংঘে নিবেদিত জীবন

রচনা- ১: ঈশ্বরের আহ্বান

আমি যখন স্কুলে পড়াশুনা করছিলাম তখন আমরা ছয় জন বন্ধু ছিলাম। আমাদের সবাইকে প্যারিশের লোকেরা চিনতো; আর ফাদার-ব্রাদার-সিস্টাররা তো অবশ্যই চিনতেন। কেন যেন সবাই মনে করতো আমরা ফাদার হবো। কেন সেভাবে ভাবত, তা সঠিক করে বলা শক্ত। হয়তো আমাদের মধ্যে কয়েকজন প্রকাশ্যে বলে বেড়াতো আমরা ফাদার হবো; অথবা আমরা সবাই একসঙ্গে চলতাম বলে; হয়তো-বা আমাদের চাল-চলন, চলা-ফেরা ও আচার-আচরণের মধ্যে অন্যেরা একটা কিছু লক্ষ্য করেছেন; হয়তো-বা প্রার্থনা-গীর্জায় নিয়মিত যোগদান করতাম এবং প্যারিশে ও সমাজে বিভিন্ন সেবাকাজে জড়িত থাকতাম বলে; হয়তো ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারদের সাথে আমাদের যোগাযোগ, আনাগোনা ও দেখা-সাক্ষাৎ ঘন ঘন হতো এবং তাঁদের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল, ইত্যাদি। যাহোক লোকেরা যে-কারণেই হোক, ভাবতো যে আমরা সবাই ফাদার হবো।

পরবর্তীতে ম্যাট্রিক দেয়ার পর ছয় জনের মধ্যে যখন দু'জন মাত্র পবিত্র ত্রুশ সংঘে প্রবেশ করলাম তখন সবাই ভাবল আমাদের দু'জনার আহ্বান আছে অন্য চারজনার আহ্বান নেই। আমরা দুজনে একসঙ্গে নবিশিয়েট করলাম, কলেজে পড়লাম, মেজর সেমিনারীর পড়াও শেষ করলাম এবং দুজনেই ফাদার হলাম তবে একই বছরে হইনি, আমার সাথী আরও কয়েকমাস সময় নিল। তারও পরে আমি ছাড়া অন্যেরা সবাই যখন চলে গেল তখন সবাই মন্তব্য করল যে, অন্যদের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান ছিল কিন্তু হারিয়ে ফেলেছে; আবার কেউ কেউ বলেছে যে, ঈশ্বরের আহ্বান তাদের জন্য একেবারেই ছিল না।

আমাদের ছয় জন বন্ধুর বেলায় “ঈশ্বরের আহ্বান” বা “ঈশ্বরের ডাক” যে-অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা আসলে ঠিক নয়। স্বভাবত আমরা ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার হওয়ার ইচ্ছাকে “ঈশ্বরের আহ্বান” বলে গণ্য করি। আর তাই আমাদের ছ'জনার মধ্যে আমিই বুঝি একা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিলাম আর বাকি পাঁচজন ঈশ্বরের আহ্বান পায়নি, অথবা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তাহলে আমার পাঁচ বন্ধু যারা বিবাহিত জীবনে আছে, তারা কী ঈশ্বরের আহ্বানের বাইরে জীবনযাপন করছে? তাদের জন্য কি ঈশ্বরের আহ্বান ছিল না?

“ঈশ্বরের আহ্বান” প্রথমত হচ্ছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা। আমার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনাই হচ্ছে আমার জীবনের আহ্বান। সবার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা আছে। আর বিচিত্র তাঁর পরিকল্পনা এবং স্বতন্ত্র তা প্রত্যেকের জন্য। সবার দায়িত্ব হচ্ছে

ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনা আবিষ্কার করা এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে জীবনযাপন করা। এভাবে প্রত্যেকেই ঈশ্বরের আহ্বান শুনতে পারবে এবং আহ্বানে সাড়া দিতে পারবে।

এ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান আছে, ঈশ্বর সবাইকে ডাকছেন এবং সবাইকে সেই ডাকে সাড়া দিতে হবে। অতএব প্রত্যেক যুবক-যুবতীর জন্য ঈশ্বরের আহ্বান আছে -- কেউ বলতে পারবে না যে, তার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান নেই।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে মূলত দু'ধরনের জীবনাহ্বান আছে: বিবাহিত জীবন ও অবিবাহিত জীবনে আহ্বান। অবিবাহিত জীবনাহ্বানে কেউ কেউ উৎসর্গীকৃত জীবনে প্রবেশ ক'রে ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার হয়, কেউ কেউ যাজকীয় জীবন গ্রহণ করে এবং কেউ আবার বিশেষ উদ্দেশ্যে একক জীবন বেছে নেয়। বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় জীবনই একটি আহ্বান -- আর তা ঈশ্বরের আহ্বান। কোনোটি অন্যটির তুলনায় ছোট বা বড়ো নয়, ক্ষুদ্র বা মহৎ নয়। কিন্তু উভয় আহ্বানই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। উভয় আহ্বানের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন -- অর্থাৎ পবিত্র হওয়া, স্বর্গীয় পিতা যেমন পবিত্র।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানবিক ও খ্রিস্টীয় শিক্ষায় প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত খ্রিস্টবিশ্বাসী হওয়ার মৌলিক আহ্বান সম্বন্ধে জানবে এবং তদানুসারে গঠন নেবে। খ্রিস্টীয় জীবনে গঠন নেওয়ার দায়িত্ব প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীর রয়েছে। যুব-বয়সে, প্রত্যেক যুবক-যুবতী চিন্তা ও ধ্যান-প্রার্থনায় প্রশ্ন করবে কোন্ জীবন-আহ্বানে ঈশ্বর তাকে ডাকছেন, বিবাহিত বা অবিবাহিত জীবনে?

ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও তার আহ্বান আবিষ্কার করতে হলে প্রত্যেক যুবক-যুবতীকে নিজের দিকে তাকাতে হবে -- আমার জীবন-স্টাইল কীরূপ?, আমার মূল্যবোধ, জীবন সম্বন্ধে আমার পছন্দ ও অপছন্দ কী? আমার জীবনের আকর্ষণ-বিকর্ষণ কী এবং কোথায়?

এ প্রসঙ্গে একটি ভুল ধারণার বিষয়ে উল্লেখ করতে হয়। অনেকে মনে করে যারা “ভাল” ছেলে-মেয়ে তাদের জন্য অবিবাহিত বা ধর্মীয় জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান আছে। আবার যারা ধনী-জ্ঞানী পরিবার থেকে আসে, বা যারা মেধাবী ও দৈহিকভাবে সুন্দর তাদের জন্য ধর্মীয় জীবনে আহ্বান নেই। আবার এও বলতে শোনা যায় যে, যে যুবক-যুবতী “খারাপ” বা “দুষ্ক” তাদেরকে বিবাহিত জীবনে সংসার করতে হবে। তাদের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান নেই। এই সমস্ত ভ্রমাত্মক ধারণা ভীষণ মারাত্মক। মণ্ডলীর ইতিহাস তার জীবন্ত সাক্ষী। ভাল ছেলেমেয়ে উভয়েই বিবাহিত ও অবিবাহিত জীবনে আহূত হতে পারে। আহ্বান হচ্ছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা; ঈশ্বরের কাছ থেকেই জীবনাহ্বান আসে; তিনি আমাদের মনোনীত করেন আমরা তাঁকে মনোনীত করি না।

ঈশ্বর যাকে তাঁর পরিকল্পনায় স্থির করে রেখেছেন, তিনি তাঁকে আহ্বান করেন, যাকে তিনি আহ্বান করেন, তাকে তিনি অনুগ্রহ দান করেন এবং যাকে তিনি অনুগ্রহ দান করেন তাঁকে তিনি মহিমান্বিত করেন। এ মহিমা বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় জীবনেই প্রকাশিত।

ঈশ্বর কার জন্য কী পরিকল্পনা বা আহ্বান রেখেছেন তা স্পষ্ট করে জানবার ও আবিষ্কার করার জন্য এবং সে অনুসারে শিক্ষা ও গঠন পাওয়ার জন্য গুরুর পরামর্শ প্রয়োজন। যারা অবিবাহিত সন্ন্যাসজীবন বা যাজকীয় জীবনাঙ্গানে সাড়া দিতে চায় তাদের জন্য যেমন, যারা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতে চায় তাদের জন্যও তেমনি, আধ্যাত্মিক গুরুর প্রয়োজন রয়েছে। যে যুবক-যুবতী নিয়মিতভাবে উপযুক্ত গুরুর পরামর্শ গ্রহণ করে সে সহজে আবিষ্কার করতে পারে তার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান কী এবং যোগ্যভাবে সে তার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে -- হোক সে আহ্বান বিবাহিত বা অবিবাহিত জীবনে।

রচনা- ৩: প্রভু যিশুর শিষ্য আত্মরা

যিশুর শিষ্যেরা হচ্ছে যিশুর অনুসারী

আমরা যিশুর পথেই শুধু চলি না, কিন্তু যেভাবে তিনি পথ চলেন সেভাবে আমরাও পথ চলি। যিশুর শিষ্য হওয়ার মানে হল যিশুর প্রভুত্ব আমরা স্বীকার করি এবং আমরা চেষ্টা করি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যিশুর প্রভুত্ব বাস্তব করে তুলতে। শিষ্যেরা তো তাই করে এবং অন্যকোন পথ নেই।

আব্রাহাম নামে জনৈক এক ব্যক্তি বলেছেন: আমাদের মানবজীবনে এক ইঞ্চিই জায়াগা নেই যেখান থেকে যিশু, সার্বভৌম যিনি, চিৎকার করে বলে না যে, সেটা “আমার”!

আমাদের হৃদয়-মন, লক্ষ্য-প্রত্যাশা – এ সবগুলো ঐ এক ইঞ্চির মধ্যে রয়েছে। শিষ্য এমন জীবন যাপন করে না যেখানে জীবনের কিছু দিক যিশুর কাছে নিবেদিত আর অন্য দিকগুলো নয়। শিষ্য যিশুকে সবকিছুর প্রভুর বলে স্বীকার করে।

শিষ্যত্বে যিশুর আহ্বান

বাইবেলে শিষ্যত্বে যিশুর আহ্বানে কীভাবে সাড়া দেওয়া হয় তার স্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই:

“একদিন তিনি (যিশু) গালিলেয়া সাগরের ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন, শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয় জাল ফেলছেন; পেশায় তাঁরা ছিলেন জেলে। তিনি তাঁদের বললেন : ‘তোমরা আমার সঙ্গে চল ! আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে’। আর তাঁরা তো তখনই তাঁদের জাল ফেলে রেখে যিশুর সঙ্গে চললেন।” (মার্ক ১:১৬-১৮)

একই ধরনের শিষ্যত্বের আহ্বান আজও শোনা যাচ্ছে। এই আহ্বান যারা শুনে তাদের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। তাদের মধ্যে কেউ আছে তরুণ কেউ বয়স্ক, কেউ গরিব কেউ ধনী, কেউ পুরুষ কেউ নারী, কেই বিবাহিত কেউ অবিবাহিত। প্রত্যেক জাতি, গোত্র ও দেশের মানুষের কাছে একই আহ্বান পৌঁছে যায়। এই আহ্বানটি এমন যার মধ্যে যোগ্যতা ও স্বাভাবিক কোন বালাই নেই; আহ্বানটি সাধারণ ভাষায় উচ্চারিত কিন্তু তার অর্থ অনেক গভীর। আমাদের প্রত্যেকের কাছে যিশু আজও বলেন: “আমার সঙ্গে চল”।

তবে উদ্ধৃতির শেষের দিকে একটি কথা আছে যা খ্রিস্টের আহ্বানের অর্থ কী তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্যাখ্যাটি হল: “তাঁদের জাল ফেলে রেখে যিশুর সঙ্গে চললেন”। মার্ক কেন এই ব্যাখ্যাটি সংযোজন করলেন? হয়তো তিনি একটু বিবরণ দিতে

চেয়েছিলেন। মার্ক চেয়েছিলেন ঘটনার পূর্ণ চিত্রটা তুলে ধরতে: প্রথম শিষ্যেরা হয়তো কিছু ধরে রেখেছিল, আবার পরক্ষণেই ছেড়ে দিল, ফেলে দিল। জাল ছেড়ে দেওয়ার অর্থ একটি বস্তুকে ছেড়ে দেওয়া নয়; কেননা তাদের জন্য জাল ছিল তাদের জীবনের প্রকাশ। অতীত জীবনকে ছেড়ে দেওয়া।

শিষ্য হতে হলে, তোমাকে জাল রেখে দিতে হবে

যাদেরকে যিশু ডাকলেন তারা ছিল জেলে, তারা জেলে ছিল কারণ তাদের পিতাও ছিল জেলে। তৎকালীন সমাজে শিক্ষা এবং সুযোগের কোন উচ্চ মান বা বড়ো কিছু ছিলনা আজ যেমন দেখি আমাদের সমাজে। জাল তাদের পেশা জীবনের একটি হাতিয়ার মাত্র ছিল না। তাদের জন্য জাল ছিল পরিবারের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা; জাল ছিল সমাজ জীবনে তাদের পরিচিতির চিহ্ন। আমরা যখন সবকিছু একত্রে মিলিয়ে দেখি, তাদের জাল ফেলে রাখা সহজ ছিল না।

কিন্তু তাঁরা জাল ফেলে রাখল। প্রতীকীভাবে তাঁরা তাদের পুরনো জীবন ফেলে দিল। তারা তাদের অতীতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল – তাদের পুরাতন পেশা ছেড়ে দিল, তাদের আত্মবোধ, আত্মপরিচয় রেখে গেল – এবং যিশুর সাথে ভবিষ্যতের জীবন আপন করে নিল। শিষ্যেরা তো তাই করে।

যিশুর শিষ্য হওয়ার আহ্বানের অর্থ: তোমার নিজের ক্রুশ বহন কর

যিশুর শিক্ষা অনুসারে শিষ্যেরা শুধু জালই ফেলে দেয় না। কিছু ফেলে দেওয়ার জন্য যিশু তো আমাদের ডাকছেন না। যিশু ডাকছেন হাতে কিছু তুলে নেওয়ার জন্য। জাল ফেলে দেওয়ার পর হাত যখন শূন্য তখন যিশু আহ্বান করছেন তোমার নিজের ক্রুশ তুলে নাও।

মার্ক লিখিত একই মঙ্গলসমাচারে আবারও উল্লেখ করা হয়েছে:

“যিশু তখন তাঁর শিষ্যদের এবং অন্য সকলকে কাছে ডেকে বললেন: ‘কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।’ (মার্ক ৮:৩৪)

তোমরা নিজের ক্রুশ তুলে নিতে পারবে না যদি তোমরা হাতে জাল ধরে রাখ। তুমি যিশুকে অনুসরণ করতে পারবে না যদি তুমি এখনও অতীতকে ধরে রাখ, নিজের আত্মপরিচয় ও আত্মরক্ষার অবলম্বন ধরে রাখ। তুমি যদি নিজেকে ধরে রাখ তা হল তুমি যিশুকে আপন বলে গ্রহণ করতে পারবে না।

শিষ্য যাকে অনুসরণ করে তাঁর যোগ্যতা ও মূল্য সে অনুভব করে এবং তার হাতের “জাল”-এর সঙ্গে প্রভু যিশুকে তুলনা করে। শিষ্যেরা তখন বুঝতে পারে যে, তাদের

আরও মহৎ পরিচয় আছে এবং মাছ ধরার চেয়ে আরও মূল্যবান লক্ষ্য আছে। সেই কারণেই তারা ফেলে দেয় এবং যিশুকে অনুসরণ করে। আহ্বান “মানুষ-ধরা” জেলে হওয়ার জন্য।

বাইবেলে শিষ্যত্বের আহ্বান

শিষ্য হিসেবে আমাদের জাল ফেলে রেখে এবং আমাদের নিজের ত্রুশ কাঁধে বহন করার জন্য আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জন্য বাইবেলের দিকে তাকাতে পারি। বাইবেলের নবসন্ধিতে অসংখ্যবার শিষ্য হওয়ার আহ্বান লক্ষ্য করি। এখানে বাইবেল থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি যেখানে আমরা যিশুর শিষ্যত্বে একদিকে তাঁর আহ্বান দেখতে পাই আবার যিশুর মতো হওয়ার প্রজ্ঞার সন্ধান পাই:

যিশু এবার তাঁর প্রতি বিশ্বাসী এই সব ইহুদীকে লক্ষ্য করে বললেন: “তোমরা যদি আমার বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাক, তাহলেই তো তোমরা আমার যথার্থ শিষ্য; তাহলেই তো সত্যকে তোমরা জানতে পারবে আর সত্য তখন তোমাদের স্বাধীন করে তুলবে।” (যোহন ৮:৩১-৩২)

তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের ওপর নেমে এলে তোমরা কিন্তু শক্তি লাভ করবে। তখন জেরুসালেমে, সমগ্র যুদেয়ায় ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে। (শিষ্যচরিত ২:৩)

শোন, আমি এখন তোমাদের একটি নতুন আদেশ দিচ্ছি : তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে ! আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমাদেরকেও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসতে হবে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ভালবাসা থাকে, তাতেই তো সকলে বুঝতে পারবে, তোমরা আমার শিষ্য! (যোহন ১৩:৩৪-৩৫)

আমরা যে ভালবাসি, তার কারণ, পরমেশ্বর নিজেই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন। কেউ যদি বলে সে পরমেশ্বরকে ভালবাসে, আর তবুও সে যদি নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, তবে সে মিথ্যাবাদী; কারণ যাকে যে দেখতে পায়, তার সেই ভাইকে যে যখন ভালবাসে না, তখন যে-পরমেশ্বরকে সে দেখতে পায় না, তাঁকে সে তো ভালবাসতেই পারে না। (১ম যোহন ৪:১৯-২০)

কীভাবে আমরা যিশুর শিষ্য হতে পারি?

যারা যিশুর অনুগামী তাদের সবার কাছে যিশুর শিষ্যত্বের আহ্বান আসে। ঈশ্বরের সাথে যাত্রায় যেখানেই তোমরা থাক না কেন, শিষ্যত্বে বেড়ে ওঠার সাধনায় আছ। বাস্তবে খ্রিস্টবিশ্বাসে যিশুর শিষ্য হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে নিম্নরূপ:

- ঈশ্বরের পথে চলতে তুমি একজনকে পরিচালক হিসেবে গ্রহণ কর।

- আধ্যাত্মিক কতকগুলো অভ্যাস অর্জন কর: প্রতিদিন বাইবেলের একটি অংশ পাঠ কর, গানে ঈশ্বরের প্রশংসা কর, প্রার্থনার জীবন গড়ে তোল, রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে যোগদান কর, নিয়মিত পাপস্বীকার কর।
- যিশুর মতো জীবন পরিচালনায় তুমি নিষ্ঠাবান হও।
- খ্রিস্টীয় সমাজের সাথে সম্পৃক্ত থাক কেননা তারাও তো ঈশ্বরের সন্ধান করে।
- তোমার বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা অন্যের সাথে সহভাগিতা কর, কেননা তুমি যখন শিষ্যত্বে বেড়ে ওঠবে, তখন অন্যকে তুমি শিষ্য করবে।

যিশু শিষ্য হয়ে তাঁকে অনুসরণ করা একই সময়ে: বাহির হওয়া এবং প্রবেশ করা; শেষ করা এবং শুরু করা; ছেড়ে দেওয়া এবং তুলে নেওয়া। আমাদের সবার জন্য তাই হোক।

রচনা- ৩: পবিত্র ত্রুশ সংঘ : প্রেরণার বাণী

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পবিত্র ত্রুশ সংঘের ব্রাদারগণ এবং ফাদারগণ এ বছর একটি জুবিলী পালন করছে। জুবিলী পালন করার স্মারকফলক হিসেবে আছে পঁচিশ বছর আগের একটি ঘটনা। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে অবস্থানরত পবিত্র ত্রুশ সংঘের যাজক-সমাজ নিয়ে “পবিত্র যিশু-হৃদয়” শিরোনামে এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পবিত্র ত্রুশ সংঘের ব্রাদার-সমাজ নিয়ে “সাধু যোসেফ” শিরোনামে পবিত্র ত্রুশ সংঘের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুটো “ভাইস-প্রভিন্স” প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত ঘটনাটি রমনা কাথিড্রাল গির্জায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা উদযাপিত হয়। আবার ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে একই পূর্বারোপিত শিরোনামে দুটি পূর্ণ “প্রভিন্স” বা “সংঘ-প্রদেশ” প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংঘ-প্রদেশ প্রতিষ্ঠার স্মরণার্থে এবছর বাংলাদেশের পবিত্র ত্রুশ সংঘে দুটো রজত জয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের পবিত্র ত্রুশ সংঘের যাজক-সমাজ, অর্থাৎ “পবিত্র যিশু-হৃদয় সংঘ-প্রদেশ” প্রতিষ্ঠার স্মরণে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। উক্ত স্মরণিকার জন্য, প্রেক্ষাপট হিসেবে পবিত্র ত্রুশ সংঘের সংবিধানের মূল প্রেরণার কথা উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ, আমাকে করা হয়েছে।

পবিত্র ত্রুশ সংঘের সংবিধানে সন্ন্যাসব্রতীদের জীবন-প্রণালী ও মিশনকর্ম উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র ত্রুশ সংঘের ব্রাদার-সমাজ এবং যাজক-সমাজ উভয়ের জন্যই রয়েছে একই সংবিধান। অতএব সেন্ট যোসেফ প্রভিন্স এবং যিশু-হৃদয় প্রভিন্স-এর জুবিলী উৎসবে সংবিধান থেকে কয়েকটি মূল কথা এখানে তুলে ধরছি। অবশ্যই সন্ন্যাসব্রতী পবিত্র ত্রুশ সংঘের যাজক ও ব্রাদারগণ সংবিধানের সবকিছুর সাথে শুধু ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্তই নন বরং তাদের আপন জীবনে সংবিধানকে অনেকটাই মূর্ত ও দৃশ্যমান করে রেখেছে যা স্মরণিকার বিভিন্ন লেখায় প্রকাশিত হয়েছে।

তবে যারা পবিত্র ত্রুশ সংঘের সন্ন্যাসব্রতীদের সাথে ততো ঘনিষ্ঠ নন তাদের উদ্দেশ্যেই এই লেখা। এই লেখায় আমি সংবিধানের কাঠামো অনুসরণ করে, প্রয়োজনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি নিয়ে এবং অন্যান্য বিষয় সংক্ষিপ্ত করে প্রবন্ধটি রচনা করছি। সংবিধানে উল্লেখিত বিষয়গুলো যেমন: পবিত্র ত্রুশ সংঘের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, ঈশ্বরের আহ্বান, প্রেরণকাজ, প্রার্থনা, ভ্রাতৃত্ব, আত্মত্যাগ ও অঙ্গীকার, গঠন ও রূপান্তর, কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্ব, এবং পরিশেষে ত্রুশই আমাদের প্রত্যাশা, প্রভৃতি আমার নিজস্ব কথা দিয়ে ব্যক্ত করছি।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা: সংঘের গোড়াপত্তন ও ক্রমবিকাশ (পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধান পৃষ্ঠা ৬-১০)

“ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে, ফ্রান্স দেশের চরম দুর্যোগের সময় ল্য-মঁ ধর্মপ্রদেশের বাসিন্দা ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো নামক জনৈক পুরোহিত পবিত্র ক্রুশ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন”। প্রায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে একই ধর্মপ্রদেশের “রুইয়ে-সুর-লোয়া” নামক একটি ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ছিলেন ফাদার জ্যাক ফাঁপোয়া দুজারিয়ে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ‘সাধু যোসেফ ভ্রাতৃ-সমাজ’ নামে, একটি সমাজ-দল স্থাপন করেন। ফাদার দুজারিয়ার বার্ষিক্য ও অসুস্থতার কারণে ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল ফাদার মরোর হাতে ব্রাদারদের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ফাদার মরো ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে, প্যারিশে নির্জনধ্যান পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সহায়তার জন্য পাঁচ জন পুরোহিতের একটি সমাজ-দলে সংগঠিত করেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ এই দুটো ‘সমাজ-দল’ ফাদার মরো একটি “মৌলিক চুক্তি”র মাধ্যমে একত্রিত করে “পবিত্র ক্রুশ” নামে একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল পালকীয় ও শিক্ষাক্ষেত্রে সেবাকাজ করা। আবার ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার মরো কয়েকজন নারীদের একটি সমাজ-দলে সংগঠিত করলেন এবং তাদের জন্য তিনি প্রণয়ন করলেন অনুশাসন-নীতিমালা। এভাবে ফাদার মরো, স্বায়ত্ত্বশাসিত তিনটি শাখা একত্র করে একটি ধর্মসংঘ স্থাপন করলেন যার নামকরণ হল “পবিত্র ক্রুশ সংঘ” কেননা তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ল্য-মঁ-এর শহরতলীতে অবস্থিত একটি ধর্মপল্লীতে যার নাম ছিল “পবিত্র ক্রুশ” (“স্যান্ড ক্রোয়া”)। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ১৫ আগস্ট ফাদার বাসিল মরো পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রকাশ্যভাবে সর্বপ্রথম সন্ধ্যাসব্রত গ্রহণ করেন।

“পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টারগণ যথাক্রমে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সালভাতোরিস্ট, যোসেফাইট এবং মেরীয়ানাইট নামে পরিচিতি লাভ করেন। সংঘের প্রতিষ্ঠাতা চেয়েছিলেন যেন তাঁরা ‘পবিত্র পরিবার’-এর দৃশ্যমান অনুকরণে জীবনযাত্রায় ও কাজে একত্রে সংযুক্ত থাকেন। তাঁদের এই একতাকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন ‘এমন এক শক্তি যার দ্বারা গোটা জগতটাই আন্দোলিত, নিয়ন্ত্রিত ও পবিত্রীকৃত হয়ে উঠবে।”

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে পবিত্র ক্রুশ সংঘটি ফ্রান্স দেশের ভেতরে, ইউরোপের অন্যত্র, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকায় মিশনারি কাজের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তৎকালীন ভারতের পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে মিশন-দায়িত্ব গ্রহণ করার শর্তে, পবিত্র ক্রুশ সংঘটি মণ্ডলীর বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার আওতায় আন্তর্জাতিক সন্ধ্যাসংঘ হিসেবে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে, পবিত্র ক্রুশ সংঘের দুটো পুরুষ সংঘ-শাখা নিয়ে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধান অনুমোদন লাভ করে।

“পবিত্র ক্রুশ সংঘের অনুমোদন লাভের অব্যবহিত পরেই ফাদার মরো কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী পুরোহিতের ধ্বংসাত্মক মনোভাবের শিকার হয়ে পড়েন; তারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়ে তাঁর তিরস্কার ও সংশোধনী সরলমনে গ্রহণ করতে পারেননি। কিছুকাল নিষ্ফল ও নিরুৎসাহজনক প্রচেষ্টা চালানোর পর ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মহাসংঘ্যাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন।” মেরিয়ানাইট সিস্টারদের তত্ত্বাবধানে থেকে ফাদার মরো ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

রোমের সিদ্ধান্তক্রমে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে মহিলা সন্ন্যাসব্রতী শাখাটি পুরুষ সংঘ থেকে পৃথক করা হয় এবং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে “হলি ক্রস মেরিয়ানাইট সন্ন্যাসসংঘ” হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে “সিস্টারস অব দ্য হলি ক্রস” নামে এবং কানাডাতে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে “সিস্টার অব হলি ক্রস” নামে দুটো পৃথক সংঘ হিসেবে অনুমোদন লাভ করে।

পরবর্তীতে পবিত্র ক্রুশ সংঘটিকে নানা সংকটের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘকাল একটি ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে পার করতে হয়। বেশ কয়েকটি মিশন বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গ ও পবিত্র ক্রুশ সংঘের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় (১৮৭৬-১৮৮৮)। ফাদার মরোর মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে তাঁকে সাধুশ্রেণিভুক্ত করার জন্য সংঘ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। “পুরোহিত ও ব্রাদারদের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাবে সংঘের জীবনযাত্রা ও কাজে ব্যাঘাত ঘটছে দেখে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সংঘমহাসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, তখন থেকে শাখা-সংঘদ্বয় শুধুমাত্র নিজ নিজ স্বাভাবিক বজায় রাখবে তা নয় বরং প্রাদেশিক ও স্থানীয় পর্যায়েও ব্রাদার এবং পুরোহিতদের প্রশাসন-ব্যবস্থা যৌথ না হয়ে বরং পৃথক থাকবে।”

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নির্দেশ অনুসারে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধানের সরঞ্জামের কাজ প্রায় দুই দশক ধরে চলতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত মহা সাধারণ সভায় সংস্কারকৃত বর্তমান সংবিধান রোম দ্বারা অনুমোদন লাভ করে। সংস্কারিত নতুন সংবিধান, প্রতিষ্ঠাতা ফাদার মরোর আদি আদর্শে প্রত্যাবর্তন করায় নতুন প্রেরণা সঞ্চার করে। “আগের ন্যায় পুনরায় সকল খ্রিস্টভক্ত-সন্ন্যাসব্রতীগণ যোসেফাইট সম্প্রদায়ের (সমাজ-সংঘের) সদস্য হয়েছেন এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয় পর্যায়ে আন্তঃসম্প্রদায় (আন্তঃসমাজ-সংঘের) প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্ভাব্যতাও স্বীকৃতি পেয়েছে। পবিত্র ক্রুশ সংঘ শুধুমাত্র সেবাকাজে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদল হিসেবেই নিজেদের পরিচয় ব্যাখ্যা দেবে না, উপরন্তু প্রতিষ্ঠাতার মূল নির্দেশিত লক্ষ্য তাদের আহ্বান অনুসারে যাজক-সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্ত-সন্ন্যাসব্রতীরা যেন ভ্রাতা হয়ে ওঠে, পরস্পরের সাথে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করে এবং পরস্পরের সঙ্গে ও পবিত্র ক্রুশ সংঘের ভগ্নীদের সংগে এক হয়ে নতুন সেবাকাজে একসঙ্গে আত্মনিয়োগ করে।” (অনুবাদ সংশোধন করা হল)।

“যুগের প্রয়োজনে নতুন নতুন সেবাকাজে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পবিত্র ত্রুশ সংঘ একই সন্ধ্যাসজীবনের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে যাজক ও ভক্ত-সন্ধ্যাসব্রতীরা মিলে সেবাকাজের বিশিষ্ট ধারা অক্ষুন্ন রাখবে বলে আশা করা যায় – এ যেন পুরাতন বৃক্ষেই নতুন পল্লবের আবির্ভাব। ফাদার মরো যেমন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন পরিকল্পনাটি “বাহ্যতঃ অবিচক্ষণ” হলেও, তা স্বয়ং ঈশ্বরেরই কাজ।”

॥ ১ ॥ ঈশ্বরের আহ্বান: “এসো, আমার অনুসরণ কর” (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ১-৮)

যিশু আমাদেরকে আহ্বান করেছেন : “এসো, আমাকে অনুসরণ কর”। আমরা তাঁর এই ডাকে সাড়া দিয়েছি দীক্ষান্নান ও হস্তার্পণ সংস্কারের মাধ্যমে যখন আমরা খ্রিস্টান হয়েছি।

আবার বিশেষ একটি সময়ে তিনি আমাদের ডাকলেন আরও একটি পদক্ষেপ নিতে: সেই ডাকটি হচ্ছে পূর্ণভাবে নিজেকে দান ক’রে সকল মানুষের সেবায় ব্রতী হ’য়ে যিশুর জীবনের সহভাগী হতে। পবিত্র আত্মার কাছ থেকেই এই ডাক আমরা অন্তরে পেয়েছি।

প্রশ্ন এসেছে কোন পথে চলব আমরা। তখনই আমরা দেখেছি: আমাদের পূর্বে যারা সন্ধ্যাসব্রতী হয়ে পথ চলেছিলেন তাদেরকে, যারা তাদের পায়ের চিহ্ন রেখে গেছেন তাদেরকে, আবার আমাদের সাম্প্রতিক কালে অনেকেই পথ চলছেন তাদেরকেও। তারা ইশারা দিয়ে আমাদেরকে ডেকেছেন যেন তাদের জীবনযাত্রা ও সেবাকর্মের অংশীদার হয়ে আমরা উক্ত পরিবারের সদস্য হই।

আমাদের জন্য এই পরিবারটি হল পবিত্র ত্রুশ সংঘ – যা প্রতিষ্ঠা করেছেন ফাদার আস্তনী বাসিল মরো। তিনি এখন ধন্য শ্রেণিভুক্ত। সংঘের সদস্যদের মধ্যে আছি আমরা ব্রাদার ও ফাদারদেরকে নিয়ে দুটো সমাজ, তবে উভয়ে এক ও অবিচ্ছেদ্য। প্রতিষ্ঠাতা এক, ঐতিহ্য এক, নিয়মাবলী এক, প্রশাসন এক, জীবনপথ ও এবং মিশনকর্ম এক ও অভিন্ন।

প্রভু যিশুকে অনুসরণ করার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমাদের রয়েছে ত্যাগের অভাব ও অনীহা, আছে ইতস্তত। তবে আমরা আশাবাদী যে প্রথম শিষ্যদের মতো যিশু আমাদেরকে নিয়ে পথ চলবেন, আমাদেরকে দৃঢ় করবেন বিশ্বাসে।

॥ ২ ॥ প্রেরণকাজ: সংঘের মিশনকর্ম (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৯-২০)

পিতা ঈশ্বর, তাঁর পুত্রকে যেমন পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত করে এই জগতে প্রেরণ করেছেন, আমরাও সেরূপ প্রেরিত হয়েছি ঈশ্বরের রাজ্য ত্বরান্বিত করতে।

“যাজক ও ব্রাদার হিসেবে আমরা একসাথে জীবনযাপন ও কাজ করি। আমাদের পরস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও কর্মে সহভাগিতা ঐশ্বরাজ্যের প্রত্যাশাপূর্ণ নিদর্শন হতে হবে;

আর তখনই আমরা সেই নিদর্শন হয়ে উঠব যখন লোকে আমাদের পারস্পরিক প্রেমের জীবন দেখতে পাবে।”

খ্রিস্টের শিষ্য হিসেবে আমরা জনগণের পাশে থকি, তাদের ন্যায় সংগ্রাম করি এবং সংঘের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টকে সেবা করি, আবার তাদের মতো ভালবাসায় নবীকৃত হয়ে, এই প্রত্যাশায় কাজ করছি যাতে একদিন ন্যায় ও প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সংঘের কর্তৃপক্ষ দ্বারা আমরা বিশ্বাসের শিক্ষাদাতা রূপে ঐশ্বরাজ্যের উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে মিলন সমাজ গঠন করতে প্রেরিত হই।

খ্রিস্টের ন্যায় আমরা দীনদরিদ্রদের নিকট সুখবর প্রচার করতে প্রেরিত হয়েছি। আমাদের কাজে দীন দরিদ্রদের অধিকার দিয়ে যিশুর মতো সকলের মনপরিবর্তন ও মুক্তির জন্য আহ্বান জানাই। দরিদ্রদের ও নির্যাতিতদের জন্য কাজ করা মোটেই সহজ নয়। যিশুর শিষ্যদের বুঝবার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং সাহস থাকতে হবে। আমাদের সকল কাজের লক্ষ্য হবে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তি মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখা ও তাদের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

পবিত্র ত্রুশ সংঘের অনেকেই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত আবার অনেকে ধর্মপল্লীতে শিক্ষাদানের আহ্বান পেয়ে থাকেন। তবে যেখানেই আমরা শিক্ষা দিই না-কেন সেখানে আমরা তাদের দানসমূহ আবিষ্কার করতে এবং তার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করি; তাদের জীবনের গভীরতম আশা-বাসনা আবিষ্কার করতে সাহায্য করি। যাদেরকে শিক্ষা দিই তাদের কাছ থেকে আমরা আরও বেশী শিক্ষা গ্রহণ করি।

প্রেরণকাজে আমরা একাধিক জাতি বা কৃষ্টির সংস্পর্শে আসি, তাদের ভালবাসার সুযোগ পাই। আমরা যতটুকু দিই তার চাইতে বেশী আমরা পাই, আমরা সমৃদ্ধ হই। পবিত্র ত্রুশ সংঘের মধ্যে সবাই প্রৈরিতিক কাজে সক্রিয় ভাবে সম্পৃক্ত। যে অবস্থায়, যেখানে, যে কাজে থাকি না কেন, আমরা সবাই প্রৈরিতিক কর্মী এবং একই ভ্রাতৃসমাজরূপে আমরা সবাই মিলে প্রভুর প্রেরণকাজে সাড়া দিই।

আমরা আমাদের সেবাকাজগুলো মৌলিক মিশন সম্পাদন করছে কি-না তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করি; আমাদের সেবাকাজ মণ্ডলী ও জগতের প্রয়োজনে কতটুকু ফলপ্রসূ হতে পারছে তা যাচাই করে দেখি। আমাদের কাজ প্রভুরই কাজ। অতএব বিনম্র চিন্তে আমাদের সকল কাজ প্রভুর সামনে নিয়ে আসি প্রার্থনায় সেখানেই আমাদের সেবাকাজ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা হয়ে উপস্থিত হয়।

॥ ৩ ॥ প্রার্থনা: সংঘের আধ্যাত্মিকতা ও অনুশীলন (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ২১-৩২)

পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনের প্রাণবায়ু। “সেই একই আত্মা যিনি প্রভুকে অনুসরণ এবং তাঁর প্রেরণাকাজ করার প্রেরণা ও শক্তি যোগান তিনিই আবার আমাদের অন্তরে প্রার্থনা করার ইচ্ছা ও ভাষা জাগিয়ে তোলেন।” ঈশ্বরের বাণী পাঠ ও ধ্যানে আমরা আমাদের চিন্তাধারা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে মিলিয়ে দিয়ে তার দেয়া মিশন সম্পন্ন করতে সাধনা করি।

আমরা প্রার্থনা করি মণ্ডলীর সাথে, সংঘের ভ্রাতাদের সাথে এবং একাকী নির্জনে। ঈশ্বরের সন্তান হয়ে তাঁকে পিতা বলে আমরা “প্রভুর প্রার্থনা”র সকল আবেদন নিবেদন করি।

আমাদের কর্মজীবন ও প্রার্থনা জীবনের মধ্যে সকল টানাপোড়েনের মধ্যে, পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তির মধ্যে প্রার্থনাই পাবে অগ্রাধিকার, কেননা প্রার্থনাই হবে জীবন-নৌকার হাল। প্রার্থনাই জাগাবে সকল কর্মে প্রেরণা। আমরা কর্মে ধ্যানী, ধ্যানময় কর্মী হতে সাধনা করি। আমরা খ্রিস্টান সমাজের সাথে প্রার্থনা করি, খ্রিস্টযুগে অংশগ্রহণ করি সংঘের ভাইদের সাথে আশ্রমে ও সংঘে আমরা একসঙ্গে, নির্ধারিত সময়ে ও নির্ধারিত প্রার্থনা অনুশীলন করি। আরাধনা, নির্জন ধ্যান, মৌন প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক পাঠ আমরা অনুশীলন করি। সংঘের নির্ধারিত পার্বণগুলো একসঙ্গে পালন করি। ভাইদের বিভিন্ন বার্ষিকীতে তাদেরকে স্মরণ করি প্রার্থনায়, তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করি।

“প্রার্থনা তো শুধু আমরাই করি না, স্বয়ং প্রভুর আত্মাই আমাদের প্রার্থনা করেন।”

॥ ৪ ॥ ভ্রাতৃত্ব: সংঘের সংঘবদ্ধ জীবন (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৩৩-৪২)

আমরা ভ্রাতৃসমাজের মিলন বন্ধনে বাস করি। আমরা একা নই, সেবাকাজও একা করি না। আমাদের কাজ ব্যক্তিগত পেশাগত চাকরী নয়; সংঘজীবন মিশনকাজে আমাদের সাহস ও শক্তি দেয়, আমাদের ভার লাঘব করে। সংঘে আমাদের ভাইদের ভালবাসায় আশ্রম-গৃহে বাস করি; পারস্পরিক সাহচর্যে ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে দরিদ্রতা, কৌমার্য এবং বাধ্যতার ব্রত অনুশীলন করি। প্রেরণাকাজের প্রয়োজনে ও স্বাস্থ্যগত কারণে এর ব্যতিক্রম হতে পারে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে।

রোগ-শোকে, জীবনের অবসরে ও বার্ষিক্যে আমাদের ভাইদের ভালবাসা ও যত্নে, তাদের প্রার্থনায় বলশালী হয়ে জীবনযাপন করি এবং মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমার ভাইয়েরা আমাদের পাশে আছেন।

আমাদের আশ্রম-গৃহে বা স্থানীয় সমাজে একজন সুপেরিয়রের পরিচালনায় আমরা আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় করি, জীবন ও সেবাকাজ পর্যালোচনা করি,

প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশে হাউজের কল্যাণ অনুসন্ধান করি; প্রার্থনা, চিন্তাবিনোদন, অধ্যয়ন ও নির্জন ধ্যানসভা করার সুযোগ গ্রহণ করি এবং এভাবে আমাদের সংঘজীবন অনুশীলন করি সংঘের তৃণমূল পর্যায়ে।

আমাদের জীবনযাত্রা হবে ঐশ্বরাজ্যের কারণে অনাড়ম্বর – সবাই তা দেখতে চায়। একদিকে সংঘের আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি আবার অপরের প্রতিও আমরা উদার ও অতিথিপরায়ণ হই। সংঘের ভাইদের সাথে আমাদের ভালবাসাই হবে অন্যদের প্রতি উদারতার মাপকাঠি। সংঘজীবনে হতে পারে দোষ-দূর্বলতার জন্য অন্যের কষ্টের কারণ হই; মনোমানিল্য, মতবিরোধ, মতানৈক্য আসতে পারে, তবে নশ্ব হয়ে দোষ স্বীকার করে, ভ্রাতৃত্বপ্রেমের তাগিদে সংশোধন করে এবং পুনর্মিলন করে আমাদের সংঘজীবনের সাধনা করি। আমাদের দেখে অন্যেরা যেন বলতে পারে: “দেখ তারা পরস্পরকে কত ভালবাসে”।

॥ ৫ ॥ আত্মোৎসর্গ ও অঙ্গীকার: সংঘের সন্ন্যাসব্রতী জীবন (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৪৩-৫৫)

আমাদের কৌমার্য, দরিদ্রতা এবং বাধ্যতা হচ্ছে ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতি আমাদের আত্মদান, যিশুকে অনুসরণ করার জন্য জীবন উৎসর্গ, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস, আস্থা ও অন্তরঙ্গতার প্রকাশ। তাছাড়া যিশুর মিশনকর্মের জন্য আমরা ব্রতগুলি গ্রহণ করি। কৌমার্যব্রতের দ্বারা ঐশ্যপ্রেমের নিদর্শন, দরিদ্রতাব্রত দ্বারা দরিদ্র মানুষের সাথে একাত্মতা এবং বাধ্যতাব্রতের দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসন্ধান করি। তিনটি ব্রতের মাধ্যমে আমরা জনগণের কাছে সাক্ষ্যদান করি যেমন জনগণও তাদের পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে সাক্ষ্য বহন করে।

আমাদের ব্রতগুলো জগতের কাছে প্রাবক্তিক নিদর্শন স্বরূপ হয়ে ওঠে। “আমরা কিন্তু আমাদের সন্ন্যাসজীবন এমন ভাবে যাপন করতে চাই যেখানে ভোগ-লালসা, ধন-সম্পত্তি এবং ক্ষমতা প্রভৃতি জাগতিক মোহ বা আকর্ষণের স্থান নেই”। প্রবক্তাদের মতো অনুরূপ সাক্ষ্যদান করতে পারি, তাই হোক আমাদের প্রার্থনা।

কৌমার্যব্রত দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সাথে মিলন লাভের সাধনা করি এবং ভাইদের সাথে আমাদের ভালবাসা, বিশ্বস্ততা ও সাহচর্য গভীর করি। দরিদ্রতার ব্রতের মাধ্যমে আমরা কোন সম্পত্তি নিজের বলে দাবি করার ইচ্ছা ত্যাগ করি এবং সংঘের সম্পদ সংঘের সর্বসাধারণের সম্পদ বলে গণ্য করি। বাধ্যতাব্রতের মাধ্যমে সংঘের কর্তৃপক্ষ এবং মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা পালন করার এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার অঙ্গীকার করি। বাধ্যতাব্রত দ্বারা আমরা সংঘ-ভ্রাতাদের ইচ্ছা আবিষ্কার করি এবং “উপাসনা, পালকীয় সেবাকাজ, এবং ঐশ্বরাজ্যের জন্য কাজকর্মে আমরা বিশপগণের পালকীয় নির্দেশের অধীন” হয়ে থাকি।

আমরা আমাদের উৎসর্গীকৃত জীবন যাপন করি বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কৃষ্টিতে উপযোগী ও অর্থবহ করে। “সংঘের প্রতীক যে ত্রুশ ও নোঙর, তাই হচ্ছে পবিত্র ত্রুশ সংঘের সদস্যদের পরিচয়-চিহ্ন”।

॥ ৬ ॥ গঠন ও রূপান্তর: সংঘের শিক্ষা ও জীবন-গঠন (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৫৬-৭৯)

প্রভু যিশু তাঁর শিষ্যদের মনোনিয়ন করেছেন এবং তাদেরকে গঠন দান করেছেন। গঠন দিতে গিয়ে তিনি ঐশ্বরাজ্যের রহস্যময় সত্য ব্যাখ্যা করতেন, শিষ্যদের অভিজ্ঞতা ও মন্তব্য শুনতেন যাতে তারা ঐশ্বরাজ্য প্রচার করতে পারে। পরবর্তীতে তিনি তাঁর আত্মাকে দান করেন যিনি যথাসময়ে তাঁর শিষ্যদের সবকিছু স্মরণ করিয়ে দেবেন ও শিখিয়ে দেবেন। সেই একই গঠন যেন আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে পাই তার ব্যবস্থা সংঘ গ্রহণ করে। ব্রতের মধ্য দিয়ে যা আমরা উচ্চারণ করি তা আমরা অভ্যাস, চরিত্র, মনোভাব, কামনা-বাসনায় আজীবন সাধনা করি।

আমাদের গঠনের যাত্রা শুরু হয় দীক্ষাস্থানের মুহূর্ত থেকে এবং তার সমাপ্তি ঘটবে একমাত্র পুনরুত্থানে। “আমরা নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠবো তখনই, যখন আমরা বলতে পারব, আমি যে বেঁচে আছি এ-তো আমি নই, স্বয়ং খ্রিস্টই আমার মধ্যে বেঁচে আছেন”।

পবিত্র ত্রুশ সংঘের সদস্য হিসেবে আমাদের কাছে অনেক দাবি আসে। কিন্তু এই দাবিগুলো আমাদের কাছে নিরানন্দ হয়ে আসে না। আমরা প্রফুল্লচিত্তে সেই দাবি পূরণ করি। আহ্বানে আমাদের আনন্দ আমরা অপরের সাথে সহভাগিতা করি।

প্রার্থী হিসেবে যারা সংঘে প্রবেশ করতে চায় আমাদের কাছে তাদের প্রাপ্য: পরিপক্বতা, বিশ্বাস, উদারতা, জ্ঞান এবং ভ্রাতৃসংঘে বাস করার জন্য সহায়তা। নবিসরা, “ধ্যান ও প্রার্থনায়, পরস্পরিক সেবা, প্রৈরিতিক সেবাকাজে এবং পবিত্র ত্রুশ সংঘের ইতিহাস ও আধ্যাত্মিকতা, বিশেষত্ব ও প্রেরণকর্মে সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে নিজেদের গঠন করতে পারে”। “নব্যশ্রম হল কৌমার্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতায় তাদের শিক্ষানবিসির কাল”। সংঘের গঠন ও রূপান্তরের কাল প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে আজীবন তা চলমান থাকে। পালকীয় দায়িত্ব পালনে এবং প্রৈরিতিক কাজের জন্য চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় গঠন চলমান থাকে। জীবনভর গঠনের জন্য অতি প্রয়োজন মন-পরীক্ষা, পুনর্মিলন সংস্কার, আধ্যাত্মিক পরামর্শ, অন্যান্য আধ্যাত্মিক অনুশীলন, সহভাইদের প্রেরণাদায়ক চ্যালেঞ্জ এবং সংবেদনশীল উৎসাহ। “গঠন-প্রশিক্ষণ ও রূপান্তর স্বয়ং প্রভুরই দান।” এই দান লাভ করতে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করি।

॥ ৭ ॥ কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্ব: কর্তৃপক্ষের সেবা এবং সদস্যদের দায়িত্বশীলতা (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৮০-১১১)

“আমাদের জীবনযাত্রা যাতে মঙ্গলসমাচার অনুযায়ী হয় এবং আমাদের সেবাকাজ যাতে খ্রিস্টের প্রেরণকাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, সেজন্য আমাদের প্রত্যেককে দায়িত্বশীল হতে হবে”। অন্যের কল্যাণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা বাধ্যতা ব্রতেরই দাবি।

কর্তৃপক্ষের পরিচালনা সংঘের একটি সেবাকাজ। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে সংঘকে সেবা করার দায়িত্ব। কর্তৃপক্ষ যে-পর্যায়ের তা হোক-না-কোন, তিনি কিন্তু একজন পালক এবং তাঁর দায়িত্বটাও পালকীয় দায়িত্ব। কর্তৃপক্ষ সংঘের আত্মিক দান এবং ব্যক্তির আত্মিক শক্তির ওপর তিনি সভাপতিত্ব করেন। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন করার জন্য আছে মন্ত্রণা-পরিষদ। তারা একটি সংঘবদ্ধ দল হিসেবে কাজ করেন সংঘের মঙ্গলের জন্য। কিছু কিছু দায়িত্ব আছে প্রধান কর্তৃপক্ষ একা করেন, আবার কিছু কিছু দায়িত্ব আছে যার জন্য প্রধান কর্তৃপক্ষকে মন্ত্রণা-পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন ভাবে মন্ত্রণা-পরিষদ নির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারে, তবে যখন তারা পরিষদের সদস্য হয় তখন তারা সবাই এক, তাদের লক্ষ্য সংঘের সাধারণ কল্যাণ।

সংবিধান ও অনুশাসনের নীতি অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্ব পালন করে। তবে বিভিন্ন পর্যায়ের চ্যাপ্টার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রূপে অনুশাসন মোতাবেক কাজ করে। ভোটাধিকার সংবিধান ও অনুশাসনের বা চ্যাপ্টারের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

“সরলচিন্তে এবং বাধ্যতার মনোভাব নিয়ে সংঘের সকল সদস্য এসব সংবিধান পালন করে প্রভুর প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা এবং পবিত্র ত্রুশ পরিবারে তাদের ভ্রাতৃত্ব যথার্থ ও মূর্ত করে তুলবেন”।

॥ ৮ ॥ ত্রুশই আমাদের প্রত্যাশা: সংঘের মূলমন্ত্র (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ১১২-১২৩)

আমাদের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য বাসিল মেরী মরোর চোখের সামনে ছিল ত্রুশমূর্তি এবং মূলমন্ত্র হিসেবে সংঘকে দিয়েছেন: “স্পেস ইউনিকা” – “ত্রুশই আমাদের একমাত্র আশা”।

যিশুর শিক্ষা অনুসারে আমাদের প্রত্যেককে আপন ত্রুশ কাঁধে তুলে নিয়ে যিশুকে অনুসরণ করতে হবে। যিশু যেমন মানুষের পাপের ফল ও জীবনের দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন। আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে মানুষের দুঃখকষ্টের সাথেও একাত্ম হই। ন্যায্যতার জন্য কাজ করতে গিয়ে, দুঃখভোগীদের সাথে একাত্ম হতে গেলে, তাদের পক্ষ নিতে গেলে আমাদের জীবনে আসবে দুঃখকষ্ট। এমনকি

ভ্রাতৃসংঘে জীবনযাপন করতে গেলেও আমাদের জীবনে দুঃখকষ্ট আসে তা আমাদের গ্রহণ করতে হয়।

তবে আমাদের জীবনে ত্রুশ থাকলেও আমরা আশা হারাই না; প্রত্যাশা নিয়ে পথ চলি। আমাদের প্রত্যাশা মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা জাগায়। জীবনের ব্যর্থতা ভালবাসায় রূপান্তরিত হতে পারে, অপমান আশীর্বাদ হয়ে আসতে পারে, রাগ-ক্রোধ নশ্রুতায় উপশমিত হতে পারে, কঠিন সময় শুভ সময় হয়ে আগমন করতে পারে; ত্রুশ আসতে পারে দান রূপে এবং ত্রুশে মৃত্যু নিয়ে আসতে পারে পুনরুত্থান – এই প্রত্যাশায় আমরা প্রত্যাশী।

ত্রুশতলায় মা মারীয়া, তিনি শোকাক্ত জননী, আবার তিনি আমাদের প্রতিপালিকা। ভক্তি-আপ্নত অন্তঃকরণ নিয়ে আমরা তার সন্তানেরা যখন তাঁর কাছ যাই তিনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ত্রুশ ও তার নৈমিত্তিক প্রত্যাশার কথা বুঝিয়ে দেন। “একবার যে-প্রতিজ্ঞা আমরা করেছি তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের মৃত্যু ও পুনরুত্থান সমভাবে সুনিশ্চিত”।

আমাদের আগে যারা এই পথ ধরে চলে গেছেন তাঁরা অক্ষয় ছাপ রেখে গেছেন। “তাঁরা ধীরে ধীরে পথ চলেননি, চলেছেন দ্রুত পদক্ষেপে। কেননা তাঁদের মনে ছিল প্রত্যাশা”। যিশু তাদের যেমন ডেকেছিলেন, আমাদেরকে তিনি ডাকেন: “এসো, আমাকে অনুসরণ কর”।

রচনা- ৪: ঐশ্বরিকল্পনায় ফাদার মরোর আস্থা

আজকে যে বিষয় নিয়ে ধ্যান ও আলোচনা করেছি, “ঐশ্বরিকল্পনায় ফাদার মরোর আস্থা” সেই একই মূলভাব নিয়ে খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠান করতে সমবেত হয়েছি।

মূলভাব নিয়ে যেন ধন্য ফাদার মরোর দিবস উদ্‌যাপন করতে পারি তার জন্য ঈশ্বরের বাণী আমাদের কাছে আসছে দুটো শাস্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে:

প্রথম শাস্ত্রপাঠে সাধু পল বলছেন: “ঈশ্বর যে আহ্বান তোমাদের জানিয়েছেন, তারই উপযুক্ত হোক তোমাদের আচরণ”: পবিত্র ত্রুশ সংঘ আমাদের আহ্বানটাই হচ্ছে আমাদের সংঘের কার্যক্রম।

(১) ঐশ্বরিকল্পনা: ডিভাইন প্রভিডেন্স

ফাদার মরোর শিক্ষা অনুসারে আমাদের কার্যক্রমের মূলকথা, সংঘের ভিত্তিমূল হচ্ছে: “ঐশ্বরিকল্পনা”। “ঐশ্বরিকল্পনা” সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। তাত্ত্বিক আলোচনায় না যেয়ে খুবই সাধারণভাবে বললে তিনটি ভাব আসে:

- আমাদের (ব্যক্তি ও সংঘের) জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা আছে: তার স্বপ্ন আছে। তাঁর ইচ্ছা।
- ঐশ্বরিকল্পনার দিকে ঈশ্বর পরিচালন করেন, পরিকল্পনা তিনি পরিপালন করেন।
- ঐশ্বরিকল্পনা প্রতি নিয়ত চলমান = যুগে যুগে চলমান; সময়োপযোগী হয়ে উঠি
- ঈশ্বর পরিকল্পনা তিনি পরিপোষণ করেন; ঐশ্বালবাসা, যত্ন, তত্ত্বাবধান, ঐশ-অনুগ্রহ ও শক্তি, আত্মিক দান – প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পরিপুষ্টি সাধন করেন।

নিজের জীবনে ও সংঘের জন্য প্রয়োগ করলে অন্যভাবে বললে আরও স্পষ্ট হতে পারে:

- ঈশ্বরের পরিকল্পনা: আমার পরিকল্পনা / ইচ্ছা / প্রকল্প নয়;
- ঈশ্বরের কাজ: ফাদার মরো সর্বদা বলেছেন; আমার কাজ নয়, বরং ঈশ্বরের কাজ; তিনি পরিচালনা করেন।
- ঈশ্বরের অনুগ্রহ: যত্ন, ভালবাসা, তত্ত্বাবধান করেন। “তার হাতের অযোগ্য হাতিয়ার, তিনি ব্যবহার করেন মহৎ কিছু করার জন্য।

(২) ঐশ-পরিকল্পনার প্রতি সাড়া দান:

- ঈশ্বরের ইচ্ছা অবধারণ করা: আত্মায় আবধারণ; ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা জানা
- ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আত্ম-সমর্পণ, আস্থা রাখা, বিশ্বাস করার, ভরসা করা, নির্ভর করা
- ঈশ্বরের কাজ দেখে আমরা বিস্মিত হই, অবাক হই, আনন্দিত হই, প্রশংসা করি

(৩) ঐশ-পরিকল্পনার আধ্যাত্মিকতা

- ঐশ-পরিকল্পনা, ঈশ্বরের ইচ্ছার সর্বদা প্রকাশমান, চলমান।
- আত্মার শক্তিতে অবধারণ করা – ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ভাবে; একত্রে অবধারণ করা; পবিত্র আত্মা আমাদের কাছ থেকে কী চান। সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হওয়া – আত্মায় সংলাপ, আত্মায় প্রার্থনা।
- আমাদের অযোগ্যতা, বিফলতা, আমাদের মধ্যে অনৈক্য, কর্মে ও সেবাকাজে, তথাকথিত আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অর্জন ও সাফল্য ও অহংকার – ঐশপরিকল্পনার অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যায়।
- আমাদের জীবনে ঐশপরিকল্পনার ব্যর্থতা, আমাদের আত্মত্যাগ আমাদের জীবনে দ্রুশ – যা আমাদের একমাত্র আশা।

(৪) পুণ্যবর্ষ: আশার তীর্থযাত্রী; পবিত্র দ্রুশ সংঘের ক্যারিজমের সাধনা।

- যা নিয়ে যায় ঐশপরিকল্পনার পূর্ণতার দিকে
- ঐশপরিকল্পনার দিকে তীর্থযাত্রা
- কষ্টভোগী তীর্থ যাত্রা।

ৱচনা- ৬: যিশু হৃদয় সংঘ প্রদেশ প্রতিষ্ঠার প্রাক্-কথন

বাংলাদেশে পবিত্র ত্রুশ সংঘের যিশু-হৃদয় সংঘ-প্রদেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে। এই ঘটনা কেন্দ্র করে এ বছরে পালিত হচ্ছে বাংলাদেশে যাজক সংঘ-প্রদেশ প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী অথবা পঁচিশ বছর পূর্তির আনন্দ উৎসব। যখনই আমরা কোন ঘটনার বর্ষপূর্তি পালন করি, তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমরা অতীতের দিকে তাকাই। অতীত অনেক সময় খুবই দূরবর্তী হতে পারে আবার অতীত হতে পারে মাত্র কয়েক বছরের পূর্বকাল। উভয় অতীতের দিকে তাকিয়ে বর্তমান ঘটনাটির প্রেক্ষাপট ও যথার্থতা আমরা উপলব্ধি করতে চাই।

পবিত্র ত্রুশ সংঘের গোড়াপত্তন

পবিত্র ত্রুশ সংঘ প্রতিষ্ঠার মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ইতিহাস রয়েছে। অষ্টদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ফরাসী বিপ্লব ও যুদ্ধ, তৎকালীন সমাজে রেখে গেছে এমন সব বিধ্বংসী বাস্তবতা যা জাগতিক ও ধর্মীয়, সামাজিক ও কৃষ্টিগত, মানসিক ও আত্মিক জীবনজুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই অবস্থায় সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে নতুন করে নির্মাণ করার জন্য মণ্ডলীর মধ্যে অনেকের উদ্ভাবন ঘটেছে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে মানুষকে উদ্ধৃত করে একত্রিত করেছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ফরাসী দেশের ল্য-মঁ শহরের শ্রদ্ধেয় ফাদার জ্যাক ফ্রাঁসোয়া দুজারিয়ে। তিনি ল্য-মঁ ধর্মপ্রদেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য কয়েকজনকে একটি দলে সংগঠিত করেন প্রায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। ফাদার দুজারিয়ে “রুইয়ে-সুর-লোয়া” প্যারিশের পালপুরোহিত থাকায় ব্রাদারদেরকে “রুইয়ের ব্রাদার” বা “সাধু যোসেফের ব্রাদার” বলে অভিহিত ছিলেন।

আবার ইতোমধ্যে পৃথকভাবে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস নাগাদ, ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো একটি ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারিতে শিক্ষকতার সময় আরও পাঁচ জন ফাদারদের একটি দল গঠন করেন। ফাদার দুজারিয়ের অসুস্থতার কারণে সাধু যোসেফ ব্রাদারদের পরিচালনা দিতে অপারগ হওয়ায়, ধর্মপালের অনুরোধে, ফাদার মরো ব্রাদারদের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফাদার মরো এই দুটো দলকে একটি “মৌলিক চুক্তি”র মাধ্যমে (১লা মার্চ ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ) যাজক ও ব্রাদারদের একত্রিত করলেন। যেহেতু “পবিত্র ত্রুশ” (স্যান্ত ক্রোয়া) ধর্মপদ্ধতিতে অবস্থান করে শিক্ষা ও পালকীয় কাজে নিয়োজিত থাকায় তাদেরকে বলা হয় “পবিত্র ত্রুশ সংঘ” (কংগ্রেগাসিয়ো দ্য স্যান্ত ক্রোয়া)।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার মরো কয়েকজন নারীদের সংগঠিত করে তাদের জীবন-প্রণালীর জন্য নিয়মাবলী রচনা করলেন; তাদের নাম দিলেন মারিয়ানাইট সিস্টার। অল্প সময়ের মধ্যে ব্রাদারদেরকে যোসেফাইট, যাজকদেরকে সালভাটরিস্ট এবং সিস্টারদেরকে মারিয়ানাইট নামে আখ্যায়িত করে নাজারেথীয় পুণ্য পরিবারের আদর্শে পবিত্র ক্রুশ সংঘটি স্থাপন করলেন এবং পুণ্য পরিবারের নিকট সংঘটি নিবেদন করলেন।

পূর্ববঙ্গে পবিত্র ক্রুশ সংঘ ও সাংগঠনিক কাঠামো

অখণ্ড ভারতে মণ্ডলীর মিশন-দায়িত্ব পালন করার জন্য ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে রোমের বিশ্বাস-বিস্তার সংস্থা বা “প্রোপাগান্ডা ফিদে” কর্তৃক অবিভক্ত বঙ্গের জন্য “ভিকারিয়েট অ্যাপোস্টলিক অব বেঙ্গল” নামে একটি মিশন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মিশনকর্মের সুবিধার্থে “ভিকারিয়েট অ্যাপোস্টলিক অব বেঙ্গল” ভাগ করে মণ্ডলীর দুটো প্রশাসনিক এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হয় যার নাম হল: “ভিকারিয়েট অব ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল” এবং “ভিকারিয়েট অব ইস্টার্ন বেঙ্গল”।

উপরোক্ত মিশন ব্যবস্থার সূত্র ধরে, পবিত্র ক্রুশ সংঘটির অনুমোদন লাভের শর্তে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ সংঘ পূর্ববঙ্গে আগমন করে। তিন বছরের মধ্যে পবিত্র ক্রুশ সংঘটি মণ্ডলীর বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার আওতায় আন্তর্জাতিক সন্ন্যাসসংঘ হিসেবে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীকৃতি লাভ করে।

পোপের দপ্তর “প্রোপাগান্ডা ফিদে” ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ঢাকা ডাইয়েসিসকে ভাগ করে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ডাইয়েসিস নামে নতুন একটি ডাইয়েসিস প্রতিষ্ঠা করে। তখন ঢাকা ডাইয়েসিসের দায়িত্ব “ঢাকা ভিকারিয়েট”-এর আওতায় হলি ক্রস ফাদার-ব্রাদার মিশনারিদের হাতে ন্যস্ত করা হয় – যারা পবিত্র ক্রুশ সংঘের আমেরিকান প্রভিন্সগুলোর অধীনে ছিল। অন্যদিকে চট্টগ্রাম ডাইয়েসিসের দায়িত্ব “চট্টগ্রাম ভিকারিয়েট”-এর আওতায় হলি ক্রস ফাদার-ব্রাদার মিশনারিদের হাতে অর্পণ করা হয় এবং পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফ্রেস-কানাডার প্রভিন্সগুলোর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকে।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র সংঘের জেনারেল চ্যাপটার অনুষ্ঠিত হয় এবং চ্যাপটারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হলি ক্রস ফাদার ও ব্রাদারদের জন্য পৃথক পৃথক প্রভিন্স গঠন করা হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ববঙ্গে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ সংঘে চারটি “ডিস্ট্রিক্ট” গঠিত হয়: আমেরিকান ফাদার ও ব্রাদারদের জন্য ঢাকা ডাইয়েসিসে পৃথক দুটি “ডিস্ট্রিক্ট” বা সংঘ-জেলা এবং ফ্রেস-কানাডিয়ান ফাদার ও ব্রাদারদের জন্য চট্টগ্রাম ডাইয়েসিসে পৃথক দুটি “ডিস্ট্রিক্ট” বা সংঘ-জেলা গঠন করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববঙ্গ বলি, বা পূর্বপাকিস্তান বলি, বা বাংলাদেশ বলি, এই বঙ্গভূমিতে পবিত্র ক্রুশ

সংঘের প্রকৃতি, মিশন, প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্ধারিত হয়েছে মিশনারি-প্রেরিত দেশের হলি ক্রস সংঘের ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো অনুসারে। আর এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক – বিকল্প আর কিছু হতে পারত না। হলি ক্রস সংঘের বিদেশী প্রভিন্সগুলো, পূর্ববঙ্গে কত মিশনারিদের পাঠিয়েছে, কত ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে এই দেশে তারা বাণীপ্রচার করেছে, খ্রিস্টমণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং তাদেরকে গড়ে তুলেছে, জনগণের উন্নয়ন সাধন করেছে এবং স্থানীয় মণ্ডলী গঠন করা এবং পবিত্র ক্রুশ সংঘকে স্থানীয় সন্ন্যাসব্রতী সংঘরূপে রূপান্তরিত করার সর্বপ্রচেষ্টা তারা চালিয়েছেন। অতীত ও বর্তমানের সবকিছুর জন্য তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা কোনদিনই যথেষ্ট হবে না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই (১৯৭১ খ্রি.), হলি ক্রস সংঘের দেশী-বিদেশী সকল সদস্যের মধ্যে একটি চিন্তা কাজ করেছে, আর তা হল: বাংলাদেশে স্থানীয় মণ্ডলী এবং স্থানীয় পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস-সংঘ গড়ে তোলা। এই প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে, তা আরও পরিপক্ব, সাবলীল, সক্রিয়, উদ্যমী ও আধ্যাত্মিকতায় বলিষ্ঠতা লাভ করেছে। তবে হলি ক্রসের ভবিষ্যৎ ভাবনা সংঘটি তার মৌলিক আদর্শ ও ভাবমূর্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, দূরদর্শী রূপরেখা সামনে রেখে, ঐক্যের সহযাত্রী পথ চলবে এবং বাংলাদেশের পবিত্র ক্রুশ সংঘ স্থানীয় মণ্ডলীতে, দেশের জনগণের মধ্যে এবং বিশ্বজনীন হলি ক্রস সংঘে তার স্বকীয়, প্রাবৃত্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

সুতরাং পূর্ববঙ্গে পবিত্র ক্রুশ সংঘের একক ভিকারিয়েট (১৮৫৩ খ্রি.) ... দ্বিবিধ ভিকারিয়েট (১৯২৭ খ্রি.) ... চতুর্বিধ ডিস্ট্রিক্ট (১৯৪৭ খ্রি.) ... আবার দ্বিবিধ ডিস্ট্রিক্ট (১৯৮৪/১৯৮৫ খ্রি.) ... দ্বিবিধ ভাইস-প্রভিন্স (১৯৮৮ খ্রি.) ... দ্বিবিধ প্রভিন্স (১৯৯৮ খ্রি.) ... পৃথক দুটো প্রভিন্স-জয়ন্তী (২০২৩ খ্রি.) -- এই বিচিত্র যাত্রার “মহামিলন”, “মিশন” ও “অংশগ্রহণ”-এর সম্মিলিত পথ কোথায়? একসঙ্গে পথচলার ভবিষ্যৎ রূপরেখা কী? রজত-জয়ন্তী উৎসবে আগামী সুবর্ণ জয়ন্তী হাতছানি দিয়ে ডাকছে – আমাদের সাধনায় প্রত্যাক্ষী প্রতীক্ষায় থাকি চলমান (২০২৪ খ্রি. ...)।

বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রশাসনিক কাঠামো একত্রীকরণ (১৯৮৪ খ্রি.)

পবিত্র যিশু-হৃদয় সংঘ-প্রদেশ হওয়ার পেছনে ছিল দীর্ঘ একটি প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে হয়েছে আমাদের পথচলা। প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটেছিল চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্টের ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত চ্যাপ্টার থেকে। এই সময়ে কানাডিয়ান ফাদারদের প্রভিন্সিয়াল ছিলেন ফাদার রবার্ট শকেৎ এবং চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট সুপিরিয়র ছিলেন ফাদার যোসেফ প্যাটনোড। চ্যাপ্টারে সুপারিশ করা হয়েছিল: “হলি ক্রস ফাদারদের সমন্বয়ে একটি ডিস্ট্রিক্ট গঠন করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।” “বাংলাদেশী হলি ক্রস ফাদারগণ যেন নিয়মিত মিটিং করে একসঙ্গে চিন্তাভাবনা করেন কীভাবে দুটো ডিস্ট্রিক্ট-কে একটি ডিস্ট্রিক্টে রূপান্তরিত করা যায়”। চ্যাপ্টারে আরও বলা হয়:

“হলি ক্রস যেন বাংলাদেশে আরও দেশীয় হয়ে উঠতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।” (ডিস্ট্রিক্ট চ্যাপটার - ২৭-২৯ নভেম্বর, ১৯৭১ খ্রি.) একই সুপারিশ ২৬-২৯ নভেম্বর, ১৯৭৫ খ্রি. অনুষ্ঠিত ডিস্ট্রিক্ট চ্যাপটার পুনরুল্লেখ করা হয়)।

এ প্রসঙ্গে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে দুটো ডিস্ট্রিক্টের জনবলের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি:

ঢাকা: বিদেশী ফাদার - ২৬ জন; দেশী ফাদার - ৪ জন; বিশপ - ২ জন;
সাহায্যকারী ব্রাদার - ২ জন; সেমিনারিয়ান: ২ জন

চট্টগ্রাম: বিদেশী ফাদার - ১৫ জন; দেশী ফাদার - ৩ জন; বিশপ - ২ জন;
সেমিনারিয়ান - ২ জন

দীর্ঘ একটি সময় নিয়ে এই বিষয়টি অনেক আলোচনা হয় প্রথমত চট্টগ্রামের ফাদারদের মধ্যে, পরবর্তীতে ঢাকার ফাদারদের মধ্যে এবং সংশ্লিষ্ট প্রভিসের প্রভিসিয়ালদের মধ্যে। সব মহলের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে লিখিত আকারে মতামত ব্যক্ত করা হয়। প্রশ্নের উত্তর, উত্তরের বিপক্ষে প্রতি-উত্তর দিয়ে সংলাপ চলতে থাকে। কোন সময় সংলাপ বন্ধ হয়ে যায়নি।

বাংলাদেশে একটি ডিস্ট্রিক্ট: পক্ষে-বিপক্ষে মতামত

বাংলাদেশে হলি ক্রস ফাদারদেরকে নিয়ে একটি ডিস্ট্রিক্ট করার পক্ষে বিপক্ষে চট্টগ্রাম ও ঢাকার ফাদারগণ, হয় লিখিত আকারে অথবা নিয়মিত আলোচনা-সভায় তাদের মতামত প্রকাশ করেন। যে-মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

একটি ডিস্ট্রিক্ট-এর পক্ষে মতামত :

একটি ডিস্ট্রিক্ট হলে:

- বাংলাদেশের হলি ক্রস ফাদারদের জন্য ঐকমত্য হয়ে একটি রূপরেখা তৈরী করা সম্ভব হবে। (চট্টগ্রাম)
- হলি ক্রস ফাদার হিসেবে সমবেতভাবে জীবন ও মিশন শেয়ার করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। (চট্টগ্রাম)
- বাংলাদেশে সম্ভাব্য একটি হলি ক্রস প্রভিস করার পথ প্রস্তুত হবে। (চট্টগ্রাম)
- বর্তমানে পবিত্র ক্রুশ সংঘে যে যৌথ গঠন-প্রশিক্ষণ আছে তার আরও উন্নতি হবে। (চট্টগ্রাম)
- পবিত্র ক্রুশের জন্য বাংলাদেশে একটি সংঘ থাকলে আহ্বান ও গঠনের জন্য সঠিক মনোভাব সৃষ্টি করার সুযোগ হবে। (চট্টগ্রাম)
- বাংলাদেশী হলি ক্রস সদস্যদের একসঙ্গে আসার সুযোগ হবে যাতে তারা স্থানীয় সন্মুখ-সংঘ করতে এবং স্থানীয় মণ্ডলী গঠন করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ এবং তার মূল্যায়ন করতে পারে। (চট্টগ্রাম)

- হলি ক্রস সংঘের ক্যারিজমকে ঘিরে একসঙ্গে একত্রিত করার সুযোগ হবে এবং তা সংঘের এবং মণ্ডলীর কল্যাণে আরও ফলপ্রসূ ভাবে ব্যবহৃত হবে। (চট্টগ্রাম)
- নবিসিয়েট ও স্কলাস্টিকেট পর্যায়ে পবিত্র ক্রুশ সংঘে একই গঠন লাভ করে, ফাদার হবার পর একসঙ্গে জীবনযাপন ও মিশনকর্ম করার সুযোগ আর থাকবে না, এটা দেশীয়দের জন্য কাম্য নয়। (চট্টগ্রাম)
- বাংলাদেশে অল্পসংখ্যক হলি ক্রস ফাদারদের জন্য দুটো প্রশাসনিক ব্যবস্থা অপচয়ের শিকার হয়ে থাকবে। (চট্টগ্রাম)
- উপসংহার: একটি ডিস্ট্রিক্ট-এর পক্ষে উপরোক্ত যুক্তিগুলো চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্টের ফাদারগণ ৩০শে অক্টোবরে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সমাবেশে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আরও প্রস্তাব করা হয় যে, বাংলাদেশে হলি ক্রস ফাদারদের জন্য “ডিস্ট্রিক্ট অব বাংলাদেশ” নামে নতুন একটি ডিস্ট্রিক্ট করা হয়। উপরন্তু উক্ত সমাবেশে প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য ১১টি নীতিমালা প্রস্তাব করা হয়।

একটি ডিস্ট্রিক্ট-এর বিপক্ষে মতামত

- একটি ডিস্ট্রিক্ট হলে হয়তো একটি প্রভিঙ্গ বা জেনারেলের অধীনে থাকতে হবে। একটি প্রভিঙ্গের অধীনে থাকা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করবে। (ঢাকা)
- বর্তমান দুটো ডিস্ট্রিক্টে অবস্থানরত বিদেশী ফাদারগণের মধ্যে আছে বিভিন্নতা: ভাষা, কৃষ্টি ও মনোভাবের বিভিন্নতা। অনেক আমেরিকান ভাবে যে কানাডিয়ানদের স্থায়িত্ব নেই; আবার কানাডিয়ানরা মনে করে আমেরিকানরা অনেকটা রক্ষণশীল। (ঢাকা)
- নিয়মিত মিটিং ও সমাবেশের জন্য দূরত্ব একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। (ঢাকা)
- সংখ্যাগরিষ্ঠদের আধিপত্য হতে পারে বলে অনেকের মনে আশঙ্কা। (ঢাকা)
- দুটো ডাইয়েসিসের বিশপদের পলিশি ভিন্ন; এর কারণে ফাদারদের মধ্যে সমঝোতার অভাব হলে সংঘজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (ঢাকা)
- উপসংহার হিসেবে বলা হয়: দেশীদের সংখ্যা যখন বেশী হবে তখন হয়তো একত্রীকরণ সম্ভব হবে। একটি ডিস্ট্রিক্ট দেশীদের জন্য ভাল হবে, কিন্তু বিদেশীদের জন্য নয়। দুটো ডিস্ট্রিক্ট এক হওয়ার আগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে: একসঙ্গে নির্জন ধ্যানসভা করা, ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক সমাবেশ, পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ ও পরিদর্শন, ইত্যাদি। ডিস্ট্রিক্ট সুপিরিয়রগণ যেন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পারে এবং দুটো ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে

সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। (Circular Letter No. 2, Fr. Timm, August 1, 1982 – presenting answers to the queries; Circular Letter 4, Nov. 1982 of Fr. Timm – circulating the paper of Chittagong District Fathers to Dhaka District Members seeking feedback)

ঐক্যের আলোচনায় উত্থাপিত প্রশাসনিক বিষয়

উল্লেখিত বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয় উত্থাপিত হয়েছে যার সমাধান বের করা প্রয়োজন, যেমন:

- ১) দুটো ডিস্ট্রিক্ট “একত্রীকরণ” (Unification) না বলে, কোন দর-কষাকষি বা শর্তারোপ না করে, দুটো ডিস্ট্রিক্ট সমঝোতার মাধ্যমে “এক” (Merger) হয়ে যাওয়া বললে ভাল হবে।
- ২) চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট চ্যাপ্টারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আদর্শ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন শর্ত আরোপ না করে, চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট নিজেকে বিলুপ্ত ঘোষণা করবে এবং “ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট”-এর বদলে প্রস্তাবিত নতুন সৃষ্ট “বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট”-এর সদস্য হয়ে প্রশাসনিক ভাবে ইন্ডিয়ানা প্রভিন্সের অধীনস্থ থাকবে।
- ৩) চট্টগ্রামের বিশপের সাথে চুক্তি, ফাদারদের প্রভিন্স-সদস্য বিষয়, চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্টের সম্পদ, প্রাপ্তি ও প্রদেয় হিসাব এবং নতুন ডিস্ট্রিক্টের নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর, প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধান করা হয়।
- ৪) ইন্ডিয়ানা প্রভিন্সের প্রভিন্সিয়াল, ফাদার রিচার্ড ওয়ার্নার এবং কানাডা প্রভিন্সের প্রভিন্সিয়াল ফাদার মার্সেল তাইফেরের মধ্যে আলোচনান্তে প্রশাসনিক বিষয়ে সকল সমঝোতা চূড়ান্ত করা হয়।
- ৫) হলি ট্রাস সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল, ফাদার টমাস বারোস, সবকিছুর সঙ্গে অনবরত জড়িত ছিলেন, উৎসাহ দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে অনুমোদন করেছেন। (Letter of Fr. Thomas Barrose December 1983)

দুটো ডিস্ট্রিক্টকে এক করার সকল চিন্তাভাবনা ও প্রচেষ্টায় ঢাকার ফাদারদের সুপিরিয়র ফাদার রিচার্ড ডব্লিউ টীম এবং চট্টগ্রাম ফাদারদের সুপিরিয়র ফাদার প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সমস্ত আলোচনায়, ব্যবস্থাপনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরাসরি জড়িত ছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন যাতে কেউ যেন অনুভব না করেন যে, সিদ্ধান্তটি কারো ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য এবং সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছিল সুপিরিয়রদের সকল প্রচেষ্টা।

মার্চ ১৫, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের হলি ক্রস ফাদারগণের পক্ষে ডিস্ট্রিক্ট সুপিরিয়রসহ কাউন্সিলরগণ আনুষ্ঠানিকভাবে তিন পৃষ্ঠার একটি বিবৃতি স্বাক্ষর করেন যার শিরোনাম হল: Statement of Acceptance of Unification of Chittagong and Dhaka District Priests.

১৩ই মে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, “চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট” এবং “ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট”-এর হলি ক্রস ফাদারগণ “বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট” আওতায় এক হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে উক্ত তারিখ থেকে এই সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত কার্যকর বলে গণ্য হয়। আমার জানামতে এই উপলক্ষটা আনুষ্ঠানিক মাইলফলক হিসেবে তেমন কোনো ভাবে উদ্‌যাপিত হয়নি।

“পবিত্র যিশু-হৃদয় ভাইস-প্রভিস” ও “পবিত্র যিশু-হৃদয় প্রভিস”

“বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট”-এর আওতায় হলি ক্রস ফাদারদের দুটো ডিস্ট্রিক্ট এক হয়ে যাওয়া ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৩ বছরের চিন্তাভাবনা, শ্রম-মেধা ও সিদ্ধান্ত ও কাজের ফসল ছিল বাংলাদেশে ফাদারদের জন্য একটি ডিস্ট্রিক্ট গঠন করা। হলি ক্রস ফাদারদের নিয়ে একটি ডিস্ট্রিক্ট হওয়া ছিল নানা দিকে দিয়ে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত ও কাজ। এই সিদ্ধান্তের পরে ভাইস-প্রভিস এবং পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ প্রভিস হওয়াটা তুলনামূলক ভাবে সহজ ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, প্রায় একই সময়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ব্রাদারগণও দুটো ডিস্ট্রিক্ট মিলে একটি ডিস্ট্রিক্ট গঠন করেন।

“বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট” হওয়ার চার বছরের মধ্যে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর ভাইস-প্রভিস হিসেবে হলি ক্রস ফাদারগণ স্বীকৃতি লাভ করে। এই উপলক্ষে দুই দিনের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় নটর ডেম কলেজ, আর্চবিশপ হাউজ এবং মুহাম্মদপুর ব্রাদার বাড়ি। এই প্রোগ্রামটি যৌথভাবে ব্রাদারদের সাথে অনুষ্ঠিত হয় এবং সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সুপিরিয়র ফাদার টমাস জিম্মারম্যান এবং সুপিরিয়র ব্রাদার জন রোজারিও। সুপিরিয়র জেনারেল ফাদার ক্রোড গ্রু, সিএসসি আনুষ্ঠানিক ভাবে ইন্ডিয়ানা প্রভিসের অন্তর্গত বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্টকে “পবিত্র যিশু-হৃদয় ভাইস-প্রভিস” হিসেবে এবং মিড-ওয়েস্ট প্রভিসের অন্তর্গত বাংলাদেশ ব্রাদার ডিস্ট্রিক্টকে “সাধু যোসেফ ভাইস-প্রভিস” হিসেবে ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট প্রভিসিয়ালগণ, সুপিরিয়রগণ, আর্চবিশপ এবং বিশপগণ, ভারত থেকে আগত হলি ক্রস প্রতিনিধি এবং দেশের অধিকাংশ হলি ক্রস ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ণাঙ্গ প্রভিস হওয়ার জন্য উর্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা কয়েকটি শর্ত আরোপ করে দেওয়া হয়। শর্তগুলি ছিল: (১) উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য থাকা; (২) আস্থানের সম্ভাবনা নিশ্চিত করা; (৩) গঠনদানে সামর্থ্য থাকতে হবে; (৪) নেতৃত্বদানে সামর্থ্যবান সদস্য থাকতে হবে; (৫) সংঘের জীবন ও মিশনের জন্য আর্থিক সামর্থ্য অর্জন করতে হবে।

পরবর্তী অনুষ্ঠিত ভাইস-প্রভিন্সের চ্যাপ্টার অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই চ্যাপ্টারে ফাদার বেঞ্জামিন কস্তাকে ভাইস প্রভিন্সিয়াল হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

দীর্ঘ দশটি বছর পথচলার পর ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে পবিত্র ক্রুশ সংঘের জেনারেল চ্যাপ্টার বাংলাদেশের হলি ক্রস ফাদারদের ভাইস-প্রভিন্সকে “পবিত্র যিশু-হৃদয় প্রভিন্স” হিসেবে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দান করে। “পবিত্র যিশু-হৃদয় প্রভিন্স” অথবা “পবিত্র যিশু-হৃদয় সংঘ-প্রদেশ”-এর প্রথম প্রভিন্সিয়াল হিসেবে ফাদার স্টিফেন গমেজকে নির্বাচিত করা হয়। ঐ সময়ে সংঘের পরিসংখ্যান ছিল: চারজন বিশপ, ৩৬ জন পুরোহিত (১২ জন বিদেশী এবং ২৪ জন দেশী); সাময়িক ও আজীবন সন্ন্যাসব্রতী ছিল ১৭ জন এবং ৩ জন নবিস।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে যিশু হৃদয় সংঘ-প্রদেশ প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বছরের পূর্তিতে আমরা এ বছর রজত জয়ন্তী পালন করছি। এই জয়ন্তী উৎসবে আমার বিশেষভাবে স্মরণ হয় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে উপরে বর্ণিত বাসনা বা লক্ষ্যগুলি। আরও স্মরণ হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে দেয়া শর্তগুলি যা পূরণে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে সংঘ-প্রদেশ হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। ঐ বাসনা ও শর্তগুলি কত দূরদর্শি হয়ে আমাদের যাত্রাপথ পরিচালিত করেছে বিগত পঁচিশটি বছর ধরে – তা ভেবে আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি এবং পরস্পরকে ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে একজন পবিত্র ক্রুশ সংঘের মিশনারি একটি মন্তব্য করেছিলেন। সেই কথাটি আমার এই লেখার জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে চোখে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন: “পবিত্র ক্রুশ সংঘ সর্বদাই ইনক্লুসিভ (সবাইকে নিয়ে তারা পথচলা), কোনো সময় এক্সক্লুসিভ (কাউকে বাদ দিয়ে পথচলা) নয়।” এ কথাটি আমাদের সন্ন্যাসজীবন, মিশনকর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মপ্রদেশীয় যাজক, অন্যান্য সন্ন্যাসসংঘ ও মণ্ডলীর সাথে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক কথা বলে। এই কথাটি আগামী কালের পথচলায় অন্তরে গেঁথে রাখি।

তথ্যসূত্র:

- (১) মরো হাউজ আর্কাইভ: চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের কাগজপত্র ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসমূহ ১৯৭১, ১৯৭৫, ১৯৭৮, ১৯৮১, ১৯৮৪ খ্রি., সুপিরিয়রের সার্কুলার এবং তৎকালীন সংশ্লিষ্ট প্রভিন্সিয়ালদের কাছে লেখা চিঠিপত্রাদি।
- (২) মরো হাউজ আর্কাইভ: ঢাকার ট্রেমাসিক সভার বিবরণী, বিভিন্ন জনের লেখা, ডিস্ট্রিক্ট চ্যাপ্টার – সুপিরিয়রের সার্কুলার এবং তৎকালীন সংশ্লিষ্ট প্রভিন্সিয়ালদের কাছে লেখা চিঠিপত্রাদি।

রচনা- ৬: যিশু হৃদয়ের সংঘপ্রদেশ : একসঙ্গে পথচলার চেতনা ও অভিজ্ঞতা

ভূমিকা:

- যিশু হৃদয়ের সংঘপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করার লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পথচলা উদ্বোধন করতে আমরা সমবেত হয়েছি।
- সংঘপ্রদেশের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপনের সাম্প্রতিক মাণ্ডলিক প্রসঙ্গ হচ্ছে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী, যার যাত্রাপথে আছে তিনটি অগ্রাধিকার: মিলন, মিশন ও অংশগ্রহণ।
- প্রাসঙ্গিকতার কারণে জয়ন্তী উৎসব হতে পারে সিনড-বিশিষ্ট পবিত্র ক্রুশ সংঘপ্রদেশ হিসেবে পরিপক্ব হওয়ার একটি প্রক্রিয়া।

১) পবিত্র ক্রুশ সংঘের একসঙ্গে পথচলা: মিলন, অংশগ্রহণ ও মিশন

পবিত্র ক্রুশ সংঘের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে অতীতের দীর্ঘ যাত্রাপথে ছিল অনেক মাইলফলক। পবিত্র ক্রুশ সংঘটি পৃথক ও স্বতন্ত্র ভাবে শুরু, আবার একত্রে মিলন-প্রতিষ্ঠার বিশেষ মুহূর্ত (১৯৩৭ খ্রি.)। সংঘে পুণ্য পরিবারের আদর্শে স্থাপিত তিনটি সমাজ (ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার), আবার আদর্শগত ভাবে একটি পরিবারের মিলন, মিশন এবং সম্মিলিত মিশনে অংশগ্রহণ (১৮৫৩-১৯৪৫)। সিস্টারদের ভিন্ন সময়ে তিনটি সংঘ প্রতিষ্ঠা (১৮৫৫ পৃথক, তিনটি সংঘ রূপে অনুমোদন ১৮৬৭, ১৮৬৯, ১৮৮৩), আবার তারা একই সংঘ-প্রতিষ্ঠাতার অনুসারী ও সন্তান। ১৯৪৫ খ্রি. ফাদার ও ব্রাদারদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা স্থাপন; আবার সংঘ পর্যায়ে সাংবিধানিক আদর্শে ও অনুশাসনে আছে ঐক্য ও মিলন। এই ছিল গোটা পবিত্র ক্রুশ সংঘজুড়ে স্বাভাবিক ও মিলনের ধারার ইতিহাস। সাম্প্রতিককালে সংঘের অবকাঠামোতে আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রতিক্ষায় থাকব সেই পরিবর্তন কীভাবে আদি আদর্শে নিয়ে যাবে। ইতোমধ্যে কিছু লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

২) বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার-ব্রাদারদের একসঙ্গে পথচলা আবার স্বাভাবিক ও মিলনধারা

- বঙ্গ মিশনকে লক্ষ্য হিসেবে সামনে রেখে একসময়ে ছিল গোটা পবিত্র ক্রুশ সংঘের পথচলা যার ফলশ্রুতিতে পবিত্র ক্রুশ সংঘের অনুমোদন লাভ করে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে।

- বাংলায় একাধিক জাতি ও কৃষ্টির সদস্যদের মধ্যে (আমেরিকান, ইউরোপীয় কানাডীয়, বঙ্গীয় ও ভারতীয়) ছিল স্বাভাবিক; আবার পবিত্র ক্রুশ সংঘের মিলন ও মিশনে অংশগ্রহণের মধ্যে ছিল সবার মিলন ও ঐক্য।
- সাংগঠনিক কাঠামোগত ভাবে পবিত্র ক্রুশ সংঘের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা (আমেরিকান ও ফরাসীভাষী ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাইকারিয়েট বা ডিস্ট্রিক্ট), আবার সেখানেই মিলনের ধারায় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রাদারদের জন্য ও ফাদারদের জন্য ডাইয়েসিস পর্যায়ে পৃথক দুটো ডিস্ট্রিক্ট প্রতিষ্ঠা করা। পরবর্তীতে সংঘ-পর্যায়ে ব্রাদার ও ফাদারদের জন্য স্বতন্ত্র সংঘপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে, তথাপি বাংলায় জাতীয় পর্যায়ে উভয়ের মিলন অব্যাহত থাকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
- ধর্মপ্রদেশের সীমানার ভিত্তিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে, আমেরিকা ও কানাডার প্রভিন্সের অধীনে আবার চারটি ডিস্ট্রিক্ট স্থাপন করা হয়: ফাদার ও ব্রাদারদের জন্য ঢাকাতে দুটো এবং ও ব্রাদার ও ফাদারদের জন্য চট্টগ্রামে দুটো।
- স্থানীয় মণ্ডলীর চিন্তাধারার প্রেক্ষাপট থেকে ১৯৮০ দশক থেকে বাংলাদেশে ফাদারদের জন্য একটি ও ব্রাদারদের জন্য একটি ডিস্ট্রিক্ট করার প্রক্রিয়া শুরু হয় যা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন করা হয়।
- ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের পর উক্ত দুটো ডিস্ট্রিক্টকে ভাইস-প্রভিন্স হিসেবে উন্নীত করা হয় এবং এক যুগ ধরে যাত্রার শেষে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে দুটো পৃথক প্রভিন্স প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ঘটনার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপনের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে আমরা মিলিত হয়েছি।
- বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সিস্টার, ব্রাদার ও ফাদারগণ, সাংগঠনিক অবকাঠামোতে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করলেও, সেখানে রয়েছে মিলন, মিশন ও অংশগ্রহণের একসঙ্গে পথচলা, যা বিভিন্ন ও সম্মিলিত কর্মসূচিতে প্রকাশিত হচ্ছে।
- পৃথক পৃথক ভাবে সংঘপ্রদেশের রজত জয়ন্তীর সূচনা হলেও আবার আগামী বছরে একত্রে, সমবেতভাবে বাংলাদেশের দুটো সংঘপ্রদেশের রজত জয়ন্তী উৎসব করার বাসনা ও নির্দেশনা রয়েছে। এরূপ সিদ্ধান্তটিও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে মিলন-সন্ধান ও মিলন-বাসনার ইঙ্গিত বহন করছে।

৩) পবিত্র ক্রুশ সংঘে আমার পথচলার অভিজ্ঞতা:

(ক) ১৩ জুন, ১৯৬১ সাগরদি নবিশিয়েটে প্রবেশ: ৬২ বছরের পথচলা

(খ) ১৪ জুন, ১৯৬২ প্রথম ব্রত গ্রহণ আর শেষব্রত গ্রহণ করেছি ১৯৭১ খ্রি.

(গ) পথচলার অভিজ্ঞতার কয়েকটি দিক:

- স্কুল জীবনে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ও পবিত্র ত্রুশ সংঘের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের দ্বারা প্রাথমিক গঠন লাভে ঐক্য ও মিলনের সাক্ষ্য দেখেছি। যাজকীয় পালকীয় জীবনেও অনেক ক্ষেত্রে তার বিস্তৃতি আমার উপলব্ধি হয়েছে।
- নোয়াখালি (১৯৫২) এবং সাগরদীতে (১৯৫৪) ফাদার-ব্রাদার এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম ভাইকারিয়েট/ডিস্ট্রিক্ট এবং আন্তঃধর্মপ্রদেশ/আন্তঃপ্রভিন্সের- এর যৌথ নবিশিয়েট ও (থিওলগেইট) স্কলাস্টিকেটের গঠন ব্যবস্থা, পবিত্র ত্রুশ সংঘের একটি সুন্দর ঐতিহ্যগত সম্পদ।
- যৌথ প্রাথমিক গঠন লাভ করে পবিত্র ত্রুশ সংঘের ফাদার হওয়ার পর, একই বাংলাদেশে বাস করে ইন্ডিয়ানা ও ফ্রান্স-কানাডীয় প্রভিন্সের অধীনে পৃথক ভাবে থাকার বিষয়ে প্রশ্ন জেগেছে অনেকের মনে।
- প্রভিন্স প্রতিষ্ঠার পেছনে যারা স্বপ্নদ্রষ্টা, অগ্রদূত, যারা কঠোর পরিশ্রম করে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি: ফাদার পাইয়া, বিশপ যোয়াকিম, ফাদার লেকাভালিয়ার, ফাদার প্যাটনোড, ফাদার ডি'ত্রুজ, ফাদার নেলসন, ফাদার লাবে, ফাদার টিম, ফাদার ভুর্ডি, ফাদার জিম্মারম্যান, ফাদার টমাছ বারোস, ফাদার স্টিফেন, ফাদার বেঞ্জামিন, ফাদার প্যাট্রিক, ফাদার গিলবার্ট, ফাদার ফ্রাঙ্ক, ব্রাদার লরেন্স, ব্রাদার জন, প্রমুখ আরো অনেকে।
- জয়ন্তী উৎসবকালে স্থানীয় পবিত্র ত্রুশ সংঘ গড়ার প্রেরণায় অন্যদের সাথে একত্র হয়ে আমার নিজের সক্রিয় অবস্থান, চিন্তাভাবনা, কার্যক্রম, নেতৃত্ব, প্রভৃতিতে সম্পৃক্ততা স্মরণ করছি এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের এবং আমাদের সাথে ঈশ্বরের পথচলা এবং পবিত্র ত্রুশ সংঘের সদস্যদের সাথে চ্যালেঞ্জপূর্ণ একটি দীর্ঘ সহ-পথচলাও স্মরণ করছি।
- আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা সহভাগিতার পরিসমাপ্তিতে আমি প্রতিষ্ঠাতা ধন্য বাসিল মরোর সাথে একাত্ম হয়ে স্বপ্ন দেখি একদিন বাংলাদেশে পবিত্র ত্রুশ সংঘের ব্রাদার ও ফাদারদের সমাজ (শুভসময়ে সিস্টার-সমাজ) সবাই পবিত্র ত্রুশ সংঘের সন্ন্যাসব্রতী নামে অভিহিত হবে। আদিতে তো তাই ছিল। ফাদার মরো তো সেটাই চেয়েছিলেন। ফাদার মরো যেমন মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, পরিকল্পনাটি “বাহ্যিকঃ হঠকারী হলেও, তা স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ”।

- পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধানের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে: “পবিত্র ক্রুশ সংঘ শুধুমাত্র সেবাকাজে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদল হিসাবেই নিজেদের পরিচয় ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায়নি, উপরন্তু প্রতিষ্ঠাতার মূল লক্ষ্য সামনে রেখে যাজক-সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্ত সন্ন্যাসব্রতীদের নিয়ে গঠিত সংঘটি পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত জীবন যাপন করার এবং পরস্পরের সঙ্গে ও পবিত্র ক্রুশ সংঘের ভগ্নীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করার প্রয়াস পাচ্ছে।”

(ঘ) বাংলাদেশে ফাদারদের একটি সংঘপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা করার কারণসমূহ

- প্রথম, বাংলাদেশে স্থানীয় মণ্ডলী গড়ার লক্ষ্য, আগ্রহ ও রূপরেখা - নিজেদের মধ্যে ও অন্যদের মাঝে - মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করে, এবং এক্ষেত্রে যৌথ ভাবে পবিত্র ক্রুশ সংঘের অবদান রাখার বাসনা।
- দ্বিতীয়, বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলীতে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদারদের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের বাসনা ও অশুভ ভিন্নতার পরিহার। এই সময়ে ব্রাদার ও ফাদারদের একটি প্রভিন্স করার যুক্তিও জোরেসোরে ব্যক্ত করেছেন।
- তৃতীয় স্থানীয় মণ্ডলীতে পবিত্র ক্রুশ সংঘের মতো একটি বৃহৎ ধর্মসংঘের পরিপক্বতার দৃষ্টান্ত অর্জন এবং স্থানীয় সন্ন্যাসব্রতীদের মধ্যে নেতৃত্ব ও পরিচালনের দক্ষতা বৃদ্ধি।
- চতুর্থ, সর্বক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বাবলম্বীতা অর্জনের প্রচেষ্টা এবং বিদেশী মিশনারিদের উপস্থিতিতে ও তাদের অভিজ্ঞতার সহায়তায় একসঙ্গে পরিপক্বতার উদ্দেশ্যে পথচলার ভাবনা। এই কারণে মিশনারীরা তাদের থাকাকালীন অবস্থায় নবীনদের কাছে সংঘের কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।
- পঞ্চম, পবিত্র ক্রুশ সংঘের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ সংঘ-প্রদেশের নিজস্ব অবদান রাখা। গ্রহণকারী অবস্থা থেকে প্রদানকারী অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া।

প্রভিন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তীর উদ্বোধন আমাদের কাছে আহ্বান আসছে: বাংলাদেশ পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার ও ব্রাদারদের সম্প্রদায়ে ঈশ্বর অতীতে কী করেছেন? তাঁর আত্মার কণ্ঠস্বর ও পরিকল্পনা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে? সংঘের সদস্যরা অতীতে কীভাবে এবং বর্তমানে কীভাবে সেই আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন? এ সবকিছু দেখে দেখে প্রভুর প্রশংসা করা।

দ্বিতীয় আহ্বান আসছে: আমাদের ব্যর্থতা ও অপারগতা চিহ্নিত করা এবং অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাওয়া ঈশ্বরের কাছে এবং পরস্পরের কাছে।

আর তৃতীয় আহ্বান আসছে: আগামী ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের আত্মা পবিত্র ত্রুশ সংঘকে কী বলছেন তা শ্রবণ করা, যাতে নতুন চলার পথ আবিষ্কার করে সেই পথচলার জন্য অঙ্গীকার করা, যাতে আমাদের মধ্যে মিলন, অংশগ্রহণ এবং মিশন আরও সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ, অর্থপূর্ণ ও প্রাবন্ধিক হতে পারে।

ৱক্তা- ৭: ENLARGE THE SPACE OF HOLY CROSS TENT

“Enlarge the Space of your Tent” (Isaiah 54:2)

CONTEXT OF THE TOPIC

Universal Synodal Church – A call to enlarge the space for being Church:

“Enlarge the Space of your Tent” (Isaiah 54:2)

150th Death Anniversary of Blessed Moreau – A call for Holy Cross (Death 1873+150=2023)

170th Anniversary of the Bengal Mission – A call for Holy Cross in Bangladesh.

(Some dates: Founded 1837; Bengal Mission 1853; 2003: 150 in Bengal; Venerable 2003; Blessed 2008)

IMPORTANCE OF THE CALL TO BE CHURCH AND TO BE HOLY CROSS

- A call to Synodal Church is also a call to Synodal Holy Cross since Religious life of Holy Cross is at the Core of the Church.
- It is a moment of grace, a gift of the Holy Spirit in our time and space.
- It is a call to be witnesses and missionaries of the Good News.
- It is a time of thanking the Leadership of Pope Francis in the Church and of Blessed Moreau in Holy Cross.
- It is an opportunity for conversion and renewal
- It is an invitation to listen to the Holy Spirit.

I. **SYNODAL CHURCH and SYNODAL HOLY CROSS**

- A. Synod:** People of God walking together as “followers of the Way”, Jesus who is the “Way, Truth and Life”.

Holy Cross: Holy Cross (Priests, Brothers and Sisters) walking together as followers of Jesus within the Church and within the Holy Cross Community.

- B. A Common Dignity of all the Baptized:** Church of everyone: Faithful, Religious, Priests.

Holy Cross: Consecrated in Baptism and in Holy Cross Religious life is our common Dignity.

- C. Synodality** means communion of all the People of God Journeying Together.

Holy Cross: Journeying together as Consecrated people following the Charism of Holy Cross and as per vision of the Founder.

- D. Aim of the Synod:** a Synodal process (and not an event), of being Church, a new way of being Church guided by the Holy Spirit, according to what “He says to the Church”.

Holy Cross: To be Holy Cross is a continuous process not restricted to any event like, First Profession, Final Profession, etc. guided always by the Holy Spirit listening always what He says to the Holy Cross Community.

E. Synodal Key Themes:

- 1) **Communion:** founded on Triune God, rooted in the Holy Spirit, common listening to the Word of God and the Tradition of the Church and grounded in the *sensus fidei*.
- 2) **Participation:** of all the baptized: to pray, listen, analyse, dialogue, discern and offer advice or making pastoral decisions which correspond as closely as possible to God’s will.
- 3) **Mission:** to witness to the love of God to whole human family, to witness to the Gospel, particularly with those who

live on the spiritual, social, economic, political, geographical, environmental and existential peripheries of our world.

Holy Cross Themes (4 “C”s)

- 1) Consecration:** Trinitarian Dimension; Consecration in Religious Life grounded on Baptism, on three evangelical counsels living according to the Charism of the Congregation for the mission of the Church. Three evangelical counsels lead the Consecrated people to configuration to the mystery of Christ.
- 2) Communion:** Trinitarian Community, ecclesiology of Communion in Universal and Local Church, communion of Holy Cross Family as modeled after the Holy Family of Nazareth (priests/Brothers/Sisters), and communion within the members of each community; an eloquent sign of ecclesial communion.
- 3) Collegiality (participation):** Communion is collegiality, co-responsibility; Co-responsibility flows out of the communion, from the roles of the parts of the body and of the gifts of the Holy Spirit. “One does not build alone but together”. Recognition of the responsibility of each and everyone in the Church, Congregation and in the Mission.
- 4) Com-mission:** Mission of the Holy Cross Congregation is Evangelization and cooperation in furthering the Kingdom of God. Being rooted “in the fertile soil of the Church”: (a) this cooperation is “with the bishops who govern the local Churches” (CL 54, 75). (b) to pastoral ministry of education, preaching and administration of sacraments, (c) this cooperation includes support to the ministry of mercy and compassion, (d) and is carried out with the qualities of ingenuity, inventiveness and prophetic boldness.

F. The Logo of the Synod:

- A large majestic tree, full of wisdom and light, reaches for the sky.

- A sign of deep vitality and hope which expresses the cross of Christ. It carries the eucharist, which shines like the sun. The horizontal branches, opened like hands or wings, suggest, at the same time, the Holy Spirit.
- Different People journeying together, children and young are in front
- People are inclusive of all in the Church.

Holy Cross: *Spes Unica*, the Cross is “Our Only Hope”.

G. Prayer of Invocation: “We stand before you, Holy Spirit”

“We stand before you, Holy Spirit, as we gather together in Your Name. With You alone to guide us, make yourself at home in our hearts. Teach us the way we must go and hope we are to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path nor partiality influence our actions. Let us find in You our unity so that we may journey together to eternal life and not stray from the way of truth and what is right. All this we ask of You, who are at work in every place and time, in the communion of the Father and the Son, forever and ever. Amen.”

Holy Cross: Prayer for the Synod

H. Listening: by the Entire People of God what the Holy Spirit is saying to the Church. Synodal process is a lived experience of discernment, participation and co-responsibility.

Holy Cross: Constant Discernment: What does the Holy Spirit say to the Congregation of Holy Cross?

I. Fruits of Synod: to dream about the Church, people’s hope flourish, trust, bind of wounds, new and deeper relationships, mutual learning, building bridges, enlightening minds, warm hearts, restoring strength for our common mission.

Holy Cross: In addition to the above, the following: discovering the originality of the Vision of our Founder. Visible Communion among the three branches of the Holy Cross. Communion among Priests, Religious and laity at all levels of the apostolate.

Missionary Spirit, apostolic Zeal, God's providence, Work of God, to build together and not alone, education of minds and hearts, Educators of Faith, Less individualism and more communitarian apostolate, prayer life, discernment, etc.

J. Call for Conversion: a personal and communitarian conversion; wider level social, political, environmental and pastoral conversion.

Holy Cross: Change of mind-set, communitarian dimension of administration, apostolate, ministry and spirituality.

II. VISSION OF BLESSED MOREAU

With the renewal brought by Vatican II, the Holy Cross Congregation has been renewed according to the original inspiration of our Founder Blessed Moreau. The new Constitutions are a testimony in which the community's original charism has been discovered anew, identified more clearly and directives for Holy Cross life and mission have been given accordingly.

Let us now consider very briefly the charism (Vision) of Fr. Moreau from whom originates the grace of the foundation.

A. Apostolic Inspiration and Providence of God

Immediately after the French Revolution, faced with urgent needs of the Church and society particularly a lack of priests, Christian educators, formators of the clergy, evangelical workers and of workers in mission fields, and set out to respond to these needs.

Fr. Moreau made the discernment not in isolation but in communion with the Church and its authority, with the spirit of "*sentire cum ecclesia*", and with the vision he received and confirmation of his apostolic desire.

He confronted the challenges of the needs with extraordinary personal qualities, that is: urgency of love and action, courage and zeal, dedication and gentleness, patience and steadfastness. He asked the same qualities from the collaborators of Brothers, Fathers and Sisters.

Fr. Moreau was deeply convinced that God was “the one who began it”, it was the “work of Providence”, a plan of God himself. Like the Divine Master he suffered in faith as he completely surrendered to the will of God.

B. Holy Cross in God’s Plan

The plan of God inspired Fr. Moreau to create something new, something that did not yet exist: a religious family with a means of evangelization and a mission outlook.

1. A Religious Family:

Fr. Moreau did not start with vocation promotion or recruitment. His was an original approach. With his organizing gift he brought together three groups of “evangelical workers” -- Priests, Brothers and Sisters, and formed them into “one unit in the Church” for the sake of mission. Added to the three groups of “fraternal collaborators” Fr. Moreau also formed lay people’s associations for collaboration with the three societies. Thus Holy Cross as a Religious Family was given birth by the Holy Spirit for a mission of service to the Church.

2. Means of Evangelization:

Fr. Moreau gathered together evangelical workers and sent them out to educate, and expected them to use that education as means of evangelization: education in faith by preaching, teaching, forming and taking pastoral care; education of the whole person - not only to serve Christ in the Church but also to be responsible citizens, good workers in the secular and troubled society of the day. Fr. Moreau wanted his evangelical workers to be at the disposal of the Church for the sake of the Kingdom of God.

3. Mission Outlook:

Fr. Moreau wanted apostolic zeal to be a primary characteristic of his sons and daughters. The apostolic zeal would originate from their evangelized hearts; zeal that would manifest in their everyday life; zeal that would extend to different apostolic horizons (or spaces), and zeal that would inspire them to pray.

III. “ENLARGE THE SPACE OF YOUR TENT” (Isaiah 54:2)

A. “Tent-Life-Experience”:

Some have experiences and others do not have tent-life-experience. Those who did camping in the past, they surely had some experiences: my own experience in YCM camping, Scout camping, etc.

Descriptions: tent not regular house, no doors, windows, walls, or rooms, or toilets; no beds, chairs and tables. It is an open space, new person can be taken in, ever expandable; some kind of affinity, affection, sense of fellowship, not a permanent place, facilities are bare minimum and the tent can be pitched, plucked up and move to a new place as need arises.

Biblical Experiences:

In Semitic culture people frequently moved from one place to another, dwelt in tents, Israelites had journey experiences on the way to the Promised land and living in tents was not alien to them.

Abraham, Isaac and Jacob lived mostly in tents; After his call Moses lived in tent during the journey, David pitched his tent and put the ark of the Covenant in it. The call of Isaiah to expand and make space for others would easily be understood by the Israelites. Welcoming the foreigners, sojourners and strangers, as an example, Abraham by the oaks of Mamre receiving, inviting, giving hospitality, receiving blessings from the visitors.

In the NT, the incarnation is described as “God pitched his tent among us”, someone coming to dwell with us. Paul was a tent maker and earned his livelihood with the trade. As preacher he surely knew what it means to pitch tent to preach the Word of God. He enlarged the space of the tent of the Church, through missionary journeys and constantly called for unity in the Church.

B. Synodal call for Enlarging Space of the Tent:

How do we as a Church and as Holy Cross enlarge the space of our tent today?

Enlarging Space of the tent means: “being more inclusive, welcoming, creating space for others. Avoiding exclusion and neglect, eschewing discriminations based on colour, nationality or status. It means not passing by the wounded man on the highway but stopping to lift him up and bandage his wounds, taking him to the inn and caring for him. It involves setting aside our other pre-occupations and appointments... it is an attitude of the heart to sense the needs of our neighbour.”

“A Synodal journey entails going along together, taking a along everyone, and not leaving behind anyone – the weak, the feeble, the aged, the helpless, the vulnerable, those in the periphery and those who struggle to walk.” (Fr. George Plathottam, sdb, *People of Asia, Journeying with Jesus*, 2023.)

C. Enlarge the Space of Holy Cross Tent

Here are some proposed spaces which may indicate more enlarging of the tent pitched on the soil of Bangladesh with renewed spirit of Synodality in the Church and in the light of the Vision of Blessed Moreau.

- 1. Evangelization:** The primary mission of the Church is the *Evangelization Today*, (*Evangelii Nuntiandi*, 1975), after the example of *Mission of the Redeemer* (*Redemptoris Missio*, 1990), proclaiming the *Joy of the Gospel* (*Evangelium Gaudium*, 2013), taking care of our Common Home (*Laudato Si*, 2015) to all *Brothers and Sisters* (“*Fratelli Tutti*”, 2022), journeying together with the People of Bangladesh.
- 2. Inter-Religious Dialogue:** In the midst of Religious pluralism and in the minority status of the Church, positively understood as power of “salt”, “light” and “yeast”, Inter-Religious Dialogue offers a new pathway to build “Human Fraternity” with cooperation with the people of all religions and cultures.
- 3. Poverty and Development:** The Church in Bangladesh is known for Charitable activities and development projects to mitigate poverty, injustices and hardship of people. Holy Cross have been involved always in these activities and now the call is to

get a new way of being involved in the Integrated Human Development for the promotion of Human Dignity and Rights.

4. **Women:** There is a need of greater recognition and appreciation of the role of women in the Church and in the society, their participation in decision-making and pastoral action, which is rooted in their Baptismal dignity.
5. **Youth:** Youth ministry has been given much attention by the Church. However, their voices need to be heard, a renewed focus on young people, their formation and accompaniment are their urgent needs. The digitalization opens a new horizon for the evangelization by the young, assuring at the same time, proper use of social media.
6. **Education:** The main goal of education as proposed by the Church is to build “Human Fraternity”. Along with the “education in faith” and in the formation of the “mind and heart”, Holy Cross may be more focused to build human fraternity in an inter-religious approach in its educational institutions.
7. **New Way of Being Church:** New way of being Church is to live out in our times the aggiornamento of the Second Vatican Council, being Church in dialogue with other religions and other ecclesial communities, greater attention to the laity, recognition of the gifts of the Holy Spirit in men and women in the Church and institutions, being less hierarchical, less clerical and being more participatory, less institutional and more community based ministry from the grass roots level (SCC).
8. **Prayer and Contemplation:** The People of God are led by the Spirit. Hence great importance and value to prayer, discernment, meditation of the Word of God, holiness of life as expressed in Holy Cross in Consecration, Communion, Collegiality and Com-missioning. Richness of icons, symbols, prayer forms, artistic writing and inscriptions, prayer beads, flowers and incense, prayer postures, costumes, especially demarcated sacred places, specific times of prayers, value of silence, chants, music, and vocal and repetitive prayer. The Liturgical

celebrations, official prayers of the Church, Holy Rosary, *lectio divina*, inter-religious prayer expressing faith in God – the Father of all peoples needs to be faithfully practiced.

As members of Holy Cross, we have the memory of 186 years of Holy Cross History out of which 170 years of our mission in Bengal journeying together. 150th centenary of the death of our beloved Founder, Blessed Moreau provides the occasion for celebration. The prophetic vision of our Founder again beacon us anew to walk in his footprints and in the concrete footprints his followers on the paths to move forward. We have great and challenging history still to be accomplished. Looking to the future as we journey together, let us make our lives a fervent expectation of Christ with an unceasing calling out “Come Lord Jesus, come!”

কথা- ৬: CATHOLIC EDUCATION APOSTOLATE IN BANGLADESH: SOME SALIENT FEATURES

INTRODUCTION: INFORMATION, FORMATION AND TRANSFORMAION IN HOLY CROSS EDUCATION

1. Education as Information: Sharing of Knowledge and Wisdom
2. Education as Formation: Formation of Human Person for human society
3. Education as Transformation: For transformation of Self and the Society

A. CONTEXT: GLOBAL AND BANGLADESHI

It is good to mention at the start that Education and Formation is always contextual: situations of the time and space as reflected by human beings in their historical context plays an important role.

Examples: Fr. Moreau after the French Revolution (Formation of Mind and Heart), British Colonial period in India (Bureau-Oriented Education), Present Bangladesh (Education to be Good Citizen in Bangladesh)

1. Some General Observations on Global Context

In comparison to the situation of the second half of the last century there is a change of the historical and social context in which we live, both in terms of world vision as well as ethical and political concepts.

Globalization is a reality. Together with economic globalization, there is social, cultural and political globalization which is sometimes considered as pressure on the developing countries. Globalization process instead of promoting individual development and greater integration among peoples, seems to limit individual freedom and creates conflicts between different ways of looking at personal and collective life, with positions ranging from strict fundamentalism to skeptical relativism.

Economic and political developments have caused triumph of **liberalism** with the dreadful impact on education and educational institutions.

Secularization has caused crisis in value system of a culture, anthropological and religious beliefs, education and formation, etc.

Migration and Displacement of peoples, both international as well as internal in a nation have caused to spread plurality of culture and religions with new challenges for education.

Integral Human Development with emphasis on: Dignity of human person, human society, Earth as Common Home, Fraternal Humanity, and so on.

2. Education Policy in Bangladesh

1. The new Education Policy was published in 2010. Twenty six principles were listed there. Some of the most important ones are:
2. Education according to the four national Principles which were fundamentals for the creation of Independent Bangladesh: Democracy, Socialism, Secularism and Nationalism;
3. Educational to moral, human, cultural, universal brotherhood, scientific values to inspire mind, work, practical life.
4. Education in science and technology for living in the digital world.
5. To maintain standered education at all levels
6. Education to create vocational and skilled labour force
7. To promote research for higher studies.
8. Educational priorities to the poor, disabled, adibashi and smal ethnic groups and under-priveleged.

B. CATHOLIC IDENTITY AND MISSION:

1. Catholic Vision of Education

Our Education is a **work of evangelization** which is the Mission of Christ and our mission.

Education or Teaching is one of the three functions of Church; it is the **Prophetic function** and the other two are: priestly and royal functions.

The Second Vatican Council, held in early 1960s, reading the signs of the time, emphasized two dimensions that education necessarily encompasses when analyzed from the stand point of faith: the secular

and theological-spiritual dimensions, in other words, **human and divine dimensions**.

The root of education given by the Catholic institutions is our **spiritual heritage** which is constantly in dialogue with cultural heritage.

We are **Catholic** in understanding the People of God which is inclusive of all the peoples of all religions and cultures.

The main objective of the Church's Education is: **Formation of human person and his dignity**, as Image of God, after the example of God-Man Jesus Christ, who is the Way, the Truth and the Life.

2. Priorities presented by the Holy Father Pope Francis

Pope Francis and the Congregation for Catholic Education organized a Gathering of the Intellectuals and Students of the World, on Oct. 11-18). The **Global Compact on Education** was finally signed on October 15, 2020. Pope called all people of goodwill to support the Global Compact on Education and highlighted his commitment:

First, to make human persons in their value and dignity *the centre of every educational programme*, both formal and informal, in order to foster their distinctiveness, beauty and uniqueness, and their capacity for relationship with others and with the world around them, while at the same time teaching them to reject lifestyles that encourage the spread of the throwaway culture.

Second, to listen to the *voices of children and young people* in order to build together a future of justice, peace and a dignified life for every person.

Third, to encourage *the full participation of girls and young women* in education.

Fourth, to see in the *family the first and essential place of education*.

Fifth, to educate and be educated *on the need for acceptance and in particular openness* to the most vulnerable and marginalized.

Sixth, to be committed to *finding new ways of understanding the economy, politics, growth and progress* that can truly stand at the service of the human person and the entire human family, within the context of an integral ecology.

Seventh, to *safeguard and cultivate our common home*, protecting it from the exploitation of its resources, and to adopt a more sober lifestyle marked by the use of renewable energy sources and respect for the natural and human environment, in accordance with the principles of subsidiarity, solidarity and a circular economy.

Finally, we want to commit ourselves courageously to *developing an educational plan* within our respective countries. In this, our point of reference should be the social doctrine that, inspired by the revealed word of God and Christian humanism, provides a solid basis and a vital resource for discerning the paths to follow in the present emergency.

C. FUNDAMENTALS OF THE CHURCH'S EDUCATION APOSTOLATE IN BANGLADESH

We are Christians: Catholic Church is a Christian (religious) institution, involved in teaching ministry. This is and should be recognized as such by all involved and particularly witnessed by the leadership of the Church.

We work for all and with all: Catholic Church does this education ministry (not simply service) not only through the Church leaders or through the Religious of the Congregations, but also together with the collaborators of other religions who share the human values common to all.

We work for promoting human person and his dignity: Flowed out of the convictions and experiences, the main objective of education and formation shall be the promotion of Human Person and his dignity understood as a relational human being: (a) with God (b) with individuals, (c) with community and (d) with the world.

We work for Harmony: In the context of the inter-religious and inter-cultural the society our education should focus on building inter-religious harmony, following inter-religious approach and methodology.

We work for Human Fraternity: Ultimately the Church educational institutions should aim at formation in "HUMAN FRATERNITY", so that everyone in our educational institutions

may grow as they go with fraternal love of considering humanity as “brothers and sisters” of the same family and thus transforming the society as a common good for living as human beings.

We make ourselves Relevant: We periodically assess our Catholic educational institutions, in context of living and choose priorities in the light of the principles given above.

D. EDUCATION IN HOLY CROSS: RESULTS OF THE REFLECTION OF THE PROVINCE

Exercise: Reflection as individuals and as community

Discernment: individual and communitarian

Commitment: individual and communitarian

Sources:

Cardinal Patrick D’Rozario, csc, *wkjv I 7mev* (Teaching and Service), Dhaka, 2023

Congregation for Catholic Education, *Educating to Intercultural Dialogue in Catholic Schools: Living in Harmony for a Civilization of Love*, Vatican City 2013.

Congregation of Catholic Education, *Educating today and Tomorrow*, Vatican City, 2014.

Pope Francis and the Congregation for Catholic Education organized a Gathering of the Intellectuals and Students of the World, on Oct. 11-18: *The Global Compact on Education* October 15, 2020.

ৱচনা- ২: যিশু হৃদয় সংঘ প্রদেশ প্রতিষ্ঠার রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে ধর্মোপদেশ

বাংলাদেশের পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারগণ এবং ফাদারগণ এ বছর প্রভিন্স রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রজত-জয়ন্তী পালন করছেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র যিশু হৃদয়ের ভাইস-প্রভিন্সটি পূর্ণ “প্রভিন্স” হিসেবে পবিত্র ক্রুশ সংঘে মর্যাদা লাভ করে। এই ঘটনার স্মরণার্থে আমরা আমরা আজ সমবেত হয়েছি এবং তারই রজত-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি। পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনার উদ্‌যাপন করতে গিয়ে, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি অতীত ইতিহাসের কয়েকটি মাইলফলক।

“ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে, ফ্রান্স দেশের চরম দুর্যোগের সময় ল্য-মঁ ধর্মপ্রদেশের বাসিন্দা ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো নামক একজন ধর্মপ্রদেশীয় পুরোহিত পবিত্র ক্রুশ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন”। প্রায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ল্য মঁ ডাইয়োসিসের, “রুইয়ে-সুর-লোয়া” নামক একটি ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ছিলেন ফাদার জ্যাক ফ্রাঁসোয়া দুজারিয়ে। ফাদার দুজারিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভক্তজনগণের মধ্য থেকে কয়েকজন নিয়ে ‘সাধু যোসেফ’ নামে একটি ‘দ্রাভ-সমাজ’ গঠন করেন। ফাদার মরো ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে, ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সহায়তার জন্য, বিশেষভাবে প্যারিশে নির্জনধ্যান পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে পাঁচ জন ধর্মপ্রদেশীয় পুরোহিতদের নিয়ে একটি সমাজ-দল গঠন করেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ এই দুটো ‘সমাজ-দল’ একটি “মৌলিক চুক্তি”র মাধ্যমে ফাদার বাসিল মরো একত্রিত করে “পবিত্র ক্রুশ” নামে একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল পালকীয় ও শিক্ষাক্ষেত্রে সেবাকাজ করা। আবার ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার মরো কয়েকজন নারীদের একটি সমাজ-দলে সংগঠিত করলেন। এভাবে ফাদার মরো, স্বায়ত্বশাসিত তিনটি শাখা একত্রিত করে একটি ধর্মসংঘ স্থাপন করলেন যার নামকরণ হল “পবিত্র ক্রুশ সংঘ” কেননা “পবিত্র ক্রুশ” (“স্যান্ড ক্রোয়া”) প্যারিশে ছিল তাদের অবস্থান। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ১৫ আগস্ট ফাদার বাসিল মরো পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রকাশ্যভাবে সর্বপ্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন।

“পবিত্র ক্রুশ সংঘের পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টারগণ যথাক্রমে সালভাতোরিস্ট, যোসেফাইট এবং মেরীয়ানাইট নামে আখ্যায়িত হতে থাকেন। সংঘের প্রতিষ্ঠাতা চেয়েছিলেন যেন তাঁরা ‘পবিত্র পরিবার’ এর দৃশ্যমান অনুকরণে তাদের জীবনযাত্রা ও কাজে একত্রে সংযুক্ত থাকেন। তাঁদের এই একতাকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন ‘এমন এক শক্তি যার দ্বারা গোটা জগতটাই আলোড়িত, অনুপ্রাণিত ও পবিত্রীকৃত হয়ে উঠবে।’” আমার সর্বদায়ই মনে হয়েছে যে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার মণ্ডলী সম্বন্ধে এই ধারণাটি ছিল একটি অগ্রণী দর্শন ও প্রাবক্তিক সিদ্ধান্ত।

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে পবিত্র ত্রুশ সংঘটি বিভিন্ন অঞ্চলে ও দেশে মিশনারি কাজের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তৎকালীন ভারতের পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে মিশন-দায়িত্ব গ্রহণ করার শর্তে, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠাতা ফাদার মরো পূর্ববঙ্গে পবিত্র ত্রুশ সংঘের মিশনারি হিসেবে প্রথম একটি দল প্রেরণ করেন।

আমাদের সংবিধানে যেমন আছে: “যুগের প্রয়োজনে নতুন নতুন সেবাকাজে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, পবিত্র ত্রুশ সংঘ, একই সন্ন্যাস জীবনের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে যাজক ও ভক্ত-সন্ন্যাসব্রতীরা একত্রে মিলে সেবাকাজের বিশিষ্টধারা বজায় রাখবে – এ যেন পুরাতন বৃক্ষই নতুন পল্লবের আবির্ভাব। ফাদার মরো যেমন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন পরিকল্পনাটি “বাহ্যতঃ অবিচ্ছিন্ন” হলেও, তা স্বয়ং ঈশ্বরেরই কাজ।”

পোপের দপ্তর “প্রোপাগান্ডা ফিদে” ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাকে একটি স্বতন্ত্র ডাইয়েসিস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে পৃথক করে চট্টগ্রামকে একটি নতুন ডাইয়েসিস রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন ঢাকা ডাইয়েসিসের দায়িত্ব “ঢাকা ভিকারিয়েট”-এর আওতায়, আমেরিকা থেকে আগত হলি ক্রস ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার মিশনারিদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। অন্যদিকে তৎকালীন চট্টগ্রামের সাথে আসাম ও মিয়ানমারের কিছু এলাকা নিয়ে চট্টগ্রাম ডাইয়েসিস প্রতিষ্ঠা করা হয় যার পরিচালনার দায়িত্ব “চট্টগ্রাম ভিকারিয়েট”-এর আওতায়, কানাডা থেকে আগত হলি ক্রস ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার মিশনারিদের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হয়।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র সংঘের জেনারেল চ্যাপটারে সিদ্ধান্ত মোতাবেক হলি ক্রস ফাদার ও ব্রাদারদের জন্য পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠা গঠন করা হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ববঙ্গে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ত্রুশ সংঘে চারটি “ডিস্ট্রিক্ট” এর উদ্ভাবন ঘটে: আমেরিকান ফাদার-ব্রাদাদের জন্য ঢাকা ডাইয়েসিসে পৃথক দুটি “ডিস্ট্রিক্ট” এবং কানাডিয়ান ফাদার-ব্রাদারদের জন্য চট্টগ্রাম ডাইয়েসিসে পৃথক দুটি “ডিস্ট্রিক্ট” গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই (১৯৭১ খ্রি.), হলি ক্রস সংঘের দেশী-বিদেশী সকল সদস্যের মধ্যে বাংলাদেশে স্থানীয় মণ্ডলী এবং স্থানীয় পবিত্র ত্রুশ সন্ন্যাস-সংঘ গড়ে তোলার একটি চিন্তা জাগ্রত হয়। এই প্রক্রিয়া সেই সময়ে ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে; তা পরবর্তীতে আরও পরিপক্ব, সাবলীল, সক্রিয়, উদ্যমী ও আধ্যাত্মিকতায় বলিষ্ঠতা লাভ করেছে। তবে হলি ক্রসের ভবিষ্যৎ ভাবনা সংঘের মৌলিক আদর্শ ও ভাবমূর্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, দূরদর্শী রূপরেখা সামনে রেখে, ঐক্যের সহযাত্রায় পথ চলবে এবং বাংলাদেশের পবিত্র ত্রুশ সংঘ স্থানীয় মণ্ডলীতে, দেশের জনগণের মধ্যে এবং বিশ্বজনীন হলি ক্রস সংঘের মধ্যে তাদের স্বকীয়, প্রাবক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ

অবদান রাখতে মনোযোগী হবে মণ্ডলী এই ছিল সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের পবিত্র ক্রস সংঘের ভাবনা।

এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে হলি ক্রস ফাদারদেরকে নিয়ে একটি ডিস্ট্রিক্ট করার পক্ষে অনেকেই মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন। তারা মনে করেন যে, বাংলাদেশের হলি ক্রস ফাদারদের জন্য যদি একটি ডিস্ট্রিক্ট হয় তাহলে: সমন্বিত একটি স্থানীয় ও দেশীয় রূপরেখা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে; সংঘবদ্ধ জীবন ও মিশন শেয়ার করার সুযোগ সৃষ্টি হবে; ভবিষ্যতে একটি প্রভিন্স হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে; বাংলাদেশে পবিত্র ক্রস সংঘের জীবন-আহ্বানে, গঠন-প্রশিক্ষণে, মিশনকাজে, প্রশাসনিক সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় ঐক্য সৃষ্টি হবে এবং আর্থিক ও জনবল সংক্রান্ত এবং কার্যামোগত অপচয় বর্জন করে মানবসম্পদ ও অর্থ সম্পদের সাশ্রয় হবে। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে, পবিত্র ক্রস সংঘ একটি দেশীয় ও সংস্কৃত্যায়িত রূপ ধারণ করবে।

হলি ক্রস ফাদারদেরকে নিয়ে একটি “বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট” করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ১৩ মে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৩ বছরের চিন্তাভাবনা, শ্রম-মেধা, সিদ্ধান্ত ও কাজের ফসল হিসেবে এটি ছিল যুগান্তকারী একটি ঘটনা। দুটো ডিস্ট্রিক্টকে একত্রীকরণে সময় ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট সুপিরিয়র ফাদার টিম, সিএসসি এবং চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট সুপিরিয়র ফাদার প্যাট্রিক বিশেষ ভাবে সক্রিয় অবদান রাখেন।

“বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট” হওয়ার চার বছরের মধ্যে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ২ ডিসেম্বর ভাইস-প্রভিন্স হিসেবে হলি ক্রস ফাদারগণ স্বীকৃতি লাভ করে। এই উপলক্ষে ব্রাদার ও ফাদারগণ মিলে যৌথভাবে দু’দিন ব্যাপী একটি প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সুপিরিয়র ফাদার টমাস জিম্মারম্যান এবং সুপিরিয়র ব্রাদার জন রোজারিও।

পূর্ণাঙ্গ প্রভিন্স হওয়ার জন্য সংঘের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা পাঁচটি শর্ত আরোপ করে দেওয়া হয়। শর্তগুলি ছিল: (১) যথেষ্ট সদস্য সংখ্যা থাকতে হবে; (২) আহ্বানের সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে হবে; (৩) গঠনদানে সামর্থ্য থাকতে হবে; (৪) সংঘের মধ্যে নেতৃত্বদানের সামর্থ্য থাকতে হবে; (৫) সংঘের জীবন ও মিশনের জন্য আর্থিক সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। এ সময়ে ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা ভাইস-প্রভিন্সিয়ালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ দশটি বছর পথচলার পর ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে আরোপিত শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে পবিত্র ক্রস সংঘের জেনারেল চ্যান্সার বাংলাদেশের হলি ক্রস ফাদারদের ভাইস-প্রভিন্সকে “পবিত্র যিশু-হৃদয় প্রভিন্স” হিসেবে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দান করেন। “পবিত্র যিশু-হৃদয় প্রভিন্স”-এর প্রথম প্রভিন্সিয়াল হিসেবে ফাদার স্টিফেন গমেজকে

নির্বাচিত করা হয়। ঐ সময়ে সংঘের পরিসংখ্যান ছিল: চারজন বিশপ, ৩৬জন পুরোহিত (১২ জন বিদেশী এবং ২৪ জন দেশী); সাময়িক ও আজীবন সন্ন্যাসব্রতী ছিল ১৭ জন এবং ৩ জন নবিস।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে একজন পবিত্র ত্রুশ সংঘের মিশনারি একটি মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: “পবিত্র ত্রুশ সংঘ সর্বদাই ইনক্লুসিভ (অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে তাদের পথচলা), কোনো সময় এক্সক্লুসিভ নয় (অর্থাৎ কাউকে বাদ দিয়ে পথচলা নয়)।” এ কথাটি আমাদের সন্ন্যাসজীবন, মিশনকর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এবং ধর্মপ্রদেশীয় যাজক, অন্য সন্ন্যাসসংঘ ও মণ্ডলীর সাথে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক কথা বলে। এই কথাটি আগামী কালের পথচলায় অন্তরে গেঁথে রাখতে হবে।

ইতোমধ্যে বিগত ১৭০ বছরে বাংলাদেশে পবিত্র ত্রুস সংঘের অনেক জয়ন্তী পালিত হয়েছে। সর্বশেষ আজকের জয়ন্তী উৎসব পালন করতে গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য ফাদার বাসিল মরোর কয়েকটি নির্দেশনা স্মরণ করি। উক্ত নির্দেশনাবলির আলোকে পবিত্র যিশু হৃদয় সংঘের সদস্য হিসেবে আমাদের অন্তরে আছে তিনটি অনুভূতি: কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করা, অনুতাপ ও ক্ষমা যাচনা করা এবং ভবিষ্যতের জন্য অঙ্গীকার ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করা।

- (১) বাংলাদেশে বিগত ১৭০ বছরের জীবন-সাধনা, কর্মযজ্ঞ ও মিশন-কার্যক্রম, প্রভৃতি, ধন্য বাসিল মরোর কথা অনুসারে, এ সবকিছু আমাদের কাজ নয় – এ কাজ ঈশ্বরের কাজ। তাই আপনাদের সাথে একাত্ম হয়ে ঈশ্বরের সকল কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই। এক্ষত্রে সকল ব্যর্থতার জন্য আমরা অনুতপ্ত। ভবিষ্যতের জন্য অঙ্গীকার করি যে, ঈশ্বরের কাজ বলেই আমরা যেন সবকিছুকে গণ্য করতে পারি।
- (২) ফাদার মরো বলেছেন: “একা গড়ে না কেউ, গড়ে সকলে মিলে”। এই উক্তির সফলতা যাকিছু আমাদের হয়েছে তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি। সকল ব্যর্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করি। অঙ্গীকার করি ভবিষ্যতে সবার সাথে মিলিত হয়ে একসঙ্গে পথ চলব।
- (৩) ধন্য ফাদার মরো সংঘের ব্রাদার, ফাদার ও সিস্টারদের মধ্যে দেখেছেন “পুণ্যতম পরিবারের আদর্শ”। এই আদর্শ যতটুকু সাক্ষ্যদান করতে পেরেছি, তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি। আমাদের সীমাবদ্ধতা ও অপারগতার জন্য আমরা অনুতপ্ত। “পুণ্যতম পরিবারের আদর্শ” – ব্যক্তি জীবনে, সংঘে ও মণ্ডলীতে আরও উজ্জ্বল সাক্ষ্যদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করি।

- (৪) ধন্য ফাদার মরো আমাদের বলেছেন: “ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখ, তিনি যথাসময়ে সবকিছু দেবেন”। ধন্য ফাদার মরোর সন্তান হিসেবে আমরা যতটুকু এই শিক্ষা জীবনে বাস্তব করে তুলতে পেরেছি তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি। ব্যর্থতার জন্য আমরা ক্ষমা-মার্জনা যাচনা করি। আর ভবিষ্যতে এই আধ্যাত্মিকতায় বেড়ে উঠতে প্রত্যাশা ব্যক্ত করি।
- (৫) প্রৈরিতিক কাজে “উদ্যম ও আগ্রহ” আমাদের সংঘের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আমাদের সেবাকাজের সকল আগ্রহের সাফল্য স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রেরণা থেকে আগত এবং তার অনুগ্রহের জন্য আমরা তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জনাই। যুগ লক্ষণ চিহ্নিত করে, সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আমাদের সকল অবহেলার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। উদ্যম ও আগ্রহভরে সবকিছু করতে ভবিষ্যতে আমরা প্রত্যাশা রাখি।
- (৬) ধন্য ফাদার মরো বলেছেন: “আমরা ধর্মবিশ্বাসের শিক্ষক”। তিনি আরো বলেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে আমরা “মন ও হৃদয়” এর বিকাশ সাধন করি। এই উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও পালকীয় কাজে, দীর্ঘ ইতিহাসে আমাদের বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা যা ব্যক্ত হয়ে হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষের জীবন গঠনে যে অবদান রাখতে পেরেছি তার জন্য পবিত্র আত্মার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। অবশ্যই আমরা স্বীকার করি এই আত্মিক দানে প্রতি আমাদের সকল অবহেলা ও অপরাধ। প্রতিজ্ঞা করি ভবিষ্যতে এই আত্মিক দানের সঠিক ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে আমাদের শিক্ষা ও গঠনকাজের সেবায় আরও উদ্বুদ্ধ হব।
- (৭) ধন্য ফাদার মরো আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন: “ক্রুশই আমাদের একমাত্র আশা”। এই বাণী অনুসারে আমাদের জীবনে যতখানি স্বার্থকতা এসেছে তাঁর জন্য প্রভুর প্রশংসা করি। শোকার্তা মাতা মারীয়ার আদর্শে জীবনের সকল ক্রুশ বহন করে প্রভুকে অনুসরণ করার সাধনায় যে ব্যর্থতা এসেছে তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত। “ক্রুশ বহন করে তোমরা আমার অনুসারী হও” যিশুর এই কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, গভীর প্রত্যাশা নিয়ে ক্রুশের পথে চলতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
- (৮) প্রভু যিশু আমাদেরকে ডেকে বলেছেন: “এসো, আমার অনুসরণ কর”। আজ অন্তরভরে প্রভুর প্রশংসা করি কেননা তিনি তাঁর আহ্বানে আমাদেরকে বিশ্বস্ত রেখেছেন। এ কথাও আমরা বিন্দ্রুভাবে স্বীকার করি যে কতবার আমরা তার পথ অনুসরণ করতে পারিনি, পথে হোঁচট খেয়েছি, আমাদের পদস্থলন ঘটেছে। তথাপি প্রতিবন্ধের জয়ন্তী উৎসবে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে এবং প্রভুতে ভরসা রেখে, আমরা আজ প্রতিজ্ঞা করি “প্রভু আরও ঘনিষ্ঠভাবে তোমাকে অনুসরণ করব”।

অষ্টম ভাগ : বিশেষ ব্যক্তিবর্গের স্মরণে ভক্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি

রচনা- ১: পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি :
“সত্যের সাধক”

সবকিছুর উর্ধ্বে ভালবাসা:

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিন, অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর, ৯৫ বছর বয়সে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মুখে উচ্চারিত শেষ কথাটি ছিল: “যিশু, আমি তোমাকে ভালবাসি”। তাঁর শেষ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কথার মধ্যে আমরা সেই উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই যখন তিনি পোপ পদে অভিষিক্ত হওয়ার সময়ে, যিশুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন: “যিশু, আমি তোমাকে ভালবাসি”। পোপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরে প্রকাশিত তার প্রথম বিশ্বজনীন পত্রটি (২০০৫) যার শিরোনাম ছিল: “দেউস কারিতাস এস্ত”, অর্থাৎ “ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ” এবং যার বিষয়বস্তু ছিল “খ্রিস্টীয় ভালবাসা” - সেই পত্রের প্রতিও ইঙ্গিত বহন করে।

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট তাঁর পোপের দায়িত্ব শুরু করেছিলেন “খ্রিস্টীয় ভালবাসা” বিষয়ক তাঁর প্রথম বিশ্বজনীনপত্র প্রকাশ দ্বারা। এই বিশ্বজনীনপত্রটি তুলনামূলকভাবে আকারে খুবই ক্ষুদ্র, মাত্র ৭১ পৃষ্ঠা সম্বলিত। কিন্তু এই পত্রটিই ছিল আধুনিক যুগের মানুষের সকল প্রশ্ন ও সমস্যার একমাত্র মৌলিক উত্তর; পত্রটি ছিল পোপ হিসেবে তাঁর শাসনকালের নীল-নক্সা এবং তাঁর আপন জীবনের প্রধান সাধনা।

তিনি বলেছেন ভালবাসা বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করলেও তার পূর্ণতা এক -- আগাপে। জগতসৃষ্টির মধ্যে এবং পরিত্রাণ ইতিহাসের মধ্যে একই ভালবাসা অবস্থান করে যা সবকিছুকে এক করে রাখে। মন্ডলীও সেই একই ভালবাসার সাধনা করে এবং ভালবাসাপূর্ণ সেবা ও দয়ার কাজে মন্ডলী নিয়োজিত থাকে। তিনি আরও বলেন যে, মন্ডলীর শিক্ষা অনুসারে সমন্বিত মানবোন্নয়ন ভালবাসারই প্রকাশ। সবকিছুর উর্ধ্বে ভালবাসা।

যাজক, অধ্যাপক ও দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা:

জার্মান দেশের বাভারিয়া অঞ্চলে যোসেফ রাতিসঙ্গার এপ্রিল ১৬, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব ও স্কুল জীবনে, বিশ্ব বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ “মোজার্ট” পরিবেশে তিনি খ্রিস্টীয়, মানবিক ও সাংস্কৃতিক গঠন পেয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি দেখেছেন নাৎসী শাসন-ব্যবস্থার নির্যাতন এবং উপলব্ধি করেছেন নিজস্ব জীবনে সেই নির্যাতনের অভিজ্ঞতা।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুন, যোসেফ রাতিসঙ্গার যাজকপদে অভিষিক্ত হন (৭১ বছর ধরে তিনি যাজক ছিলেন)। যাজক হিসেবে আর্চডাইয়োসিস কলোনের আর্চবিশপ কার্ডিনাল যোসেফ ফ্রিংস-এর উপদেষ্টা হিসেবে, তিনি দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার (১৯৬২-১৯৬৫) সকল অধিবেশনে যোগদান করেন। তাই তাকে বলা হয় “দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা”-র একজন অন্যতম বিশেষজ্ঞ।

ফাদার যোসেফ রাতিসঙ্গার “ঐশতত্ত্ব সাধনাকেই তাঁর জীবনের আহ্বান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁর প্রথম ডক্টোরাল থিসিসের শিরোনাম ছিল: “মন্ডলীর ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধু আগষ্টিনের ধারণা অনুসারে ঈশ্বর-জনগণ ও ঈশ্বর-গৃহ”।

১৯৫৯ থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মনীতি শাস্ত্র বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। কেউ মনে করেন যে, সাধু আগষ্টিনের ভাবধারা অনুসারে যেহেতু তিনি প্রভাবান্বিত ছিলেন, সেহেতু ব্যক্তিগত ঐশতাত্ত্বিক চিন্তাধারা এবং মন্ডলী বিশ্বজনীন শিক্ষাদানের কর্তব্য -- এ দুয়ের মধ্যে তিনি একটা টানাপোড়েন উপলব্ধি করেছেন। এরই কারণে লাতিন আমেরিকার লিবারেশন থিওলজি ও এশিয়ার সংলাপ-সংক্রান্ত ঐশতত্ত্ব-এর প্রতি সমর্থনযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ঐশতত্ত্ব সাধন করার আহ্বান:

যখন তিনি ২৮ মে, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে মিউনিক ও ফ্রিজিং এর আর্চবিশপ হিসেবে নিযুক্ত হন তখন তিনি যে বিশপীয় মটোটি গ্রহণ করেছিলেন তা হল: সত্য-সাধনে সহযোগী” (৩য় যোহন: ১:৮)। তাই তিনি আজীবন ধর্মবিশ্বাস ও যুক্তি দ্বারা সত্যের সন্ধানে ব্রতী ছিলেন; সত্য সাধনে অপরের সাথে তিনি একনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

পোপ বেনেডিক্ট মন্ডলীর ধর্মতত্ত্ব-র সুদৃঢ় সংরক্ষক ছিলেন। তাঁর ঐশতাত্ত্বিক জ্ঞান ছিল স্বচ্ছ, সাবলীল ও গভীর। এই সবকিছুর স্বীকৃতি মণ্ডলী সর্বদাই দিয়েছে এবং তিনি যে একজন ঐশতাত্ত্বিক সুস্পষ্ট বক্তা ছিলেন তারও স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন।

“কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা”:

“কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা” রচনা ও সম্পাদনা কমিশনের প্রধান ছিলেন কার্ডিনাল যোসেফ রাতিসঙ্গার। এটা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান অর্জন ও অবদান। বাংলায় “কাথলিক মন্ডলীর ধর্মশিক্ষা” সম্পাদনা করতে গিয়ে পোপ বেনেডিক্টের অগাধ জ্ঞান ও বিশদ পরিব্যাপ্তি, উপস্থাপনায় প্রাঞ্জলতা ও সুবিন্যস্ততা আমাকে অনেক স্পর্শ করেছে। কার্ডিনাল রাতিসঙ্গার দ্বারা রচিত ও সম্পাদিত “কাথলিক মন্ডলীর ধর্মশিক্ষা” গ্রন্থটি মন্ডলীর সামগ্রিক শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, এবং তার শিক্ষার সত্যতা, গভীরতা ও প্রসারতার কিছু পরিচয় লাভ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। পোপ ফ্রান্সিস মৃত্যুর পরেই সঠিক আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন: “পোপ বেনেডিক্ট ছিলেন একজন মহান ধর্মশিক্ষাগুরু”।

আর্চবিশপ যোসেফ রাতিসঙ্গার পোপ ষষ্ঠ পল কর্তৃক কার্ডিনাল হিসেবে নিযুক্ত হন ২৭শে জুন, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। কার্ডিনাল হিসেবে তিনি “ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক পুণ্য-মন্ত্রণালয়ে”র প্রধান ছিলেন। আবার পোপ দ্বিতীয় জন পলের সময়ে ভাটিকানের বিভিন্ন পুণ্য-মন্ত্রণালয়ের সাথেও সদস্য হিসেবে জড়িত ছিলেন। ক্যাথলিক রোমান প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় আরও অনেক দায়িত্ব পেয়েছিলেন এবং তা তিনি দক্ষতার সাথে পালন করেছেন।

কার্ডিনাল যোসেফ রাতিসঙ্গারের সকল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য, পালকীয় অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিকতা, জীবনের সাধনা ও দূরদর্শী চিন্তাধারা, মন্ডলীর ঐশ্বরাত্মিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা, ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে ১৯ এপ্রিল, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ২৬৫ তম পোপ হিসেবে নির্বাচিত হন এবং তিনি ষোড়শ বেনেডিক্ট নাম গ্রহণ করেন।

ঐশ্বরিক গুণ: বিশ্বাস, ভালবাসা ও প্রত্যাশা:

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের রচনাবলি ও আধ্যাত্মিকতায় তিনটি ঐশ্বরিক গুণ, অর্থাৎ বিশ্বাস, আশা ও প্রেম, ঐশ্বাণীর আলোকে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় ভালবাসা নিয়ে তার আলোচনা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি ধর্মবিশ্বাস (লুমেন ফিদেই) নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশ্বাসের বর্ষ ঘোষণা করেছিলেন (২০১২ খ্রি.)। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস প্রকাশ পায় প্রার্থনা, যাতনাভোগ এবং শিক্ষা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। আবার তিনি উপলব্ধি করেছেন বিশ্বাসই হচ্ছে আশার ভিত্তিমূল। বিশ্বাস মানুষকে আশান্বিত করেন। বিশ্বাস-ভিত্তিক আশা নিয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন তার রচনাবলিতে (যেমন, *এসপে সালভি* শীর্ষক বিশ্বজনীনপত্র)।

বাংলাদেশ মন্ডলীতে পোপ বেনেডিক্টের অবদান:

আজ বাংলাদেশ মন্ডলী কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে কয়েকটি ঘটনা যা বাংলাদেশ মন্ডলীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে:

বিশপদের নিয়োগ:

স্থানীয় মন্ডলীতে পোপ বেনেডিক্ট যে-সকল বিশপদের নিয়োগ দিয়েছেন তারা হলেন: ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে বিশপ পলিনুস কস্তার নিয়োগ (৯ জুলাই, ২০০৫); রাজশাহীর বিশপ হিসেবে বিশপ জের্ভাস রোজারিওকে নিয়োগ (১লা জানুয়ারী, ২০০৭); চট্টগ্রামের সহকারী বিশপরূপে বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি-এর নিয়োগ (৭ই মে ২০০৯); ঢাকার কোএডজুটর, পরবর্তীতে আর্চবিশপ হিসেবে বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি-র নিয়োগ: (২৫/১১/২০১০); চট্টগ্রামের বিশপ হিসেবে বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি-কে নিয়োগ (এপ্রিল ৬, ২০১১); সিলেট ডাইয়েসিস প্রতিষ্ঠা ও বিশপ বিজয় এন. ক্রুজ, ওএমআই-র নিয়োগ (৮ জুলাই, ২০১১); দিনাজপুরের বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু-র নিয়োগ (৩০ ডিসেম্বর ২০১১); খুলনার বিশপ জেমস রমেন বৈরাগি-র নিয়োগ (৪ই মে, ২০১২)।

আদলমিনা প্রোগ্রামের সময় পোপ বেনেডিক্টের সঙ্গে বাংলাদেশ বিশপদের সাক্ষাৎ (জুন ২০০৭):

আদলিমিনা ভিজিটের পূর্বে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট বাংলাদেশের সকল ডাইয়োসিসের প্রতিবেদন সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; বিশপদের সাথে সাক্ষাতকালে তিনি তাদের কথা শুনে। পরবর্তীতে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বাংলাদেশের বিশপদের কাছে বললেন: “বাংলাদেশ মন্ডলী সত্যিই কাথলিক” অর্থাৎ বাংলাদেশ মন্ডলী দেশের সকল ধর্মের মানুষ, সকল খ্রিস্টান সম্প্রদায়, সকল জাতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মানুষ এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রায় সকল ক্ষেত্রে মন্ডলী উপস্থিত থেকে নানাবিধ সেবাকর্মে সম্পৃক্ত ও সক্রিয় আছে। তাই তিনি মন্তব্য করেন “ বাংলাদেশ মণ্ডলী কাথলিক”।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে পোপ বেনেডিক্টের সহায়তা:

প্রাকৃতিক দুর্যোগে পোপ বেনেডিক্ট সর্বদাই বাংলাদেশের মানুষের সাথে একাত্ম ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল অঞ্চলে সিডর নামক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়। রোমে থাকাকালীন অবস্থায়, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল হিসেবে আমি একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার নিকট সাক্ষাৎকার দান করি। বিস্মিত হয়েছি যে, পোপ মহোদয় সেই সাক্ষাৎকার শুনে তাত্ক্ষণিকভাবে ইতালির বিশপ সম্মিলনীর নিকট অনুরোধ করেন যেন চট্টগ্রামের বিশপের সাথে যোগাযোগ করে সিডরে আক্রান্ত লোকদের জন্য যেন কিছু করা হয়। ইতালির বিশপ কনফারেন্সের দেওয়া প্রায় তিন কোটি টাকার অনুদানে বরিশাল বিভাগের দক্ষিণ অঞ্চলে, বিশেষভাবে রাখাইন সম্প্রদায়ের মাঝে, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ ৭ টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করে দেয়।

পোপের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ (১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৩) ও মৃত্যুবরণ (৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২)

অন্য কোনো বিষয় না হলেও পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট একটি বিষয়ে মন্ডলীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আর তা হল মন্ডলীর ইতিহাসের বিগত ৬০০ বছর পর প্রথমবার, তিনি স্বেচ্ছায়, ৮৬ বছর বয়সে, স্বাস্থ্যগত কারণে ও ভবিষ্যতে মন্ডলীর সুপরিচালনার জন্য পোপের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্তটি ছিল বৈপ্লবিক; তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে অবধারণ করে বিশ্বাস, আনুগত্য ও নম্রতার সাথে উক্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন।

অবসর জীবনে তিনি আশ্রমিক জীবন বেছে নিলেন। বিগত ৯ টি বছর ধ্যান-প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক সাধনা ও লেখালেখির মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছেন। এক সময় তিনি ধ্যানময় কর্মজীবন যাপন করেছেন, পরবর্তীতে বয়সের পরিপক্বতায় ধ্যানী জীবন বেছে নিলেন। বিস্ময়কর তাঁর অবসর জীবন, বিস্ময়কর ভাবেই তিনি সেই জীবন যাপন করে অনন্তকালের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন -- এ কথা বলতে বলতে: “যিশু, আমি তোমাকে ভালবাসি।”

গত ৫ই জানুয়ারী, অবসর প্রাপ্ত একজন পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হল পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক যিনি ইতোমধ্যেই পোপ। আরেকটি অভিনব ঐতিহাসিক মাইলফলক। যুগ যুগ ধরে এ ঘটনাটিও ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আজ এই খ্রিস্টযুগে আমাদের প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রশংসা করা ও তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া, কেননা তিনি প্রয়াত পোপ বেনেডিক্টকে বিশ্বে ও মন্ডলীতে সেবা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাছে আমাদের আরও মিনতি যেন পোপ বেনেডিক্টের সত্য বিষয়ে শিক্ষা ও সাধনা, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন এবং তাঁর জীবনের পবিত্রতা, আমাদের একসঙ্গে চলার পথে প্রেরণা ও সম্বল হয়ে থাকে। আমেন।

तुलना- २: REFLECTIONS ON POPE FRANCIS

I have been constantly looking at Pope Francis. Amazing to see his life-style, ideas, values, words, reflections and his actions.

Looking at him, the following points I have noted down for myself, which is a constant reminder for my life and ministry, as well as continuous mirror to see myself, reflecting my positive and negative image of myself. As an elder Bishop I share these points out of fraternal charity.

As pastors, we are the first followers of Jesus, our Good Shepherd, having a mind and heart of Jesus, following his Gospel and Values of the Kingdom of God, that he has come to minister.

Sincere and constant recognition of our weaknesses and sinfulness is the first step to holiness, surrendering at the love and mercy of Jesus, experiencing the joy of the Gospel and the joy of forgiveness received from Jesus. Humility in all matters brings us closer to Jesus our pastor.

As pastors in our three spiritual, preaching and governing functions, we keep always focused on the vision of the Church which has been provided by the Second Vatican council: Church as Communion, Church as Mystery and Church as Mission. This vision be present in all our thinking, planning, decision-making, evaluating, directing, etc.

The synodal Church is the process of implementation of the vision of the Church emphasizing communion, participation and missionary discipleship.

- a) **Communion:** divine and spiritual, fraternal and environmental; communion among the three vocations -- Lay Faithful, People of Consecrated Life, Priests and Bishops; We Bishops are signs and witnesses of the communion.
- b) **Participation:** of everyone, man and woman, because of baptismal vocation of all and ministerial participation because of the Holy Order. Both these gifts of the Holy Spirit are given in the Church.

- c) **Mission:** Mission of communion, mission of participation, mission of witnessing Gospel values after the example of Jesus. Our mission is the threefold mission of Jesus: of sanctifying, of teaching Gospel, which is the Truth, and governing in order to bring the Kingdom of God.

Listening to the Holy Spirit is the fundamental element of a Synodal Church. What does the Holy Spirit say to me, to others and to the Church in this particular time, situation, context, questions or matters? For this we need prayerful listening, discernment and dialogue with God personally and with others individually and in community.

Recently one Religious Sister, a Secretary of the Dicastery of Bishops, said in front of the Holy Father, there is a no ideal bishop. But he has to be shepherd who is “close to the people entrusted to him, he has to know how to involve Priests, Laity and Religious, and people of different generations.”

Pope Francis is a Reformer of the Catholic Church basing everything on Jesus and his Gospel and motivated by the Second Vatican Council with constant discovery of its novelty. His recent publication of the Apostolic Constitution, *Predicare Evangelium, Preaching of the Gospel*, is an excellent document enfleshing or incarnating the Gospel of Jesus and the Second Vatican Council as far as the vision of the Church in general and the administration of the Church in particular is concerned.

Predicare Evangelium is a hand book of the Church for guiding Roman Curia which is at the service of the Holy See and at the same time for the mission of the particular Churches. It is in the same way, all our diocesan and episcopal bodies are at the service of the Bishop and for the Service of the Church.

Pope Francis has called a meeting of the Cardinals at the end of August this year to study the Apostolic Constitutions. I am sure after the meeting everyone will be much more enlightened. But for the time being the points that draw my attention most, are the following:

Participation of Women in Decision-making responsibility: Examples: Pope Francis's clear direction and actual implementation by appointing three Women Religious in the Dicastery for Bishops; 31% of Roman Curia are now women. In the Dicastery for the laity and family, out of 37 workers 34 are lay Faithful.

The questions that I always have: how to make the laity, particularly women, imbued with Christian motivation, professionalism and competence for the important functions entrusted to them already or will be given in future?

At the background of the Synodal Church, the challenges that Cardinal Grech, the Prefect of the Dicastery for Bishops wrote in the Letter to the Priests on the occasion of Holy Thursday this year, remains always valid for us: clericalism, intellectualism and formalism of the priests.

A long-term studies and an on-going questions will be there as to the contextualization of the *Preadicate Evangelium*, mainly focusing on the vision and process of implementation.

In conclusion, the scenes that come to my mind are the images of the recent visit of Pope Francis in Canada, the attitude and spirituality that he witnessed, healing and reconciliation of the past wounds that he attempted, saying sorry and asking forgiveness so many times, words of encouragement in the midst of weight of evil history and present remorse. This visit somehow summed up and witnessed for whatever he stands for as a follower of Christ. Let me quote one passage of Pope's prayer offered being alone, at the bank of the Lake of St. Anne (the picture of the event speaks much more):

"All of us need the healing that comes from Jesus, the physician of souls and bodies. Lord, as the people on the shores of the Sea of Galilee were not afraid to cry out to you with their needs, so we come to you this evening, with whatever pain we bear within us, we bring to you our weariness and our struggles, the wounds of the violence suffered by our Indigenous brothers and sisters."

In this blessed place, where harmony and peace reign, we present to you the disharmony of our experiences, the terrible effects of colonization, the indelible pain of so many families, grandparents, and children, help us to be healed of our wounds.”

At the end of the Pope’s visit in Canada I twitted a message saying something like this: “In his Canada Visit, Pope Francis sums up the messages of: *Evangelii Gaudium*, *Laudato Si*, *Gaudete et Exsultate*, *Misericordia et Misera* and *Fratelli Tutti*”.

ব্রত্যা- ৩: পোপ চতুর্দশ লিও: কী তাঁর পরিচয়? কোন্ পথে তিনি চলবেন?

(১) পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু

বর্তমান ধর্মোপসনায় প্রভু যিশুর পুনরুত্থানকাল পালিত হচ্ছে। পুনরুত্থান রবিবারে, ২০ এপ্রিল, ২০২৫-এর মহাপ্রিস্টিয়াগের শেষে সাধু পিতরের চক্রে পোপ ফ্রান্সিস প্রবেশ করলেন উইল চেয়ারে। দীর্ঘসময় ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন, দাঁড়াতে ও কথা বলার শক্তি তেমন নেই। তথাপি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললেন: “বোওনা পাস্কা” – “শুভ পুনরুত্থান”। তারপরে পুনরুত্থান উপলক্ষে তাঁর বক্তব্য অন্য একজন পাঠ করলেন। সমাপ্তিতে তিনি সকলকে পুনরুত্থানের আশীর্বাদ দিলেন। জনসমক্ষে এই তাঁর শেষ কথা ও আশীর্বাদ। পরেরদিন সকালবেলা হলো তাঁর তিরোধান এই জগত থেকে। কাঁদালো কত মানুষকে। শূণ্য হল পোপের আসন।

পোপ মহোদয়ের মৃত্যুর পর ভাটিকানে ৯ দিনের শোকসভা চলেছে। কার্ডিনাল সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁরা ৯ টি সভায় আলোচনা করেছে: পোপ ফ্রান্সিস এক যুগের কার্যকালে মন্ডলীতে কী সম্পদ রেখে গেলেন? মন্ডলী ও জগতের সাম্প্রতিক অবস্থা ও চ্যালেঞ্জগুলো কী?, কোন ধরনের পোপ প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতের নানা প্রত্যাশা পর্যালোচনা করা হল। এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হল এবং সমাধিস্ত করা হল মেরী মেজর বাসিলিকায় অতি সাধারণভাবে।

(২) পোপ চতুর্দশ লিও-র নির্বাচন:

ঐ সময়ে সবার মধ্যে একটি প্রশ্ন পরবর্তী পোপ কে হবে? সোসাল মিডিয়াতে অনেকের নাম আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে কিন্তু প্রধান দৃষ্টি ছিল কনক্রেভের দিকে। কনক্রেভ শুরু হল ৭ মে, সিসটাইন চ্যাপেলে, যেখানে বিশ্বের ৭০ টি দেশ থেকে আসা ১৩৩ জন ভোটাধিকারী কার্ডিনালগণ সমবেত হলেন, একজন প্রচারক কার্ডিনালের ধর্মোপদেশ শুনলেন, শপথ গ্রহণ করলেন এবং আধ্যাত্মিক ধ্যান-প্রার্থনার মাধ্যমে ভোট দিতে শুরু করলেন। এই নির্বাচনে কোন প্রার্থীতা নেই, প্রচারণা নেই, এমন কি কোনো আলাপ আলোচনাও নেই। অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে, ৮ মে, কনক্রেভের দ্বিতীয় দিনে, মাত্র চতুর্থ ব্যালটের মাধ্যমে কার্ডিনালগণ দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দিয়ে একজনকে নির্বাচন করলেন। তিনি হচ্ছেন কার্ডিনাল রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট, ওএসএ যিনি হচ্ছেন ২৬৭তম পোপ এবং তিনি পোপ চতুর্দশ লিও নাম গ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৬৯ বছর। তাঁরই কিছু পরিচয় এবং পোপ হিসেবে তাঁর প্রাথমিক চিন্তাভাবনা তুলে ধরছি।

(৩) পোপ লিও: অতীতের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সম্পদ

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর শিকাগোতে তার জন্ম হয়। শিশু ও কিশোর কালে তিনি শিকাগোতে পড়াশুনা করেছেন। কাথলিক একটি সুন্দর পরিবারে খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে বড়ো হয়েছেন। পরবর্তীতে পেনসিলাভানিয়ার ভিল্লানোভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত ও দর্শনশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আগস্টিনিয়ান মহা ধর্মসংঘে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সন্ন্যাসব্রত এবং ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। শিকাগোর কাথলিক থিওলজিকাল ইউনিয়ন থেকে ঐশতত্ত্ব পড়াশুনা শেষ করে ২৭ বছর বয়সে তিনি রোমে যান এবং ধর্মসংঘের মাদার হাউজে অবস্থান করেন, যেখানে তিনি ১৯৮২ খ্রি. ১৯ জুন আগস্টিনিয়ান যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। রোমের অ্যাঞ্জেলিকুম থেকে মাণ্ডলিক আইন বিষয়ে প্রথমে লাইসেন্সসিয়েট পরে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

যাজক হিসেবে রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট ধর্মসংঘে গঠন পরিচালক, মিশন পরিচালক, অধ্যাপক এবং সবশেষে আগস্টিনিয়ান মহাধর্মসংঘের প্রায়র বা সুপিরিয়র জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২০০১-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস তাকে লাতিন আমেরিকার পেরু দেশের চিক্লাকোর ডাইয়োসিসের বিশপপদে নিয়োগ করেন। তিনি পেরু দেশের নাগরিকত্বও লাভ করেন। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ হয়ে “বিশপগণ বিষয়ক” পোপের মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে পোপ ফ্রান্সিস তাকে দায়িত্ব প্রদান করেন। এই মন্ত্রণালয়ে কাজ করে তিনি বিশ্ব-কাথলিক মন্ডলীর বহু ডাইয়োসিস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন করেছেন কেননা তাঁর মন্ত্রণালয় বিশপ প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই করে পোপ মহোদয়ের হাতে ন্যস্ত করতেন যেন তিনি নিয়োগ দিতে পারেন। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস তাকে কার্ডিনাল হিসেবে মনোনয়ন দান করেন। আর ৮ মে তিনি ১৩৩ জন কার্ডিনালদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়ে তিনি ২৬৭তম পোপের আসন পূরণ করলেন।

পোপ চতুর্দশ লিও সাতটি ভাষায় কথা বলতে পারেন: ইংরেজী, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, ফরাসী, জার্মান, ল্যাটিন ও গ্রীক।

(৪) নির্বাচন-সংবাদ ঘোষণা

৮ মে রাতে সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে প্রায় দেড় লক্ষ জনগণ। সোসাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ তাকিয়ে আছে। তিনবারের কালো ধোয়ার পরে সন্ধ্যাবেলা সাদা ধোয়া সিসস্টাইন চ্যাপেলের উপরের চিমনী দিয়ে বেগের সাথে বের হতে লাগল। উচ্ছসিত, উদ্বেলিত জনগণের কিস্তি এখনও প্রশ্ন নতুন পোপ কে? একঘণ্টার মধ্যে সেন্ট পিটার্স চার্চের সম্মুখ জানালা খুলে গেল। উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হল একজন কার্ডিনালের মুখ

থেকে: আমি আনন্দ সংবাদ জানাচ্ছি: “হাবেমুস পাপাম”, “আমরা একজন পোপ পেয়েছি”। “তিনি হলেন কার্ডিনাল রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট, ওএসএ। তিনি তাঁর নাম নিয়েছেন: পোপ চতুর্দশ লিও।”

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বহুদিন ধরে সম্ভাব্য কার্ডিনালদের নাম, তাদের পরিচয় ও গুণাবলি, তাদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি চলে আসছে। আমার জানা মতে নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে একবার সম্ভাব্য-পোপ হিসেবে কার্ডিনাল প্রেভোস্ট সম্মুখে তথ্য দেয়া হয়েছিল। পোপ লিও’র নির্বাচন যে পবিত্র আত্মারই কাজ তা প্রমাণিত হয়েছে। পবিত্র আত্মা সাহায্য করেন ঈশ্বর কাকে স্থির করে রেখেছেন তাকে নির্বাচকদের কাছে প্রকাশ করা। এটাই ছিল কার্ডিনালদের একমাত্র প্রার্থনা। পবিত্র আত্মা ৭০ টি দেশ থেকে আগত কার্ডিনালদের কাছে প্রকাশ করেছেন, আত্মা তাদেরকে একত্রিত করেছে একজন ব্যক্তিকে বেছে নিতে। এত অল্প সময়ের মধ্যে, দ্রুত গতিতে, কোন প্রার্থীতা ছাড়া, প্রচারণা ছাড়া। প্রার্থনা ও নিরবতার মধ্যে পবিত্র আত্মার সহায়তায় ঈশ্বর যাকে নিযুক্ত করেছেন, অন্ততঃপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ কার্ডিনালগণ, মনোনীতজনকে নির্বাচনের মাধ্যমে বেছে নিলেন। নতুন পোপকে জনগণ যেভাবে গ্রহণ করেছে তাও পবিত্র আত্মার কাজ কেননা তিনি ঐক্য স্থাপন করেন, বিচ্ছিন্নতা নয়। আধুনিক রাজনৈতিক নির্বাচনের মধ্যে ধন্য মন্ডলী, ধন্য তার সাক্ষ্যদান। ঈশ্বরের প্রশংসা হোক।

(৫) প্রথম সাক্ষাৎকারে বাণী: শান্তি – মিলনের সেতুবন্ধন – সিনড-বিশিষ্ট মন্ডলী

সাধু পিতরের গির্জার বেলকনী থেকে তিনি যে প্রথম বার্তা রেখেছেন তা সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁরই কথাগুলো নিজের মতো লিখছি।

পুনরুত্থানের পরে যিশু তার শিষ্যদের সম্বোধন করেছিলেন শান্তি সম্ভাষণ জানিয়ে। পোপ লিও বললেন: “তোমাদের শান্তি হোক”। পুনরুত্থিত প্রভু যিশু যিনি উত্তম মেসপালক, তার সাথে একাত্ম হয়ে সকলের উদ্দেশ্যে, তারা পরিবারে বা যেখানেই থাকুক না কেন, বিশ্বের জনগণের নিকট জানালেন: “তোমাদের শান্তি হোক” “। শান্তি হচ্ছে পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর প্রথম দান। ঈশ্বর থেকে আসছে এ শান্তি। অপরিসীম তাঁর ভালবাসা, তিনি সবাইকে ভালবাসেন, যে অবস্থায়ই তারা থাকুক না কেন। আমাদের কানের কাছে ছিল দুর্বল অথচ বলিষ্ঠ পোপ ফ্রান্সিসের কণ্ঠস্বর যিনি পুনরুত্থান রবিবার সকালবেলা আমাদের আশীর্বাদ করেছেন।

ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন; কোন অপশক্তি আমাদের পরাভূত করতে পারবে না। ঈশ্বরের হাতে আমরা আছি; কোন সংশয় নেই আমাদের; সম্মিলিতভাবে, ঈশ্বরের এবং পরস্পরের হাতে হাত মিলিয়ে আমরা সামনের দিকে একসঙ্গে চলব।

আমরা যিশুর শিষ্য, তিনি আমাদের সামনে সামনে চলেন। তাঁর আলো যে জগতের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তাকে মানবজাতির প্রয়োজন আছে ঈশ্বরের এবং তাঁর ভালবাসার সাথে যোগসেতু নির্মাণ করার জন্য। পোপ ফ্রান্সিস, সংলাপ ও সাক্ষাতের জন্য তুমি সেতুবন্ধন নির্মাণ করতে সাহায্য কর যাতে আমরা শান্তিকামী জনগণ হয়ে উঠতে পারি। তোমায় ধন্যবাদ পোপ ফ্রান্সিস।

আমার ভ্রাতৃ-প্রতীম কার্ডিনালগণ, আপনারা আমাকে নির্বাচন করেছেন: পিতরের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য, আপনাদের সাথে এক মন্ডলী হিসেবে শান্তি ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য, পুরুষ ও নারী হিসেবে একসঙ্গে কাজ করার জন্য, যিশুখ্রিস্টে ভরসা নিয়ে তাকে প্রচার এবং মিশনারী হওয়ার জন্য এবং মঙ্গলসমাপ্তি করে বিশ্বস্ত থাকার জন্য আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

আমি সাধু আগস্টিনের অনুসারী। তিনি বলেছেন: “তোমাদের সাথে আমি খ্রিস্টান, তোমাদের জন্য আমি বিশপ।” সুতরাং ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দেশ প্রস্তুত করে রেখেছেন সেই উদ্দেশ্যে আমরা কি একসঙ্গে যাত্রা করতে পারি না?।

রোমের মন্ডলীর কাছে পোপ বলেন: আমাদের সবাইকে আলোচনা করতে হবে কি করে আমরা মিশনারী মন্ডলী হয়ে উঠতে পারি, যোগসেতু নির্মাণ করতে পারি, সংলাপ করতে পারি এবং কিভাবে আমরা আমাদের হাত প্রসারিত করে সবাইকে গ্রহণ করতে পারি, যেমনটি হচ্ছে এই চত্তরে, সবার প্রতি উন্মুক্ত, তাদের প্রতি উন্মুক্ত যাদের জন্য আমাদের দয়া, আমাদের উপস্থিতি, সম্পর্ক ও ভালবাসা প্রয়োজন।

স্প্যানিশ ভাষায় তিনি বললেন: যারা পেরুর চিকলাইও ডাইয়োসিস থেকে আছেন তাদের সম্বোধন করে বলছি; তোমরা অনুগত ও বিশ্বস্ত জনগণ, তোমরা বিশপের সঙ্গী হয়ে পথ চলেছো এবং বিশপকে সহায়তা করে থাকো।

রোম নগরী, ইতালি এবং বিশ্বের সকল ভাইবোনদের নিকট বলছি: শান্তি, ভালবাসা, সান্নিধ্য, বিশেষ করে যারা কষ্টভোগ করছে, তাদের সাথে একসঙ্গে পথ চলে ও তার সন্ধান, আমরা সিনড-বিশিষ্ট মন্ডলী হতে চাই।

পম্পে নামক নগরীর রাণী কুমারী মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করার সময় এখন, কারণ তিনি আমাদের সহযাত্রী, তিনি আমাদের অতি কাছের, তার ভালবাসা দিয়ে এবং আমাদের জন্য অনুনয় করে তিনি আমাদেরকে সর্বদা সাহায্য করতে চান। সুতরাং এসো আমাদের এই মিশনের উদ্দেশ্যে গোটা মন্ডলী এবং বিশ্বের শান্তির জন্য প্রার্থনা করে বলি: প্রণাম মারীয়া, প্রসাদপূর্ণা..... আমেন।

(৬) কার্ডিনালদের নিকট পোপ লিও'র বাণী : কৃতজ্ঞতা – কার্যকালের রূপরেখা ও নির্দেশিত পথ

মে মাসের ১০ তারিখ তিনি কলেজ অব কার্ডিনালদের সাথে পোপ চতুর্দশ লিও, নির্বাচনের পর প্রথমবার একটি অধিবেশনে মিলিত হন। অধিবেশনে দুটো ভাগ ছিল: পোপ মহোদয়ের বক্তব্য এবং দ্বিতীয় ভাগে কার্ডিনালদের সাথে মুক্ত আলোচনা। পোপ মহোদয়ের বক্তব্য থেকে সংশ্লিষ্ট কিছু কথা এখানে তুলে ধরা হল মাত্র।

আপনাদের সাথে এই অধিবেশনের জন্য ধন্যবাদ জানাই। যেদিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে সেগুলো খুবই বেদনায়ক ছিল; কারণ আমরা পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসকে হারিয়েছি। একই সময়ে যিশুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে দিনগুলো খুবই ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ এবং পবিত্র আত্মার সান্ত্বনাদায়ক ছিল (যোহন ১৪:২৫-২৭)।

কার্ডিনাল ভাইয়েরা আপনারাই আমার ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী। এই সত্যটা আমাদের অনেক স্বস্তি দিয়েছে কেননা এই বোঝা গ্রহণ করার আমার একার ক্ষমতা নেই। আপনাদের উপস্থিতি আমাকে প্রভু যিশুকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাঁর মতো আপনারাও আমাকে একা রেখে চলে যাবেন না। আপনাদের সান্নিধ্যে আমি অনুভব করি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও তাঁর তত্ত্বাবধায়ন এবং বিশ্বজুড়ে আরও অনেক ভাইবোন আছে যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করছে, মন্ডলীকে ভালবাসছে এবং খ্রিস্টের এই ভিকারের জন্য প্রার্থনা ও শুভকর্মে লিপ্ত আছেন।

বিশেষ দায়িত্বভার প্রাপ্ত কার্ডিনালদের ধন্যবাদ জানানোর শেষে পোপ লিও বললেন:

আমাদের এই সময়টি একদিকে বিষাদপূর্ণ আবার অন্যদিকে আনন্দময়। এটা সম্ভবতঃ হয়েছে এই কারণে যে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু এবং কনক্রেভ একটি পুনরুত্থানের ঘটনা, পুনরুত্থানের আলো দ্বারা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সিক্ত ঘটনা। এই পেক্ষাপটে আমরা পোপ মহোদয়ের আত্মা এবং মন্ডলীর ভবিষ্যৎ “পরম করুণাময় ও সান্ত্বনাদাতা ঈশ্বর”-এর ন্যস্ত করি।

সাধু পিতার থেকে শুরু করে আমার নিজের পর্যন্ত, পোপগণ ছিলেন ঈশ্বরের এবং ভাইবোন মানুষের বিনম্র দাস। এর চাইতে বেশী কিছু নয়। আমাদের পূর্বসূরী কত পোপের জীবনে আমরা দেখিছি আর সর্বশেষে দেখেছি পোপ ফ্রান্সিসের মধ্যে, সেবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত, সহজ ও সাধারণ জীবন, তাঁর পুরো কার্যকালে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আত্মসমর্পণ এবং তাঁর শান্ত বিশ্বাসে পিতার গৃহের দিকে যাত্রা। আসুন আমরা এই মূল্যবান সম্পদকে ধরে রাখি এবং বিশ্বাসজাত একই প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের যাত্রা চলমান রাখি।

পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শোনার প্রতি আমরা অনুগত থাকি এবং পরিত্রাণ পরিকল্পনা সেবাকাজে বিশ্বস্ত হই। পবিত্র আত্মা নিরবে “মৃদুমন্দ বাতাসের শব্দে” কথা বলেন। এই সাক্ষাতের জন্য আমাদের হাতে ন্যস্ত ঈশ্বরের সকল জনগণকে যেন আমরা পরিচালনা দান করি এবং তাদের সহযাত্রী হই।

আমরা এই কয়দিন বিশাল জনগণের মধ্যে একটি সৌন্দর্য ও শক্তি আমরা লক্ষ্য করেছি যা দিয়ে তারা প্রয়াত মেঘপালক পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি তাদের ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করেছে। প্রভুর সাক্ষাতে চলে যাবার যাত্রা মুহূর্তে জনগণ বিশ্বাসে ও প্রার্থনায় সঙ্গী হয়েছে। মন্ডলীর মাহাত্ম্য ও প্রাণ আমরা লক্ষ্য করেছি। এই মন্ডলীর গর্ভ থেকেই তো আমরা সকলে জাত, তাকে রক্ষা ও উন্নতির জন্য আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত, এবং পরিত্রাণের সংস্কার দ্বারা পরিপুষ্ট করতে আমরা মিশনকাজে প্রেরিত।

অত্র প্রসঙ্গে আমরা আমাদের অঙ্গীকার পুনরায় আমরা নবায়ন করতে চাই। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার উত্তরকালে বিগত একটি যুগ ধরে পোপ ফ্রান্সিস, তাঁর “আনন্দময় মঙ্গলবার্তা” *Evangelii Gaudium* নামক নামক প্রেরিতিক প্রেরণাপত্রে নির্দেশিত যে পথ, অর্থাৎ (১) খ্রিস্টই প্রথম তাঁর বাণী প্রচারে ফিরে আসা; (২) সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীর মিশনারী পরিবর্তন, (৩) মন্ডলীর সংঘবদ্ধতা ও সিনড-প্রক্রিয়া; (৪) বিশ্বাসবোধ – খাঁটি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন লোকভক্তি; (৫) ক্ষুদ্রজন ও সমাজে পরিত্যক্ত যারা তাদের প্রতি যত্ন; (৬) জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বাস্তবতায় সাহসী ও আস্থাपूर्ण সংলাপ; (৭) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পালকীয় সংবিধান: “আধুনিক জগতে মন্ডলী” *Gaudium et Spes* – দ্বারা নির্দেশিত পথে আমরা চলতে চাই। যিশু যিনি দয়াময় প্রভু, সকল সত্য, ন্যায়, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের সন্ধানে আমাদের দয়া করবেন।

কেন পোপ তার নাম চতুর্দশ লিও নিলেন সে সম্বন্ধে কারণ উল্লেখ করে তিনি বললেন: প্রথম শিল্প বিপ্লবের পর পোপ ত্রয়োদশ লিও সামাজিক শিক্ষার সূচনা করে “শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার” নিয়ে *Rerum Novarum* বিশ্বজনীন পত্র লিখেছিলেন। সেই থেকে কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার এক বিশাল সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন আরেকটি বিপ্লব ও উন্নয়ন বর্তমানে এসেছে বিশেষ করে “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা” যা বর্তমানে আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসছে মানবমর্যাদা, ন্যায্যতা এবং শ্রমমর্যাদার রক্ষা করার জন্য।

আমরা উপরে যাকিছু ব্যক্ত করলাম তা, প্রভুর সহায়তায়, আমাদের জন্য প্রার্থনা ও অঙ্গীকার হয়ে অনুদিত হোক।

(৭) পোপ লিও'র “রেজিনা চেলী” “প্রার্থনা প্রসঙ্গে: শান্তির আবেদন এবং আহ্বানের জন্য প্রার্থনা

প্রথমবারের মতো রবিবার দুপুরে “রেজিনা চেলী” প্রার্থনার সময় পোপ চতুর্দশ লিও শান্তির জন্য, বিশেষ করে ইউক্রেন ও গাজায় সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধের জন্য আবেগপূর্ণ কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন এবং আত্ননাদ করে বলেছেন: “আর যুদ্ধ নয়”।

৮ মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৮০ বছর পূর্তি স্মরণ করে বলেছেন যে, সেই যুদ্ধে ৬ কোটির অধিক লোকের জীবন নিহত হয়েছে। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ খন্ড খন্ড আকারে সংঘটিত হচ্ছে। তাই আবেগ কণ্ঠে তিনি বললেন: “আর যুদ্ধ নয়”। ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধের জন্য এবং সেখানে সত্যিকারের, স্থায়ী শান্তি ও ন্যায্যতা আনয়নের জন্য আহ্বান জানান। গাজার দিকে তাকিয়ে পোপ লিও বলছেন গাজাতে যা হচ্ছে তা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে ব্যথিত করছে; তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে যুদ্ধ বিরতি করা হোক এবং বুদ্ধিমানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা এবং বন্দী সেনাদের ফিরিয়ে দেয়া হোক। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতির জন্য তিনি স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এবং শান্তি যেন সেখানে সুদৃঢ় হয় তা তিনি কামনা করেছেন।

আজ বিশ্ব আহ্বান দিবসে আমি তোমাদের এবং সকল জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে আনন্দে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি আহ্বানের জন্য, বিশেষভাবে যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনের জন্য। মণ্ডলীতে এই জীবনে আহ্বান জরুরী প্রয়োজন। মণ্ডলীতে আরও অনেক ধরনের আহ্বান আছে; সেই আহ্বানের জন্য প্রার্থনা করি যাতে ভক্তেরা আপন আপন জীবন অবস্থা অনুসারে অন্যকে ভালবাসা ও সত্যের পথে চলার জন্য পালকীয় সেবাদান করতে পারে।

(৮) রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে পোপ লিও'র সাক্ষাৎ ও বাণী

মে মাসের ১৬ তারিখ ভাটিকান রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত রাষ্ট্রের একশত রাষ্ট্রদূতদের সাথে পোপ লিও সাক্ষাৎ করেন। প্রথম দিকে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে তারা যে শোকবার্তা এবং নির্বাচনের পর পোপ লিও'র কাছে যে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন তার জন্য সকল রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রদূতদের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরবর্তীতে পোপ লিও বলেন: পোপের কুটনীতি হচ্ছে “মণ্ডলীর সর্বজনীনত্বের প্রকাশ” “এবং এর সাথে যুক্ত “মণ্ডলীর বহির্মুখী পালকীয় কাজ” এবং “মঙ্গলসমাচার প্রচারের মিশনকর্ম”। মণ্ডলীর কর্মপদ্ধতি হচ্ছে বিবেকের প্রতি আহ্বান, যে দৃষ্টান্ত পোপ ফ্রান্সিস দিয়ে গেছেন। সাম্প্রতিক কালে জগতে আছে “দরিদ্র, অভাবী ও প্রান্তিক মানুষের আত্ননাদ” এবং এর সাথে “জগতসৃষ্টির সুরক্ষা থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রমুখ বর্তমানকালের চ্যালেঞ্জ সমূহ”। তিনি পোপ লিও' নাম গ্রহণ করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে

এমন একটি নতুন যুগ চিহ্নিত হয় যেখানে মন্ডলী উপরোক্ত সমস্যায় সম্পৃক্ত হতে পারে।

রাষ্ট্রদূতদের সাথে ভাটিকানের সংলাপে তিনটি প্রধান বিষয় উল্লেখ পোপ মহোদয় উল্লেখ করলেন: শান্তি, ন্যায্যতা এবং সত্য।

শান্তি একটি দান স্বরূপ। শান্তি শুধু যুদ্ধ এবং সংঘর্ষের অনুপস্থিতি নয়। শান্তি এমন একটি বিষয় যা নিজের মধ্যে শুরু হয়, নিজের প্রতি দাবি রাখে। শান্তি হৃদয়ের মধ্যে প্রোথিত। শান্তি অন্তর থেকে অহংকার ও প্রতিশোধের ভাব দূর করে; আমাদের কথাবার্তায় শিষ্টাচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংলাপ শান্তির জন্য অপরিহার্য।

ন্যায্যতা: শান্তির জন্য ন্যায্যতা প্রয়োজন। অসমতা ও বৈষম্য সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে। পরিবারে পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক, সকল গর্ভজাত সন্তান, প্রবীন, অসুস্থ, বেকার, নাগারিক, অভিবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার হোক।

সত্য: শান্তি ও ন্যায্যতার পূর্বশর্ত হচ্ছে সত্য। সত্য স্বচ্ছতা দাবি করে। দ্ব্যর্থবোধক কথাবার্তা যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে। আন্তরিক সংলাপের মধ্য দিয়ে সত্য সন্ধান ও সত্য উদ্ঘাটিত হয় এবং আত্মসমর্পনে প্রেরণা জাগায়। এর সঙ্গে জড়িত অন্যের কথা শ্রবণ করা। মণ্ডলীকে সর্বদাই সত্য নিয়ে কথা বলবে; শুনতে অগ্রিয় হতে পারে তবে সত্যকে ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

(৯) উদ্বোধনী খ্রিস্টমাগে পোপ লিও'র বাণী: মন্ডলীতে ভালবাসা ও একতা

উপদেশ থেকে নেয়া কিছু কথা এখানে তুলে ধরা হল

প্রিয় ভাইবোনেরা,

পোপের দায়িত্বভার গ্রহণের সূচনা মুহূর্তে আমি কৃতজ্ঞতাভরে আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। স্মরণ করি সাধু আগস্টিনের কথা: “প্রভু, তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছো তোমারই জন্যে, আমাদের অন্তর অস্বস্তিপূর্ণ যতদিন তোমাতে স্বস্তি পাই”।

বিগত দিনগুলোতে আমরা গভীর আবেগে অভিভূত ছিলাম কারণ পোপ ফ্রান্সিসের তিরোধান আমাদের হৃদয়কে করেছে বিষন্নময়। মেঘপালক হারানো মেঘের মতো ছিলাম। আবার পুনরুত্থান রবিবারে আমরা তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছে। প্রভু আমাদেরকে ত্যাগ করেন নি।

বিশ্বাস ভরে আমরা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও অভিজ্ঞতা থেকে আসা কার্ডিনালগণ ঈশ্বরের হাতে নিজেদেরকে অর্পণ করেছেন পিতরের উত্তরাধিকারী, রোমের বিশপের

অনুসন্ধান, যিনি আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ঐশ্বর্য রক্ষা করবেন এবং একই সময়ে সম্মুখের দিকে বর্তমান জগতের প্রশ্ন, উদ্ভিগ্নতা ও চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করবেন। আপনাদের প্রার্থনার সহসঙ্গী হয়ে, পবিত্র আত্মার কাজ অনুভব করেছি, যিনি আমাদেরকে সম্প্রীতির বন্ধনে নিয়ে আসছেন যেন আমাদের হৃদয়-বীনার সঙ্গীতে বাৎকৃত হয় ঐক্যতান।

আমার নিজের যোগ্যতা বলে নয় বরং আমাকে বেছে নেয়া হয়েছে, এখনও ভয়ে কম্পিত, আমি যেন আপনাদের ভাই হিসেবে সামনে দাঁড়াই, যার বাসনা হচ্ছে আপনাদের বিশ্বাস ও আনন্দের সেবক হতে, ঈশ্বরের পথে আপনাদের সাথে একসঙ্গে হাঁটতে, কেননা তিনি চান আমরা সবাই যেন একটি পরিবার হিসেবে একত্রিত থাকি।

ভালবাসা ও একতা: এই দুটো দিকই হচ্ছে পিতরের হাতে ন্যস্ত মিশনদায়িত্ব। এই কথা আজকের মঙ্গলসমাচারে পিতরকে “মানুষধরা জেলে” মনোনয়নের ঘটনায় বলা হয়েছে। পিতর কীভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন? আর কিছু নয় পিতরের প্রতি ঈশ্বরের অসীম ও নিঃশর্ত ভালবাসা এমন কি সকল অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও। তথাপি পিতরের প্রতি যিশুর আবেদন: “আরও ভালবাসার”। অতএব পিতরের দায়িত্ব “ভালবাসার দায়িত্বভার”, ভালবাসার উপর সভাপতিত্ব। আবার পিতরের কাছে আহ্বান: মেসদের পালন কর – কর্তৃত্ব নয়। পিতর আহূত তার ভাইবোনদের বিশ্বাসের সেবা করা এবং তাদের সাথে পথচলা, কারণ তারা সবাই “জীবন্ত প্রস্তর”, দীক্ষান্নানের দ্বারা প্রভুর গৃহের মিলন-বন্ধনে, পবিত্র আত্মার ঐক্যে এবং বিচিত্রতার মধ্যে সহ-অবস্থানে আহূত। সাধু আগস্টিনের কথায়: “মন্ডলী হল তারা যারা ভাই বোন হিসেবে একত্রে বাস করে এবং তাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসে।”

ভ্রাতা-ভগ্নিগণ, আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, আমাদের প্রথম মহান বাসনা হবে “একত্রিত মণ্ডলী” ঐক্য ও মিলনের নিদর্শন, যা পৃথিবীর খামি হয়ে উঠবে।

আমাদের বর্তমান সময়ে আমরা লক্ষ্য করছি, অনেক বিচ্ছিন্নতা, ঘৃণার ফলে অনেক ক্ষত তেরী হয়েছে, আছে সহিংসতা, বন্ধমূল ধারণা, ভিন্নতা সম্বন্ধে ভীতি, এবং অর্থনৈতিক এক ব্যবস্থাপনা যা ধরিত্রীর সম্পদকে শোষণ করতে এবং দরিদ্রদের প্রান্তিক পর্যায়ে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা হতে চাই জগতের জন্য একতা, মিলন এবং ভ্রাতৃত্বের ক্ষুদ্র খামি। আমরা জগতকে বিন্দ্রতা ও আনন্দের সাথে বলতে চাই: খ্রিস্টকে দেখ! তাঁর কাছে এসো! তাঁর বাণী শোন, বাণী তোমাদেরকে আলোকিত করবে ও সান্ত্বনা দেবে। তাঁর ভালবাসার দানকে তোমরা গ্রহণ করো এবং এক পরিবার হয়ে ওঠো; এক খ্রিস্টে আমরা এক। এই পথে আমাদের একসঙ্গে আমাদের চলতে হবে, আমরা নিজেরা এবং অন্যান্য ভগ্নি-মণ্ডলী সাথে, অন্য ধর্মের মানুষের সাথে, যারা ঈশ্বরের সন্ধান করে তাদের সাথে, অনুগৃহীত সকল পুরুষ ও

নারীর সাথে, যাতে আমরা এমন জগত নির্মাণ করতে পারি যেখানে শান্তি রাজত্ব করবে।

এই মিশনারী ভাব আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে; নিজস্ব ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, একই সময়ে জগতের মধ্যে নিজেকে বড়ো না ভেবে। আমরা ঈশ্বরের ভালবাসা প্রত্যেক মানুষের কাছে অর্পণ করতে আহূত হয়েছি, যেন আমরা সেই ঐক্য অর্জন করতে চাই যা বিচিত্রতাকে অস্বীকার করে না, বরঞ্চ প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইতিহাসকে এবং প্রতি জনগণের সামাজিক ও ধর্মীয় কৃষ্টির প্রতি মূল্য দেয়।

ভাই ও বোনেরা, এই সময় ভালবাসার এক শুভ ক্ষণ! মঙ্গলসমাচারের প্রাণ হচ্ছে ঈশ্বরের ভালবাসা যা আমাদের সকলকে ভাই ও বোন করে। আমার পূর্বসূরী ত্রয়োদশ লিও'র কথায় আমরা আজ প্রশ্ন করতে পারি: এই নীতি “যদি জগতে বিরাজ করত, তাহলে সব সংঘর্ষের নিরসন হতো এবং শান্তি ফিরে আসত।”

পবিত্র আত্মার আলো ও শক্তি দিয়ে এসো আমরা এমন মন্ডলী গড়ে তুলি যা ঈশ্বরের ভালবাসার ওপর ভিত্তি করে গড়া, মিলনের চিহ্ন হওয়া, মিশনারী মন্ডলী যা জগতের প্রতি উন্মুক্ত, যে মন্ডলী ঐশবাণী প্রচার করে, ইতিহাস দ্বারা সৃষ্ট “অস্বস্থিতে” প্রবেশ করতে সম্মত, এবং মানবজাতির মধ্যে মিলনের চিহ্ন হতে ব্রতী।

ভাই ও বোন হিসেবে একসঙ্গে একটি জনগণ হয়ে এসো, আমরা ঈশ্বরের দিকে পথ চলি এবং পরস্পরকে ভালবাসি।

(১০) উপসংহার:

উপসংহারে পোপ চতুর্দশ লিও কোন পথে চলবেন তার পোপীয় কার্যকালে তা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রধান বিষয় গুলো আমি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

- (ক) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান: “খ্রিস্টমণ্ডলী”কে অনুসরণ। পালকীয় সংবিধান “আধুনিক জগতে মণ্ডলী” অনুসরণ।
- (খ) পোপ ফ্রান্সিসের “মঙ্গলবার্তার আনন্দ” – বিশ্বজনীন পত্রের নির্দেশনা
- (গ) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে
- (ঘ) সংলাপের মাধ্যমে সকলের সাথে সেতুবন্ধন নির্মাণ
- (ঙ) বর্তমান শিল্প-বিপ্লব বিশেষ করে “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা” ও অন্যান্য উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে মানবব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা।
- (চ) মণ্ডলীর বাসনা থাকবে: ভালবাসা ও একতা যা চিহ্ন ও খামি হয়ে কাজ করা।
- (ছ) মণ্ডলী হবে মিশনারী
- (জ) জগতের মধ্যে মণ্ডলীর মিশন হচ্ছে: শান্তি, ন্যায্যতা, সত্যতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

Sources:

1. Pope Leo XIV: 'Peace be with all of you' – First Greetings after the Election
2. Gerard O'Connell, Pope Leo XIV first Sunday blessing: Appeals for peace, vocations and happy Mother's Day, May 11, 2025.
3. Dr. Richard Declue, Pope Leo XIV Addresses Diplomatic Corps, Vatican, May 16, 2025
4. Matthew Dunch Pope Leo XIV can bring Catholic social teaching into the A.I. age, May 15, 2025
5. Pope Leo XIV's homily at the Mass for the Initiation of the Petrine Ministry in St. Peter's Square on Sunday, May 18, after being elected the 267th successor of St. Peter on May 8, Vatican City, May 18, 2025

ପ୍ରବଳା-୮: SERVANT OF GOD ARCHBISHOP T.A. GANGULY, CSC.

“DAY STAR” AND “PRIDE” OF BANGLADESH

Archbishop Theotonius Amol Ganguly, csc, gave up his last breath on 2nd September, 1977 approximately around 4:30 pm in Dhaka Archbishop's House. At around same time, a group of Christian leaders, numbering 40 or so, Priests, Brothers, Sisters and Lay Faithful, coming from all over Bangladesh, was meeting at a Seminar in Mathis House discussing some critical issues regarding the future Orientation of Caritas Bangladesh animated by a SAIDI (South-East-Asia International Development Institute) TEAM from the Philippines. Towards the end of the Seminar we were waiting for Archbishop Ganguly to offer Mass on the occasion of Golden Jubilee of Bro. Constatnt Brouillard, csc. Hearing that it was not possible for him to come, Fr. Richard W. Timm, csc, took the responsibility of presiding over the Mass assisted by two organizers, Fr. Benjamin Costa, csc, and me, Fr. Patrick D'Rozario, csc. Immediately after the homily the news was announced that Archbishop Ganguly just expired a few minutes ago because of heart attack.

As soon as Mass was over, we moved to the Archbishop's House and so did hundreds of others coming from different corners of Dhaka City to pay deep respect to him at Ramna Cathedral Church. Spontaneously the words and expressions that came out from many hearts of the people were: “he was a saint”. Seeing the huge crowd of people streaming towards the Church continuously till he was buried on 4th September, Fr. Gillespie, csc. remarked: “I feel sorry that the Archbishop Ganguly could not see how many people loved him so much.”

CHILDHOOD AND SCHOOL EDUCATION

Archbishop Ganguly died at the age of 57, and was born on February 18, 1920. His birth anniversaries and even birth-centenary

now after five years continue to be celebrated with the aim of remembering the holiness of his life and with commemorating as Feast of a Saint.

Theotonius Amal Ganguly, was born in a devout Catholic Family of three boys whose father was Nicholas Kamal Ganguly (died May 7, 1957) and the mother was Ramona Costa (died January 1, 1965). Theotonius was born on the feast of St. Theotonius. The Bengali name “Amal” means “spotless” or “innocent”.

Theotonius regularly accompanied his mother to morning Mass and eventually became an altar server. His mother expressed her hope that he might one day be a priest.

The Congregation of Holy Cross had a high school (class 6-10) at near-by Bandura and Theotonius attended this school. Adjacent to his school, was the Little Flower Minor Seminary to train local clergy. In 1937 Theotonius entered the Seminary fulfillment of his wish. In Bandura school Theotonius was a very bright and serious student. He stood first in his class. He obtained the highest marks in English, Bengali, and Mathematics. He was also recognized for his excellent singing voice. In 1940 he passed his matriculation examination in the first division standing third in the national merit list.

Theotonius expressed his desire to become a Holy Cross Priest during his seminary days. But the Archbishop of Dhaka declined his consent because of his priority to build the local Church. Humbly Theotonius accepted the decision but kept cherishing the goal after his Ordination as Priest.

When we look at his life of childhood and school days, we can easily see Theotonius as a special Gift of God for the Church in Bangladesh, a gift which needed many years to blossom in fullness, manifested in variety of ways, to be recognized and to be told the tale of his life mentioning him: coming from a good Catholic and educated family, brought up with religious and spiritual formation, recognized in him something exceptional in school and in the minor seminary, indication of a divine call in him recognized by many at

the contemporary period, meritorious boy with excellent results in the school final exam, third in the merit list at the national level; active involvements in sports, music, drama; simplicity, devotedness, prayerfulness, sincerity and honesty, joyfulness in living and sharing his life, etc.

MAJOR SEMINARY EDUCATION AND ORDINATION

Theotonius was then sent to study philosophy and theology at St. Albert's Seminary at Ranchi, Bihar, India. The seminary was conducted by the Jesuit Fathers. He was there for six years. Again he was seen as an excellent student and his humility, gentleness and amiability were noted by all.

At the age of 26 years, Theotonius Amal Ganguly was ordained priest for the Archdiocese of Dhaka on June 5, 1946 at St. Mary's Cathedral in Ranchi by Bishop Oscar Severin, SJ, the Bishop of Ranchi.

He returned to Dhaka and was appointed to teach at his former seminary, Little Flower at Bandera. He taught English and Latin. He showed great concern for the education of seminarians.

In 1947 Rev. Lawrence Leo Graner, CSC was made Archbishop of Dhaka. The Archbishop arranged and sent Fr. Theotonius to the University of Notre Dame in Indiana in the United States for higher studies.

HIGHER STUDIES: MASTER AND DOCTORATE

Between 1947 and 1951 Fr. Ganguly obtained a Master and a Doctorate in Philosophy. He was the first Bengali Christian to obtain a doctorate. The Superior General Fr. Cousinea, when heard about the Doctorate degree, wrote to Fr. Ganguly with whom he had close relation: "your degree will not change your approach so charming by its conquering simplicity".

In his three writings on "*St. Thomas and the Human Body*", MA dissertation, *Purusa and Prakriti (Self and Nature)*, PhD Dissertaton, expressed his philosophical thoughts and *Jibon*

Ashban (Vocation of Life), revealed his basic theological vision of life. The philosophy of T.A Ganguly was related to humanism understood in Christian perspective and local (indian) context. “In another we can say his thoughts was a kind of synthesis of Christianity and the local philosophy. His philosophy was a reconciliation and reconstruction of Catholicism with local philosophical thoughts, where human being is the main character in writings and the vocation of life is the source of development in human life.”

JOINING HOLY CROSS CONGREGATION

Fr. Theotonius knew the Holy Cross Congregation from his childhood in his school days. He did his MA and PhD studies living with the Holy Cross Priests in Indiana. At the end of his studies, when his wish to become a Holy Cross Priest was more matured, Fr. Ganguly wrote to the Superior General, Fr. Albert Cousineau expressing his inner call to Holy Cross. Fr. Ganguly was aware that his decision may upset his Local Ordinary, Archbishop Lawrence Graner, csc who wanted in priority the Diocesan Clergy to build the Local Church. The Superior General approved his application and he entered the Novitiate on August 15, 1951 in Jordan, Minnesota. He was 31 years old and had been ordained a little over five years.

He made first profession on August 16, 1952 and after renewing his vows in 1953, 1954 and 1955, he took final vows on October 26, 1955 in Dhaka.

TEACHING MINISTRY AND OTHER PASTORAL ACTIVITIES

With his doctorate in hand, Fr. Ganguly was assigned to teach at Notre Dame College and thus began his teaching career. On January 8, 1957 he was named director of the studies. He became principal of the college in 1960.

Fr. Ganguly was teaching but also doing pastoral activities which comprise: visiting the convents and houses and institutions of the Religious and offering Masses, e.g. Brothers in Narinda and at

St. Joseph, Bottomely Orphanage and Holy Cross Sisters at Tejgaon, and going to other parishes for offering Mass, preaching missions, youth animation and animating other spiritual devotions.

In 1957 in the month of February, while travelling by bicycle to Narinda to offer Mass, Fr. Ganguly met with an accident. Because of the heavy fog on the road, he did not see a big ditch on the road and he fell inside the ditch and broke his left thigh bones. He spent six months in the Dhaka Holy Family Hospital but did not recover totally. Then for one month He went to take treatment in Karachi Holy Family Hospital. He returned with much improvement, but still on crutch. By the end of the year he could walk normally.

APPOINTMENT AS AUXILIARY BISHOP OF DHAKA AND THE CONSECRATION

Just one month after becoming principal of the college, he was named as Auxiliary Bishop of Dhaka, on September 14, 1960. It was not unexpected that he might one day be a bishop, because of all his qualities, but it came as a surprise at this time. He was 40 years old and had been ordained 14 years. Surprise or not, the announcement was met with joy by the local church.

Archbishop Lawrence Graner, csc, who knew Fr. Theotonius Ganguly, introduced to people the newly elected Bishop Ganguly as “DAY STAR” indicating that Bishop Ganguly shines bright like a Star even in the Day light. The book of Revelation speaks: “I, Jesus, have sent my angel to attest these things to you for the sake of the Churches. I am the spring from the root of David and the bright star of the morning.” (22:16)

He was consecrated on October 7, 1960, in the newly built Cathedral in Ramna by Gregory Cardinal Agagianian, Prefect of the Congregation for the Propagation of the Faith, who came from Rome for the consecration. In the nearly 400 years’ history of the Church in this area, he was the first Bengali Bishop. He was the first local Shepherd. It was the beginning of a new day in the life of the local Church.

After the announcement and before his consecration, Fr. Ganguly went to Rome and met with St. Pope John XXIII to get his blessing and to make a six-day retreat. He laughed later when relating that the Pope, seeing the very young-looking bishop-elect, asked him, “How old are you? Eighteen?” He took as his motto “*Deus Adjutor meus*” not really realizing how much he would need the help of God in the future.

There were over 2000 people present at the consecration. During his time as auxiliary bishop, he traveled throughout the vast diocese serving the pastoral needs of the people. He attended all four sessions of Vatican Council II held in the autumn months of 1962, 1963, 1964 and 1965. The Council was for him not a conversion but rather a confirmation of his deepest faith and values.

In July of 1965 he was named coadjutor archbishop. This was primarily because of the very tenuous situation of Archbishop Graner, who was Archbishop of Dhaka from 1947-1967, became a *persona non grata* due to his outright stance for the Garo people who were being pushed across into India. They did not expel him, but let it be known that, whenever he would journey outside the country, they would not allow him to reenter.

In a very short time Archbishop Graner was required to leave the country. On November 25, 1967 he formally resigned and Archbishop Ganguly was installed as the Archbishop of Dhaka.

A reception was held for Archbishop Ganguly at which he spoke. After expressing THANK YOU to all to whom he owed, Archbishop presented his insight into the vision of the Church and his heart:

“Dearly beloved in Christ, we must not bury that treasure (the heritage inherited), nor let it slip from our fingers. We take it with gratitude from those who went before us; we will enrich it hand it on to those who follow. This is our task.

As your Archbishop, I welcome this opportunity to greet you, to thank you for your cooperation, and to assure you that I, for my

part, will dedicate myself entirely to the work God that has been entrusted to me. In the months ahead we will have occasion and opportunity to plan our work more carefully. The synod of priests will be organized; the laity will have their parish organizations; we shall hope for a diocesan group of priests, religious, and laity working together in planning and undertaking various programs.

For all of this, we need time and effort. And therefore I ask you to have patience with me and with one another. We can neither neglect the present while planning for the future, nor be so absorbed in the present that we forget the future. Our efforts must include them both. We must not waste our energies in vain quarrels and useless discussions about details. There are too many and too important works to be done. I know - we all know - that there are many things that need improvement; let us go about this task in an atmosphere of peace and charity, working together, and not pulling our separate ways. Unless we have unity, there is little hope for improvement....

Friends, it is love that fills my heart today; it is this love that I want to have and to share with you and with all. With this love I end these few words as I started them: with a THANK YOU for your love and loyalty today.”

CHALLENGES IN EPISCOPAL MINISTRY

Within a short span of time after assumption of the responsibility as Shepherd, Archbishop Ganguly faced big issues and challenges like:

1. The transition from foreign Missionary Church to a Local Church.
2. The sometimes turmoil in the Church in trying to implement the vision of Vatican II including development of a culturally sensitive vernacular liturgy,
3. A natural disaster of unbelievable devastation,
4. Followed immediately by a War of Liberation, a war of horror and terror,
5. Dealing with the want, famine and chaos in the aftermath of the war,

6. Setting up a local Church structure, especially seminaries where none existed,
7. Giving time to a constant stream of people seeking his help.
8. Leadership in the Local Church as President of the Catholic Bishops Conference.
9. Constant relation with Government heads and officials in favour of the ethnic and religious minorities.

Archbishop Ganguly was convinced of all the changes proposed by Vatican II. But those changes brought tensions, conflicts and even polarization of opinions among Priests, Religious and the Laity. He wanted to see a Church as Body of Christ with different parts which will be active. Archbishop dreamt of a Communion of the Church after the example of the Holy Trinity and Holy Family of Nazareth in imitation to the vision of Blessed Moreau. He loved everyone, sympathized with everyone, and did not want to hurt anyone. However, in this situation he only suffered and his heart bled so many times. He was humble, but others were proud of their authority. He tried to understand everyone, but he was sometimes miss-understood. Others wanted to win victory, and he suffered pain to the point of his heart giving out in his death. A humble pastor, saintly life-style and a suffering servant of God. Only a man of Faith, Hope and Charity could bear all that.

During the tensions created by implementation of some of the recommendations of Vatican II, a Religious Congregation was also affected by tensions and polarizations. Once a young Religious woman came to the Archbishop Ganguly and said that there is so much of politics going on in the community which she had never imagined. Therefore she wants to leave the community. Archbishop Ganguly then empathetically remarked: “the members of the community are not angels, they are human beings with weaknesses and failures, which are part of the community life. Pray and do not leave.”

Archbishop Ganguly was a person who mixed with everyone: laity, religious brothers and sisters and priests. Inspired by the Second Vatican Council, Archbishop wanted to build communion among

the Laity, Religious and Priests in the Diocese. For the first time in 1982 he started in his Archdiocese “ADAN-PRODAN” program, a gathering of priests, religious and laity for mutual exchange in order to build communion among themselves. His leadership in the Church as President of the Conference was also guided by the same spirit. He exercised a prophetic role in introducing in the Church the synodal approach.

Archbishop Ganguly was a person who never wanted to hurt anyone. He faced the problems with deep prayers on his knees, never hurting, loving the neighbour, enduring the sufferings, inspired by the example of Blessed Basil Moreau trusting the Divine Providence and taking up Cross of his daily life, praying for and awaiting better life with strong faith and hope.

At one moment Archbishop Ganguly, wrote to the Superior General: “Mentally I have been quite disturbed in recent months by the conduct of the men here. At time I even had the silly and cowardly thought of asking the authorities to transfer me to a place where I may be able to serve God in peace.”

NATURAL DISASTER OF 1970

To these Church-related problems was added a natural disaster of devastation which took place on November 12, 1970, a tidal wave and cyclone hit Bangladesh which took lives of 3 million people beside tremendous loss of property. The Christian Organization for Relief and Rehabilitation (CORR) was formed. This later became Caritas Bangladesh which fully engaged in building the new nation of Bangladesh. Archbishop was involved and supportive of all of this effort. The Church, he knew, must respond to human suffering

LIBERATION WAR AND INDEPENDENCE OF BAGLADESH

This disaster was followed by the horrendous liberation war which began a few months later in 1971 on March 26. The creation of Pakistan in 1947 with two wings separated by a huge territory of India got united only in being the two overwhelmingly Moslem

areas of the old British Raj. The people were different by ethnicity, culture and language. The Bengal portion in East Pakistan was more populated, but totally dominated by the Western part of the country. Tensions built up and the war sparked by an army intervention from the West to nullify an election which had been won by the East.

The war lasted for nine months, and finally with the intervention of India, a new nation of Bangladesh emerged. The horrors and outrages of this war are well-documented. As many as three million people were killed; rapes, burning, plunder were daily facts. Over ten million people became refugees, fleeing to India.

During the war Archbishop Gangly journeyed at great risk to visit his people. It is written that, “He staked his life to help the suffering people by ordering all Catholic parishes and institutions to provide shelter and relief”. Many parishes and institutions became crowded with refugees.

With all these concerns and worries the Archbishop once wrote, “we are duty bound to contend with the daily stream of those who, due to the present state of the economy do not have enough, nay, who do not even have one full meal a day”. He writes of our “headaches” and “heartaches” in a “newborn nation still in the tottering stage” and that “we started from absolute zero in everything”. He also wrote of these “critical days of stress and want”.

During the Liberation war for Independence of the country, as Archbishop, he gave excellent leadership, with love of the nation to be born, with courage to take part in the liberation, to stand side by the poor victims of war and atrocities. Strong and courageous faith, love for the suffering people and his hope in God’s providence marked his leadership at that crucial moment. He contributed much for the liberation of the people by serving the victims.

Archbishop Ganguly was a zealous citizen of the country and a priest and Shepherd of the Church, so often he went close to the people who needed his love, courage and presence most.

The suffering of the people deeply touched Archbishop Ganguly. Demands and need were endless and resources could never match them. There is testimony of his sleepless nights when he was unable to help someone. He made himself available to all. He spoke with the poorest people and everyone attested to his patience, gentleness, and empathy. Father Charles Houser, CSC wrote, “By Christian and non-Christian alike, Archbishop Ganguly was respected as a man of prayer and sympathy and learning.” It was noted that he was spending more and more time in prayer before the Blessed Sacrament. Fr. Houser also wrote, “He had received a special grace from God to be what he was, and like a good steward responsible to God, he had put himself at the service of others.”

Another result of the new nation coming into existence was the need to develop a local Church. There was, for example, no theology seminary. Seminarians went to Karachi for theology. There was needed also an intermediate seminary for the college going boys. Twenty-one of the seminarians who were in Karachi, three of whom were to have been ordained in December, were still in Karachi and were “political prisoners” awaiting exchange for Pakistani prisoners. Eventually, through his hard efforts, they were returned.

By June of 1973 an intermediate seminary was started and by September 1976 a major seminary was constructed and operating.

CONCERN FOR HEALTH OF THE ARCHBISHOP AND DEATH

There was growing concern about Archbishop Ganguly’s health. He was worn down physically and emotionally. There was concern of whether he would have a breakdown. There was worry that perhaps he had TB. It was clear that he was under a great deal of psychological and emotional stress. He continued his journey surrendering to the Divine Providence and acknowledging “Cross as the Only Hope”.

The Superior General of the Congregation wrote inviting him to come to Rome for a rest. The Archbishop responded on September 4, 1972, “I feel that it would be a rather uncommon measure not be

available to the generality of our people. If God should want me to continue to spend myself for the people, I am ready, be it even in sickbed”. Exactly five years later on September 4, 1977 he was buried, having completely spent himself for the people.

In 10 years as Archbishop amid unending and unrelenting worries, stress and pressure, the true goodness of the Archbishop was very clear. He was described as gentle, kind, patient, wise, simple, prayerful, unpretentious and without personal ambition.

Priests who knew him described him as a man of “rare humility and gentleness, with an unfailing cheerfulness that was a clear sign of deep faith...his empathy with anyone in trouble or need. You could see it: when they hurt, he hurt”. “In spite of natural shyness, he was at home with ambassadors and executives; he was more at home with the working person and the poor, with students and children”.

DEATH AND FUNERAL

At 4:15 in the afternoon of September 2, 1977 he had a sudden and massive heart attack. He died in the car taking him to a clinic. He was 57 years old. His body was brought to the Cathedral and soon a crowd of over 1000 were present. The people were stunned and deeply grieved at his sudden death. All through September 3 his body was in the cathedral and people came all day to pay their respects. On September 4 was the funeral Mass to which thousands came from all over Bangladesh, Christian, Moslem, Hindu, Buddhist. The crowd filled the church and there was a huge number of people outside. Catholics touched their rosaries or other religious articles to the body.

TESTIMONIES OF PEOPLE

Fr. Thomas Zimmerman, CSC who knew the Archbishop well and worked with him gave the homily at the funeral Mass. His homily clearly indicates that the Archbishop Ganguly was a “Man of the Gospel” or “Man of the Beatitudes”. Fr. Zimmerman preached the following homily:

We who knew the Archbishop well and worked closely with him during his years as our shepherd and before, are filled with sadness

even as we prepare to celebrate the final acts of these Sacred Rites which are expressions of the Joy of our Faith in the Glorious Resurrection.

He was our friend- so much one of ourselves - yet our shepherd too.

As the word judges he will not be remembered as a great builder or administrator. He took no delight or pride in the pomp and dignity of office- his joy was to be accepted simply as a priest among his brother priests.

His true greatness can be found in his simply being what he was- a priest and shepherd close to the heart of the Master, Jesus. This morning the words of Jesus echo in our heart as we honour the earthly remains of our beloved Archbishop for the last time:

“How happy are the poor in spirit; theirs is the Kingdom of Heaven.” He was a simple man of simple tastes, seeking no honour or title. Ambition was unknown to his heart.

“Happy the gentle, they shall have the earth for their heritage”. Gentle- even like the Master- the secret of the magnetic personality recognized by everyone who met the Archbishop. Seeming so fragile and delicate, and yet so strong in his gentleness.

“Happy those who mourn: they shall be comforted.” Archbishop suffered much and deeply, sharing the pains and sufferings of others. But few there were to understand his own agonies.

“Happy those who hunger and thirst for what is right: they shall be satisfied.” If the Archbishop had any ambition it was this hunger and thirst which is rooted in compassion for the helpless, the lonely, the weak victims of man’s heartlessness. Trust in the Lord alone eases this agony.

“Happy the merciful, they shall have mercy shown them”. Never one to condemn, rather the Archbishop shared in Jesus’ own need to forgive and to carry the burden of the offender’s guilt as if it were his own.

“Happy the pure in heart, they shall see God.” Lacking any human or mere earthly treasure, Archbishop’s deep desire to be near the

Lord gave him the strength daily to bear the burden that was his as our shepherd. This, too is the secret of his inexhaustible availability to all the sundry: the great as well as the nameless needy ones seeking his assistance.

“Happy the peacemakers, they shall be called Sons of God”. How often Archbishop lived the humility of the lord and his readiness to bear any suffering and indignity to preserve peace and harmony among his own. He led the way to reconciliation by first declaring his own guilt. An unkind judgment never escaped his lips.”

“Happy those who are persecuted in the cause of right: theirs is the Kingdom of Heaven”. Archbishop’s lack of ambition, his feeling of unworthiness and inadequacy- these were the real scourges of his years as Leader of Christ’s flock. Now they become the crown of his greatness and glory.

Dear Lord Jesus Christ, we thank you for giving us our Beloved Archbishop. We thank you for bringing yourself near to us through him. We ask forgiveness for any pain we caused you by making him suffer.

We ask you now to fulfill your promises and keep him in your infinite joy and happiness. Ad Multos Annos and Forever. Alleluia. Alleluia.

The Congregation’s Superior General wrote: “His gentleness and goodness and the suffering these very qualities occasioned for him are ample assurance for me that he is now with the Lord”.

Father Arnold Fell, CSC, another close friend, wrote, “He never sought or found any great satisfaction in honors: at times they were his cross.... What matters, and what we will remember him for, is the personal virtue he radiated”.

Sister Louise of SSMI sends the following message after the death of Archbishop: “he must have been soon admitted to the bliss of Heaven, after a life of complete dedication to God and extension of the Church. Was he not the glory of the Congregation of Holy Cross in Bangladesh!”

VIRTUES AND LIFE ANECDOTES

The Archbishop learned well from the example of Jesus because he was truly meek and humble, gentle and kind and caring and, for that reason, heavily burdened and weary people came to him. He as himself heavily burdened and weary but took on himself the burdens of others. He, like Mary, carried everything in his heart. He distanced, protected himself not at all from the suffering of the people.

It was Archbishop's faith that sustained him. He was thrust into leadership at an unbelievably turbulent time. He surely did not seek this and felt himself unworthy of it. He speaks of his temptation to escape from it, but he had a deep faith that God had called him to this and that God would work through him. That faith and his prayers supported him. In the time of difficulties he would be reminding himself the words of the Founder of Cross, Blessed Basile Moreau: He surrender himself to the "Divine Providence" and would say: "It is not my work, it is God's work."

Archbishop's hope was always tested by one suffering after another, but he held on to the hope that suffering can be redemptive. The Holy Cross motto: Cross is our Hope was his strength. He never despaired but clung to hope and was a source of hope for others.

Archbishop Ganguly's love of God was deep and intimate and expressed itself in his love for people whom he took into his heart. His respect for all people, no matter their condition, was evident to everyone. His compassion, taking others' sorrows as his own, is attested to again and again. As a member of the Congregation of Holy Cross, whose priests are dedicated to the Sacred Heart of Jesus and whose principal patroness is the Sorrowful Mother, he would have prayed, "make my heart like unto thine", and his heart was like theirs.

With prudence, justice, temperance and courage can all be seen in the relentlessly demanding situations in which Archbishop Ganguly found himself.

Just during that very dangerous war Archbishop Ganguly was seen everywhere among the people. He was a gentle person, who could not and would not hurt anyone purposely, but was himself often criticized, but never lashed out himself. In the midst of these situations, when it is attested by others that “I never saw him get angry”, we understand that this was an exceptional person. He listened to everyone. He tried to build community and consensus. He always wanted to bring people together. His writings always reflect this. He urged rather than forced people. He lived Christian ideals and called others to him.

He had embraced religious life after his ordination. He did this freely and with purpose. He wanted a life in community and embraced the vows of poverty, chastity, and obedience as evangelical counsels, as virtues, vows taken in imitation of Jesus. The Archbishop was faithful to these vows and stayed close to the Congregation after being raised to the episcopacy. He lived very simply, disliked pomp and never sought honor. He was mindful of others and not of himself, although frequently urged by others to take care of himself. He could not let himself be spared what others were enduring.

Humility was his rock on which all of his other virtues were built. He saw himself as a servant of others. His life was one of service in situations which he would have never chosen for himself. A servant is someone who lives in another’s house and does that one’s bidding. This is how he saw himself. His kindness and gentleness, so often (even universally) mentioned about him, followed from his profound humility.

His heroic exercise of virtue seems clear. Fruits of the Holy Spirit (Galatians 5:22-23) such as love, peace, patience, kindness, goodness, generosity, gentleness, faithfulness and self-control are all evident in his life.

He would never have described himself as “heroic”, but we believe sincerely that he was. The situations which he encountered called for virtue in heroic proportions and we believe he answered that call. The testimony of the scriptures speak for him even more eloquently and directly than all the testimonies of people.

It was said, “the glory of his exalted position or splendor could not delude him. The pride of high learning and wisdom never touched him. He liked to be respected as an ordinary and dedicated priest in the vineyard of the Lord”.

It is the opinion, deeply held, of the Catholic Church in Bangladesh that Archbishop Ganguly lived a life of heroic, extraordinary virtue. In this Jubilee year of mercy, when His Holiness, Pope Francis, is calling the Church to mercy, to be among and for the suffering, to be caring and compassionate servants, Archbishop Ganguly stands as a model of someone who quietly lived and worked in just this way. If he is raised to the ranks of the venerable, it will have a tremendous positive influence on the small Christian community in Bangladesh.

Looking at the life of Archbishop Ganguly and his ministry as Priest and Bishop, all these aspects of the Holy Charism have surely impacted him. Archbishop of Ganguly, right after his Ordination to the priesthood, felt always an inner urge to go to help the people who are in needs, going to the people living far away, going to those who live in periphery, to go on foot, on cycle or to take any means of transports like rickshaws, trains, pulling carts, etc. Once he was going by train and there was no way to enter the train because of the crowd and the train was moving away, he immediately jumped and stood on the joints in between the two wagons of the train, traveling with his cassock on.

Archbishop Ganguly was once invited to a distant tribal parish. Preparations were made for his coming. The pastor told the woman who would cook not to fix pork because the Archbishops could not eat it. The Archbishop came and there was a program which included tribal dance which he very much appreciated and spoke about. At meal time the woman cook had prepared, maybe through not understanding, beautiful pork dishes, When the Archbishop could not eat them, she broke down and cried. Two months later the Archbishop told the pastor that he wanted to return to see the

dances again. When a meal was served the same woman cooked and this time prepared fish dishes. These the Archbishop ate. He then called the woman and in front of everyone said, “Last time I was here and I caused you great sorrow. Now I have enjoyed your wonderful cooking”. The woman cried, this time with happiness. The pastor realized that the Archbishop had come great distance not to see the dance, but to bring happiness to this woman whom he felt he had hurt.

A list of the virtues and attributes of Archbishop Ganguly as seen and spoken of by lay people, Religious men and women and priests. (from Protibeshi Articles):

His love for all; had a great heart; did not think of himself; remained silent when others hurt him; suffered the pain and sorrows of others; everyday he spent an hour before the Blessed Sacrament; he fasted every Friday and offered it for a special intention; simplicity, politeness, honesty; his humility was peerless; a man of deep sympathy and respectfulness; he was a suffering servant; gentle, sensitive to the poor and oppressed; talked with the poor and distressed as his own people; he had deep devotion to prayer; he honored everyone; extraordinary patience; conquered the hearts of all with his humility; never proud or ambitious; he carried the cross for us; he completely devoted himself childlikeness’ self-denying, contemplative, wise, faithful; he had extraordinary human, spiritual and mental virtues; had a great devotion to the Blessed Virgin.

REPUTATION/FAME OF HIS HOLINESS

At his death and now all these years later the Church in Bangladesh realizes that this man, Archbishop Ganguly, was indeed a gift of holiness to us. There is true and lasting devotion to him. He is honored. He is prayed to. His picture is seen everywhere. Institutions and works of ministry are named after him. People come to pray at his grave. People, with one voice, will attest that he was an extraordinary servant of God.

Every year, for the 47 years since his death, on September 2nd, the anniversary of his death, a special program and Mass are held in Hashnabad, Archbishop's home parish and at the Cathedral with large crowds. On September 2nd, 2006 when his cause was introduced and he was declared Servant of God, there was a huge crowd and great joy at this recognition of him.

His name is known to every Catholic and there is universal agreement of these who knew him and those who have come to know of him that this was a truly holy man. The *Vox populi* is clear in how he is regarded. God gave us a very special man at a very difficult time. The strength of the local Church, of which he was the beginning, is a testimony to him. Even his death, so sudden and unexpected, brought new awareness and purpose to the Church. A local church that could produce a man such as this had every reason to be hopeful and to stand assured. Quite a few writers honoured Archbishop T. A. Ganguly, csc as PRIDE OF THE CHURCH IN BANGLADESH.

INTERCESSORY POWER OF THE SERVANT OF GOD

The church in Bangladesh did not get ahead of itself in seeking to discover miraculous works through the intercession of Archbishop Ganguly.

Rather there has been any number of reports of “favours” granted by prayer to him. There has even been some public sharing by people of such favours.

A number of religious institutions, buildings, ministries now bear his name. They are understood to be thus under his patronage and that he will aid them by his prayers. Archbishop's Museum is inaugurated at the Archbishop House Ramna and is open to all.

Recently, according to the report, team of Medical Doctors acknowledged the miraculous healing of a Holy Cross Priest suffering from Cancer. It remains to be investigated and verified by the competent authority. If the case is positive then the time is near at hand that Archbishop Ganguly, csc, will be beatified, for which the Church in Bangladesh is eagerly waiting and praying.

Prayer for the beatification of Servant of God, Archbishop Theotonius A. Ganguly:

Gracious Lord,

We thank you, for the gift of your servant, Archbishop Theotonius Ganguly, to the Church and to the people of Bangladesh. By his goodness, gentleness and kindness you guided your people through time of suffering, deprivation, and war. His constant humility, self-giving, deep faith and zeal for others were a day-star to a people in darkness and the shadow of death.

Lord, we ask that you bring many to know and imitate his virtues and to benefit by his devotion to you and the service of others. We ask you through the intercession of Archbishop Ganguly to grant the favour of

May his life inspire us to follow his example and may the recognition of his virtues bring honour to the Church and glory to your name. Amen

Acknowledgment of the Sources:

1. Theotonius Amal Ganguly, “*St. Thomas and the Human Body*”, unpublished, Department of Philosophy, Notre Dame, Indian, January 1949.
2. Theotonius Amal Ganguly, “*Purusa and Prakriti (Self and Nature)*”, unpublished, Department of Philosophy, Notre Dame, Indian, January 1949.
3. Theotonius Amal Ganguly, “*Jibonahaban, Vocation of Life*” Pratibeshi, Dhaka, March 2011.
4. Fr. Frank Quinlivan, csc, “*Strong in His Gentleness*”, Unpublished. 2009.
5. Fr. Frank Quinlivan, csc, “*Biography: Thotonius Amal Ganguly: His life*”, Unpublished 2022.
6. Cardinal Patrick D’Rozario, csc. Podcast on Archbishop T. A. Ganguly, Spirituality and Service, University of Notre Dame, 2023.

7. **Gomes**, Bernard Swapon, *Archbishop Theotonius Amal Ganguly: The Pride of the Catholic Church in Bangladesh*, written in Bengali, (বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব: আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী) Archbishop T.A. Ganguly Memorial Trust, Archbishop's House, September 2, 1988, Dhaka, Bangladesh
8. Pereira, Sunil, Editor, *Archbishop Theotonius Amal Ganguly: The Pride of the Catholic Church in Bangladesh*, written in Bengali, (বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব: আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী), Larger Edition with 790 pages comprising T. A. Ganguly's life sketch, All of his Writings published locally, and the writings about him.
9. Periera, Fr. Adam, csc. *Dibaloker Uzzal Nokkhatra (Star of the Bright Day): Theotonius Amal Ganguly, csc*, Published: Holy Cross Priests Society, Dhaka Bangladesh, March 2011.

কর্তব্য-৫: ARCHBISHOP THEOTONIUS A. GANGULY, CSC.

AN INTERVIEW TO MR. DAN ALLEN

Associate Director of Spirituality and Service, University of Notre Dame

Greetings from the Notre Dame Alumni Association, and welcome to our FaithND podcast, Everyday Holiness. My name is Dan Allen, and I serve as the host of the podcast and Associate Director of Spirituality and Service at the association. We are honored to have you join us for the beginning of our 9th season, and I am humbled to be joined today by our first guest from the College of Cardinals, His Eminence Cardinal Patrick D'Rozario, CSC. Cardinal D'Rozario is the first-ever Cardinal from Bangladesh and only the second member in the history of the Congregation of Holy Cross to be named to a Cardinal.

Cardinal D'Rozario, thank you for taking the time to be with us today.

Thank you for having me, Dan.

Certainly. To help give us some context of your life, where did you grow up, and what were some important lessons of faith during your childhood?

I am from Bangladesh. I was born in 1943 in a rural Parish called Padre+Shibpur. The name Padre was given to the village called Shibpur by the Augustinian Missionaries coming from Portugal in 1764. The Parish is situated at the South of Bangladesh which was part of Chittagong Diocese created in 1927 and entrusted to the Holy Cross Missionaries of Priests, Brothers and Sisters from Canada. Now Padrishibpur is under Barishal Diocese which was separately created in 2016 out of the former Chittagong Diocese.

When I was 3 years old, my father left the house, renouncing family life with a view to becoming a Christian Sannyasi (Sadhu). After 6

years of ascetic life in solitude he started wearing red clothes, similar to the clothes of the Apostles of Christ. All his life he lived as Sadhu, worked as voluntary Catechist with the Holy Cross priests working in Chittagong Hill Tracts. My father died in 1988 at the age of 85. With my immediate elder sister I have been brought up and educated at home by my mother during my childhood. I am the youngest of the eight siblings of our family, four of whom were living in Calcutta in West Bengal.

My mother was a very strong Catholic and brought me up in that Catholic Faith and practices, going every day to Mass in the Parish walking 15 minutes, saying Holy Rosary at home every evening. Mother's instruction was, "No Rosary, no meal." Strict moral Christian formation was given at home.

Going to Mass every day, serving as altar boy, offering the first fruits of agricultural products at home to the parish Priests regularly, etc., brought me close to the Parish Priest who was a Diocesan when I was doing my primary schooling. At the secondary level, I had a Holy Cross Canadian Parish Priest who journeyed with me, involved me in different Catholic movements in the Parish providing formation and giving me spiritual direction once in every month.

Very good. So how did you develop an awareness of your vocation to religious life and the priesthood, and what were some of your joys and challenges early in your ministry?

Family formation at home, participation in parish activities and programs, personal contacts with the Parish Priests and their guidance have initiated my vocation to become a Holy Cross Priest. In secondary School education, the whole parish knew that I had desire to become a priest. After passing the 10th grade exam I joined the Holy Cross Novitiate and made my first Profession in 1962 at the age of 18 and half.

Formation period to Religious Life and Priesthood continued for 4 years of B.A studies at Notre Dame College, Dhaka and 6 years in the Major Seminary in Karachi, Pakistan.

During Major Seminary study, I enjoyed to be trained with the theological and pastoral thinking of the Second Vatican Council by excellent Dutch Franciscans of the Order of Friar Minors.

The last year of my Seminary study, that is in 1971, the war of liberation broke out which lasted for 9 months and resulted in the separation from Pakistan and victory of Bangladesh as an independent nation on 16th December 1971. Three weeks after independence I was ordained Priest in my home Parish, the first Priest to be ordained in Independent Bangladesh.

Immediately after the Ordination in January 1972, I was assigned in a rural Parish Gournadi, from where thousands of Hindus, political leaders and supporters of liberation, fled to India as refugees because of the killings and tortures of Pakistani army. I was a Director of a Project for Relief and Rehabilitation for twenty thousand families who were directly affected by the war of liberation.

It was a very challenging work. My theological formation did not prepare me for that kind of responsibility. But this challenge led me to open up to new experiences, for example: exposure to socio-economic realities of the people, openness to the people of different religions: Muslims, Hindus and to other Christian denominations, and also open to the people culturally different from mine. All these experiences remained in me as locus for theological thinking and reflection during the three years of my academic studies in the Catholic University of Leuven, Belgium.

Because of the separation from Pakistan, Bangladesh Church had to start a Major Seminary and in order to prepare me to teach there, I was sent for studies in Moral Theology in Louvain. After three years of studies I returned in 1976 and started teaching in the newly established Major Seminary which lasted till my Episcopal Ordination in 1990.

During the teaching in the Seminary, my clearest goal was to bring renewal of the local Church in Bangladesh in the light of the Second Vatican Council. This goal was also shared by some of my

classmates in the Seminary. Voluntarily we formed ourselves as a team of 6 Diocesan and Holy Cross priests and undertook different programs and projects for renewal of the Church responding to the urgent needs. We founded PRODIPON, a philosophical and theological Journal of the Seminary; organized Seminars for the formation of the Priests, Religious and the Laity; developed common formation Programs for Religious men and women under formation; initiated a National Center for Pastoral Service to assist the Catholic Bishops' Conference of Bangladesh; promotion of pastoral planning in the Church and Christian Bengali Literature, publication of liturgical aids, translation of the important Church Documents and many other initiatives in the field of education, communication, youth ministry, formation of Christian nurses and other formation programs for lay people, etc.

All these initiatives gave us and me a sense joy in ministering to the Priests, Religious and Lay People on the teachings of the Second Vatican Council and thus bring about a renewal which was quite visible in the local Church.

The above mentioned activities, and at the same being Pastor of a Parish, Diocesan Director of Chittagong Pastoral Team, Director of Retreats and Pastoral Service Centre, District Religious Superior of the Canadian Holy Cross Fathers and a teaching in the Seminary as visiting professor etc., were very demanding and challenging. However, when we see the fruits we can feel the joy of gathering them for the glory of God and for the good of the Church.

After my priestly ministry for 18 years I had 30 years of Episcopal Ministry in three Dioceses. Just to complete my story, I briefly mention the following:

Bishop of Rajshahi (1990-1995): I was consecrated on 12 September 1990 as First Bishop of a new Diocese called Rajshahi, separated from Dinajpur Diocese. I hailed from the South but was called to go to the North where mostly indigenous or tribal people live. The Word of God that inspired me during this period of five years was: "Do you love me? ... Feed my sheep" (Jn. 21:17). It was

an experience of knowing what it means to be a Shepherd, who should know his people and people know him. I visited 95% of the families of the new Diocese which had about six thousand families. The Motto I took as Bishop was: CONTEMPLATING COMMUNION.

Bishop of Chittagong (1995-2010): I was transferred to my home Diocese, Chittagong in 1995 April and stayed there for 16 years. During my ministry as Bishop of Chittagong, the inspiring Word of God for me was: “The power of the Holy Spirit is on me, he has anointed me to preach the good news” (cfr. Luke 4:16-18). This was a call to be a Pastor of peoples of multiple cultures; ministry of evangelization, inter-religious dialogue and inculturation; formation in Catholic Faith using the new Catechism of the Catholic Church; formation of family and small Christian Community.

Archbishop of Dhaka (2011-2020): “That they may be one” (John 17:21) was the inspiring Word of God during the Episcopal Ministry in the Archdiocese of Dhaka from 2011-2022. My ministry geared to promote the Church as Communion, Mystery and Mission; with threefold vocations of the Laity, Religious and Priests, with their threefold priestly, prophetic and royal functions in view of building Communion of Priests, Religious and Laity, a synodal character of the Church.

Since 2020 I am leading a retired life, staying at the Center of the Bishops’ Conference of Bangladesh. My main occupation is writing and publications. During the last 2 and half years of retirement, I have been able to work on 9 publications.

Wonderful, thank you for that rich background. Another person you would have encountered in your ministry was Servant of God Archbishop Theotonius Amal Ganguly, CSC, and I would like you to say something about him as well. When did you become aware of Archbishop Ganguly, and what did you find inspiring about his life?

Before I speak about Archbishop Ganguly, I must say something in order to situate myself regarding my contacts and relationship with him.

First of all, I was 23 years younger than Archbishop Ganguly. When he was made Auxiliary Bishop of Dhaka in 1960, I was studying in the 10th grade in School.

Secondly, he was belonging to Holy Cross Fathers in Dhaka District under the Jurisdiction of Indiana Province in Dhaka Diocese; and I was belonging to the Chittagong District under the French Canadian Province in Chittagong Diocese.

Thirdly, I hardly knew Archbishop Ganguly personally before I came to do my College Studies at Notre Dame, Dhaka in 1962. When I was studying at Notre Dame College from 1962-1966, I came to know from others that Fr. Theotonius Amal Ganguly, csc, was a learned but humble man, was the Principal of the Notre Dame College, at the same time involved in many pastoral ministries in the city and in the rural areas; he was simple but abled personality, engaged himself in so many activities. He became the first Bengali Holy Cross Principal of Notre Dame College, very well known in the country. Immediately after few months as Principal of the College he was made the Auxiliary Bishop of Dhaka Diocese and moved to the Archbishop's House.

From 1966-1971 I was studying in Karachi. I was out of the country for higher studies in Belgium from 1973-1976.

All these details speak about one thing and that is, I had limited contacts with the Archbishop in the beginning. However, I had few occasions during the period when I met him personally. Let me cite those events in brief:

It was 3rd November 1965 when he was installed as the coadjutor Archbishop of Dhaka. I was one of the altar servers in the ceremony. I learned from others that the Archbishop was a great scholar. He was the most suitable priest to be made bishop. He was the first Bengali bishop and a very scholarly person with good reputation.

The first time when I personally came to know him was in Belgium when I was studying there. It was in 1974 that he came to Belgium to attend the Wedding Silver Jubilee of one of the brothers of Fr.

Henry van Hoff, omi, missionary in Bangladesh, hailing from Antwerp. He stayed with me in Leuven at the Holy Spirit College for 3 days. I accompanied him to Antwerp for the wedding anniversary and also took him to Liege at the house of Madeleine Brusten, one of my well-wishers, living at 10 Rue de la Score. Her house became the house of many Priests, Religious and Bishops coming from Bangladesh. Archbishop Ganguly later kept contact with Madeleine until his death and he very well communicated with her in French both in writing and speaking. His knowledge of French language surprised me a lot. When Archbishop Ganguly was declared Servant of God, Madeleine regretted later that she did not preserve the linen of his bed that he slept for a relic of a future saint.

In the beginning of 1977, being the Prefect of Studies in the National Major Seminary, I together with four other priests-colleagues took the initiative to organize a National Seminar for all the Priests in Bangladesh. We came to discuss the matter with Archbishop Ganguly seeking his permission. He accepted the proposal, gave his advice, and encouraged us to go ahead with assurance of his whole hearted support. We felt that he had the same kind of idea. He happily gave us some insights about the seminar, supported and encouraged us. The seminar finally took place in July, 1978 with presence of 129 priests and Bishops including the Nuncio, out of 143 of them working in Bangladesh. Unfortunately Archbishop Ganguly died in September 1977, the previous year. We felt his absence as he supported us so much.

On 2nd of September I was in Matthis House at Notre Dame College attending a Seminar organized by the SAIDI Team. Archbishop Ganguly was supposed to come for the closing Eucharist, but instead we got the news during Mass presided over by Fr. R. W. Timm, csc, that he expired because of heart attack.

His body was exposed in the Church till his burial on 4th. His body had to be embalmed to preserve for at least three days. I witnessed the procedure as I was given the responsibility to look after the body in the Sacristy. All blood from the veins of his body was drained out

and poured in the bucket. At that night I could not sleep because of the horrible sight of the blood being poured out from the body of the Archbishop.

I, together with a team of four other people worked the whole day and the night to prepare the liturgical texts of Office Reading for the Dead and Mass in Bangla to be held on the funeral day, 4th September with the presence of a big congregation. Eleven hundred sets of 10 pages each booklet was mimeographed working the whole night. I was the master of ceremony and the announcer. There were about three thousand people for the funeral, and it was difficult to control the flow of the crowd. The great mass of people irrespective of religions, mourning of people shedding tears, exemplified that he was not an ordinary person, he was a person who drew attention of many even after his death.

In response to what did I find in Archbishop Ganguly that was inspiring for me and also to others can be summarized as:

- (1) **Morning shows the day.** When I look at his life of childhood and school days, I can easily see him as a special Gift of God for the Church in Bangladesh, a gift which needed many years to blossom in fullness, manifested in variety of ways, to be recognized and to be told the tale of his life describing him as a person: coming from a good Catholic and educated family, brought up with religious and spiritual formation, recognized in him something exceptional in school and in the minor seminary, a person with divine call, meritorious boy with excellent results in the school final exam, third in the merit list at the national level; his active involvements in sports, music, drama; a person with simplicity, devotedness, prayerfulness, sincerity and honesty and joyfulness in living and sharing his life, etc.
- (2) **Discernment of his Vocation of Life:** While Theotonius Amal Ganguly was in the minor seminary he already decided to become priest. But he wanted to be a Holy Cross

Priest. He expressed his wish to Archbishop Lawrence Graner, csc, the Archbishop of Dhaka. His request was turned down because Archbishop Graner, csc, as a policy wanted to promote first Diocesan Clergy for the Local Church. He advised him to wait till his Ordination and then decide. Theotonius Amal Ganguly accepted the advice but kept his discernment open.

After finishing his Seminary studies in India at St. Albert's Major Seminary, Theotonius Ganguly was ordained priest on 6th June, 1946. From 1947-51 Fr. Theotonius Amal Ganguly completed his Bachelor, Master and Doctorate in Philosophy from Notre Dame University, being always first among the group.

After living five years with the Holy Cross Fathers at Notre Dame University and inspired by the Holy Cross missionaries, he expressed his mature desire to Archbishop of Dhaka to join the Holy Cross Congregation. This time permission was granted and he made his Novitiate and took the First Vow on 16th August, 1952.

His own experiences in the journey of discernment of his own vocation and that of the others, inspired him to write a book on *Vocation of Life* in Bangla in a series of articles in the Christian Weekly Protibeshi. However, the book deals with all vocations: to Priesthood, Religious and married life.

- (3) **Local Culture and Thoughts:** The third thing that inspired me in his life is his love for local culture and Indian thoughts and philosophy. In one word Archbishop Ganguly was a “Cultured” man in all aspects: knowledge of Bengali culture and language, arts and literature; he himself was a polished writer and a gentle speaker, beautiful singer in Bengali and Gregorian chant, excellent playing in drama; a great lover of Rabindranath Tagore, the Nobel Prize winner in Bengali

Literature. He spoke fluently Bangla, English, French, Latin and Hindi, and he had the knowledge of Sanskrit, Hebrew, Greek and German, etc. Gentleness, meekness and humility, softness, soberness and joyfulness characterized the expressions of his life. He was educated in Western thoughts in his philosophical and theological studies. But he entered into the Indian thoughts by writing his doctoral thesis in 1952 on: **Self and Nature** (*Purush and Prokriti*) according to Upanishad in Indian thoughts.

- (4) **Renewal of the Church:** Archbishop Theotonius Amal Ganguly, the first Bishop and later the first Archbishop became the head of the Bangladesh Church Hierarchy. He attended all the Sessions of the Second Vatican Council. Naturally, after assuming the responsibility as the Archbishop of Dhaka in 1967, his pre-occupation was to bring the teachings of the Second Vatican Council to the local Church and thereby work for its renewal.

He was convinced of all the changes proposed by Vatican II. But those changes brought tensions, conflicts and even polarization of opinions among Priests, Religious and the Laity. He wanted to see a Church as Body of Christ with different parts which will be active. He loved everyone, sympathized with everyone, and did not want to hurt anyone. However, in this situation he only suffered and his heart bled so many times. He was humble, but others were proud of their authority. He tried to understand everyone, but he was sometimes miss-understood. Others wanted to win victory, and he suffered pain to the point of his heart giving out in his death. A humble pastor, saintly life-style and a suffering servant of God. Only a man of Faith, Hope and Charity could bear all that.

- (5) **War of Liberation:** During the Liberation war of Independence of the country, as Archbishop, he gave excellent shepherding leadership, with love of the nation to

be born, with courage to take part in the liberation, to stand at the side the poor victims of war and atrocities. Strong and courageous faith, love for the suffering people and his hope in God's providence marked his leadership at that crucial moment.

Archbishop Ganguly, stood for rights of the people of Bangladesh, defended the position of Archbishop Lawrence Graner, csc, after 1964, who was told by the Govt. to leave the country. He spoke openly on the four principles of the envisioned new nation: democracy, nationalism, socialism and secularism. One of the Christian Military Authority told the Archbishop that he was enlisted as one of the intellectuals of country who were under plan to be killed during by the Pakistan army. Many intellectuals were killed but providentially he was saved.

When he met the Father of the Nation, Sheikh Mujibur Rahman after his return from exile to Bangladesh in 1972, Archbishop Ganguly gave his golden pectoral cross as a donation for the reconstruction of the devastated country. It was a deep symbol to express that the church is with the people of the country. To give his cross as an expression of love is a great gesture of patriotism.

(6) Virtues and Qualities: Archbishop Ganguly was courageous. He used to travel in ordinary transports to be one with the people who were suffering during the war. He sometimes took the risk of his life and was not afraid at all. He had patience when things were not moving, calm and serene with faith in God, humbly bearing the sufferings and burden of the others.

As bishop or Archbishop he was simple. He used to go around with simple white cassock and pectoral cross. He himself used to drive his own car and several times he rode on bicycle. Sometimes being conscious of his responsibility he wrote challenging letters to some of the priests when he

felt needed, but later he withdrew the letter because of his softness of heart as he did not want to hurt his priests. One of his most important virtues was to suffer in silence, to bear the cross for the sake of charity towards God and the people.

His humility was his personality character. He was always consoling to others. He suffered for Christ's sake. His spiritual exercises were always to seek the kingdom of God. He did not fight back but returned goodness in return to misconducts. Holy Cross Superior, Fr. Zimmerman's homily at the funeral Mass gave testimony of his life of the gospel beatitudes he lived.

While he was still living, he was considered "a living saint" because of his holiness, simplicity, spirituality and his gentle behavior towards all.

At the time of his funeral I felt that that his body would not be decayed and we would find his body uncorrupted. And with that thought in my mind he was buried. Later on, the priests who were sometimes opposing him, publicly acknowledged their misbehavior towards him and felt sorry. Some even said that they caused his early death because of the sufferings they gave to him.

His holiness, sanctity of life is a gift of God. I believe holiness is given to him, not for his own sake alone but for the benefit of the whole Church and particularly the Church in Bangladesh. This holy person has been given to the church so that she becomes holy by following his example. We are to follow and imitate him. It is good and urgent for the church that this beatification process comes to completion fast. His sainthood is like a treasure still hidden which needs to be uncovered, exposed and lifted up high for the good of the Church.

Of course, the Church has a process to investigate the lives of holy people like Archbishop Ganguly. What is your role in □ Archbishop Ganguly's cause for sainthood, and what can others do to be part of this effort?

The cause of the Canonization of Archbishop Theotonius Amal Ganguly was opened in 2006 by my predecessor, Archbishop Paulinus Costa. When I took the responsibility of the Archdiocese of Dhaka in 2011, I found some work have been already done, but the Tribunal and different Commissions were not functioning well. In 2015 I reconstituted the Tribunal and the Commissions, personally took interests in organizing and accelerating the Diocesan Investigation. In April 2017 finally the Diocesan reports of the Cause was brought to conclusion and all the documents were sent to the Postulator of the Cause in Rome. This has been my first role in the Cause of Ganguly's Sainthood.

Secondly, I formed a Pastoral Commission for the Promotion of the Cause with the following functions: (a) Collection of the personal items used by the Archbishop for future relics (b) Promoting devotions and prayers to the Servant of God in every Church within the Archdiocese (c) Publications in media and Dissemination of materials to all the other Dioceses in Bangladesh, (d) Gathering Information about favors received because of his intercession, (e) Preserving the birthplace and home property of this Servant of God, (f) Celebration of his Birth and Death Anniversary with talks, sharing of testimonies, Eucharistic Celebration and prayer at his grave. (g) Initiating a Museum of Archbishop of Ganguly for the public, etc. Most of the functions are being done regularly.

After my retirement as Archbishop my role is almost nil, except my personal prayers through his intercessions and sharing in writings and reflections.

Since a Saint is Saint for the Universal Church, we need the assistance of prayers and promotion of the cause involving more people. Some of the things that can be done for the cause are: (a) To make Archbishop Ganguly known world-wide especially to those

who have been linked to him in one way or the other; (b) To continue the initiative taken today by the Notre Dame Alumni Association's outreach; (c) Promotion of Devotions and Prayers asking favors through his intercession; (d) Sharing the testimonies of favors received (e) Financial assistance to the Holy Cross Generalate in Rome who is following the cause; (f) To universalize his holiness and sainthood spreading among many, (g) To pray for a miracle which can be medically proved, etc.

Well, it is a perfect fit for the Alumni Association to be involved because Archbishop Ganguly could possibly be the first graduate of the University of Notre Dame to be canonized a saint. Do you know of any significant spiritual moments he had while he was a student here?

It was at Notre Dame University that Archbishop Ganguly studied B.A., M.A. and the Doctorate in Philosophy and passed six years as academician. Surely his intellectual career has been enriched most at this University of Notre Dame.

His doctoral thesis seems to have been an excellent dialogue between the Western and Indian thoughts. The University of Notre Dame contributed to his intellectual search, and Archbishop Ganguly enriched the academic tradition of the University in a dialogical way.

The most important spiritual moment that I can imagine, is his encounter with the Holy Cross Charism, spirit, environment which was much deeper than what he received in his School days. Six years of his living and studying in the University were beautiful and experiential moments when Archbishop Ganguly came in touch with the Charism, Spirit and Mission of the Congregation of Holy Cross in a concrete way. It was in that context he decided to join Holy Cross, a gracious conversion to opt for Religious Life. Personal living experiences in community life, in spiritual exercises, in missionary tasks of the members and the stories of the great Missionaries made him to decide to join the Holy Cross Novitiate and made the first Vow before leaving for Bangladesh in 1952.

You are also a member of the Congregation of Holy Cross. What is meaningful to you about the charism of the Congregation, and how was □ Archbishop Ganguly impacted by this spirituality?

When I look back to school days, the initial call that I received was to respond to the urgent needs of the times. The Holy Cross Parish Priest, Fr. Philip Payent, csc. used to take me along, carrying a lit candle in hand, to accompany him to go to distribute Holy Communion to the sick in the village. Once after Mass Fr. Payent took me by a rowing boat to a village about seven miles far from the parish center to distribute Holy Communion to the Sick. On our return journey, Fr. Payent told me, “See, how urgent is the need of more Priests”. He used to send me to the poor to give help, to repair the broken houses belonging to older people and widows, to direct me to see the needs of others and respond as much as possible. This is the part of the Charism of Fr. Basil Moreau, that I learned later, that is, respond to the urgent needs with apostolic Zeal. This has been always active in my life till today.

Secondly, the Charism of Communion as envisioned by our Founder Blessed Moreau attracted me. Right from the school days, I have been formed by the Brothers, Sisters and Priests of Holy Cross. The Holy Cross Community is patterned around the Holy Family, a family of Priests, Brothers and Sisters. This aspect of the Charism always motivated me to live, to promote and also to minister as priest and as Bishop throughout my past ministry.

Thirdly, in the work of the Mission the call that always remained as motivating force is the Team Spirit, to build together and not alone, a Holy Cross spirit and attitude. I and others can quite clearly see visible in my life.

Fourthly, a spirituality of God’s Providence. Faith in God’s Providence, it is not mine but God’s Work. So much our Blessed Founder Fr. Moreau lived this aspect of the Charism. In some very hard ways I had to learn and acquire this spirit. There was a lot of giving up, surrendering, and self-abnegation to do. But now I see the fruit.

Looking at the life of Archbishop Ganguly and his ministry as Priest and Bishop, all these aspects of the Holy Charism have surely impacted him. Archbishop Ganguly, right after his Ordination to the priesthood, felt always an inner urge to go to help the people who are in needs, going to the people living far away, going to those who live in periphery, to go on foot, on bicycle or to take any means of transports like rickshaws, trains, pulling carts, etc. Once he was going by train and there was no way to enter the train because of the crowd and the train was moving away, he immediately jumped and stood on the joints in between the two wagons of the train, traveling with his cassock on.

Archbishop Ganguly was a person who mixed with everyone: laity, religious brothers and sisters and priests. Inspired by the Second Vatican Council, Archbishop wanted to build communion among the Laity, Religious and Priests in the Diocese. For the first time in 1982 he started in his archdiocese “ADAN-PRODAN” program, a gathering of priests, religious and laity for mutual exchange in order to build communion among themselves. His leadership in the Church as President of the Conference was also guided by the same spirit.

His spiritual life manifests a strong faith, hope and charity, and his example was of a humble, God-fearing and God-surrendering person. He never considered himself as author of what he did in the Church, in the nation-building, in taking care of poor to alleviate the war-caused miseries, etc. Faith and Hope in God’s Providence marked his life and mission.

Thank you for sharing those inspiring words. Returning to your life for a few minutes, you are now a cardinal of the Catholic Church. What was it like to hear that news for the first time, and what have been some of the most memorable moments of this experience?

The news of the appointment as Cardinal was announced by Pope Francis on 9th October, 2016 at the time of the Angelus in Rome without prior information to anyone, not me and not even to the Nuncio. At that hour it was 4:00 pm BD time when I started the Mass of the Feast of the Holy Rosary Church attended by about

three thousand people. After the Mass at 5:30pm while going to sacristy, a little girl of nine years wished me “Congratulations”. I said “for what”? “Oh you do not know, you are made a Cardinal” she said. From the mouth of a little babe came the announcement to me. At the start of the second Mass at 6:00 pm when there were more than five thousand people attending the Feast Day Mass, while incensing the statue of our Lady of the Rosary in the beginning of the Mass, I did not have any thoughts other than what Blessed Mother had at the time her Annunciation.

I was bewildered and dumfounded by my lack of any emotion! What does the appointment mean? Why me? and why? ... I came back to the Archbishop’s House, and at midnight I read the news on the internet written by an American Journalist attached to Vatican News and “AMERICA” periodical, and also a friend of mine, Gerard O’Connel. After reading and reflecting over this, a thought came to my mind: the appointment as Cardinal was a love of God for the poor people in Bangladesh, love of Pope Francis extended to the periphery of the world, a recognition by him of a minority Church, and a new blessing for the Church and the Nation.

What surprised me most, is that, the appointment of a Cardinal from Bangladesh, as remarked by both by the President and the Prime Minister of Bangladesh, is “an Honor for the Nation”.

It took more than a year to conclude for myself that I have been appointed Cardinal, on the one hand, to represent a nation in the periphery, represent a small but at the same time a powerful and vibrant Christian Community at the universal level, and to speak on the richness of the poverty of the people of Bangladesh; and in other hand to bring the teachings of the Church to the people of the nation and to the Church in Bangladesh.

People within and outside of the Church spoke highly of the honor of being voting or being voted as candidate for the election of a new Pope. But this never enticed me particularly because I strongly felt all along that Pope Francis should not resign and live long to continue, because of the moment of Synodality process that the

Church is going through. At this juncture he is needed most. Now I am relieved that I will not probably have to vote for Papal election since my right to vote will end on the 1st October this year.

It must have been quite surreal to represent the hopes of so many in being a Cardinal of Bangladesh. And yet, no matter our vocation, there is a commonality in our call to holiness and sharing the Gospel through our lives. Archbishop Ganguly preached the Good News throughout his life. What aspects of his message are still particularly relevant for the world to hear today?

Archbishop Ganguly was primarily a pastor in the Church. Besides his priestly and governing function, he had to carry out the teaching function of the Church, and preaching good news was part of the function. One of the top priorities of his teaching was to know the signs of the times, know the culture of the people, reflect on them, in the light of the teachings of the Second Vatican Council and bring message to the people and provide pastoral directions accordingly. This is very relevant, because I feel, together with Pope Francis, that the truth and beauty of the Second Vatican Council has not been fully discovered yet and appropriate actions for implementations have not been taken. One has to be very much imbued with the values of the Gospel and not simply listening and doing what the people would like to hear. Inculturation of the Gospel must have a priority in the present day culture of the people.

Secondly, Archbishop Ganguly's life has been a clear prophetic stance against clericalism of the Church. His life style, his priority to be close to the people, to all people, particularly to those who are far away, deprived, severed away because of some problems, being open to other faiths and Christian denominations are very relevant now. Relevancy of his preaching is being relevant to the people. De-clericalisation of Bishops, Priests, Religious men and women and even many lay faithful is the most relevant teaching of the day. Archbishop Ganguly can serve as model.

Thirdly, we see in Archbishop Ganguly, the message of what we call Synodality, the most important fruits of the Second Vatican

Council: Communion, participation and mission of the disciples of Christ. At the base of synodality lies the most fundamental, that is, listening to what the Holy Spirit says to his disciples as individuals and as community. Archbishop Ganguly, discerned the will of God, through prayer, meditation and in Eucharistic Celebration.

Fourthly, Archbishop Ganguly's life has been a message. He preached much more through what he was, than by what he said and did. Archbishop Ganguly is being honored as a "living saint" not primarily because of his activities but because of his heroic virtues of faith, hope and love, because of moral virtues of justice, prudence, fortitude and temperance, because of the way he lived the Beatitudes of the Gospel, because of the fruits of the Holy Spirit that he testified in his life: humility, simplicity, faithfulness, endurance, joy, charity, and so on. His life was a message which we preach and the Church needs to preach.

*Thank you for offering that for our reflection. In addition to □
Archbishop Ganguly, who have been your models of holiness who
have guided you in your life and vocation?*

I had many models in different stages of life. In my primary School level, a Diocesan Priest Bertrand Rodrigues, the Parish Priest of my home parish, whom I came to know closely because of my mother's instruction to go to him and offer the first fruits of the home garden and who thrice a week was cleaning the wounds of my leg with Dettol and medicine for many months.

In my high school days, a Holy Cross Parish Priest, Fr. Philip Payent, csc, who formed me in my vocation, journeyed with me and gave spiritual direction before I joined the Holy Cross Novitiate. Holy Cross Brothers who taught me, directed me, and setting examples before me are among the most important formators. Holy Cross Sisters, who went out of the way to take care of me in their convent, when my health was at critical stage suffering from strong Diarrhea, saved my life so that within two weeks I could go to join the Novitiate in 1961.

After my Priestly Ordination ministered by Bishop Joachim Rozario, csc., Bishop of Chittagong and Alumni of Notre Dame University, Bishop Joachim was my model during my priestly ministry of 18 years and my Episcopal ministry of 22 years in the Diocese of Rajshahi and Chittagong. I looked at Bishop Joachim as a person with: simple life-style, spirit of detachment, down-to-earth person, close to ordinary people, open to everyone irrespective of religions, culture and social stratifications, a prophetic voice of justice, leadership, inculturation and local Church, active promoter of Inter-religious Dialogue and Christian Unity among the different denominations, love for the poor and promoter of integrated human development. I worked with him many years as collaborators but at the same time his follower.

I did not know Archbishop Ganguly deeply enough before I was made the Archbishop of Dhaka in 2011. After taking the responsibility, my personal decision was that I would like to be a pastor of the Archdiocese like Archbishop Ganguly. The more I came to know him and got involved in the cause of his Beatification, the more I was consciously and internally imbued by his spirit and examples. I am thankful to God that I could end my last 10 years of episcopal ministry being in Dhaka Archdiocese where Archbishop Ganguly was my Predecessor and I tried to follow him and his message.

We like to ask every guest about their journey towards holiness since these answers help, I think, to edify one another as we journey through our lives of faith. Therefore, what has been effective for you as you seek holiness in your years as a vowed religious, priest, bishop, and cardinal?

Without much illustration I just mention the following points which have impacted in seeking holiness in my vowed religious, priest, bishop and cardinal:

- (a) I have experienced innumerable times that Vocation is a gift of God, reveals itself gradually, in the context of new responsibilities as vowed religious, priest, bishop of three

dioceses and finally as Cardinal. It is one and the same Vocation guided by God's call and his Providence.

- (b) I was a strong man of planning, an organized person, active but not super-active, and so on. However, I have learned in a very hard way, (suffering from spinal problem, being immobilized three times, each time 2-4 months) and would say learned in a miraculous way that, it is not my plan, it is God's plan, not my work, it is God's work, not what I want but what God wants.
- (c) I am pleased with the kind of formation I have received; initial formation I had already mentioned. But I would like to mention the academic formation that I received at Notre Dame College from the Holy Cross Fathers, in the Major Seminary in Karachi from the Dutch Franciscans immediately after the Vatican II was over, in the Pontifical University of Leuven and the on-going formation in the Asian theology developed within the Federation of the Asian Bishops' Conference.
- (d) In the last 51 year of my ministry what I see now looking back, is nothing but the priestly ministry of sanctification, prophetic ministry of teachings and royal ministry of governance for the kingdom of God, according to the Magisterium of the Church given by the Second Vatican Council and the Post-Vatican II teachings, pastorale and spirituality.
- (e) I tried to see my vowed life as Religious, Priest, Bishop and Cardinal in the perspective of the Vision of the Church given by Vatican II: (a) Church as Communion: with God and with others: Clergy, Religious and Laity, with other People of God and other Church Denominations, (b) Church as Mystery: mystery of the Body of Christ, union of the divine and human, sacramental character of the Church, human signifying the divine, mystery of the Incarnation of

the Word of God. (d) Church as Mission: of evangelization, that is bringing the Gospel to the life-reality, mission of every baptized person who is a missionary, participation of all in the mission of the Church, and so on.

- (f) Finally, understanding holiness as wholeness, integrated holiness, the main core of holiness is: “That They be One” as Jesus prayed. Holiness is understood as perfection of charity.

Indeed, the teachings of the Second Vatican Council and Lumen Gentium’s explicit universal call to holiness have been the inspiration for this podcast. Cardinal D’Rozario, thank you for the time and care you have shown us by being on the podcast today and for sharing so much of the life of Servant of God Archbishop Ganguly. To close, would you please offer a prayer for Archbishop Ganguly’s intercession and also give us your blessing?

Here below I cite the prayer of intercession that is being officially said in almost every parish after the Mass and in many Religious Houses in the Archdiocese of Dhaka and also on special occasions in other Dioceses on the birth or death anniversary of Archbishop Ganguly.

Let us pray...

We thank you Lord, because you have given your Servant, Archbishop Theotonius Amal Ganguly as a gift to the Church and to the people of Bangladesh.

By his works of charity and apostolic generosity, you have led your people at the time of sorrows and sufferings, deprivations and war-time and made him a Day Star for those who are under the shadow of death and darkness.

Remembering his love and devotion to you and his mercy to others, we pray through his intercession that we may receive (.... request of favors) the favors we asked for.

Lord, for the glory of your Holy Name and for good of the Church, make your Servant Blessed; increase our love for him; and let his life inspire us to follow his examples. Amen.

Mary of Immaculate Conception, Pray for us.

St. Joseph, Pray for us.

May the Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit bless you and remain with you always. Amen.

ব্রত- ৬ : ঈশ্বর-সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী

ফেব্রুয়ারি মাস বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের জন্য একটি স্মরণীয় মাস। ফেব্রুয়ারি মাসেই উদ্‌যাপিত হয় বসন্তকাল, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ ঋতু। এই মাসেই পালিত হয় বাংলা ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১লা ফাগুন “ভালবাসা দিবস” পালিত হয়ে এ মাসটি সবার নিকট আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। এ মাসেই আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা, বাংলাদেশ মণ্ডলীর একজন অতি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জন্মবার্ষিকী পালন করি; আর এবার, আজ ১৮ই ফেব্রুয়ারী পালিত হচ্ছে তাঁর জন্মের একশত বছরের পূর্তি-উৎসব। তিনি হচ্ছেন ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, যিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে গিয়ে, আমরা স্বাভাবিকভাবেই উপলব্ধি করতে পারি বাংলার খ্রিস্টমণ্ডলীর বসন্তকাল যা হচ্ছে “পবিত্রতা”র বসন্তকাল। ঈশ্বরের সেবক হয়ে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী প্রকাশ করছেন মণ্ডলীর “পবিত্রতা”র বসন্ত, যার লক্ষ্যে খ্রিস্টমণ্ডলীর ধাবিত।

আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে গিয়ে, স্মরণ করি বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি, যার ভেতরে অবস্থান করছে খ্রিস্টমণ্ডলী। এই মণ্ডলীতে জন্মগ্রহণ করে এবং ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি আপন করে নিয়ে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী মণ্ডলীকে করেছেন সামগ্রিকভাবে দেশীয় ও স্থানীয়। তাঁর লেখাপড়া, জ্ঞান-সাধনা, আচার-আচরণ; তাঁর অধ্যাপনা, বাঙালির প্রথম বিশপ ও আর্চবিশপ হয়ে মণ্ডলীকে পরিচালনা দেওয়া --এটা বাঙলার ভাষা-সংস্কৃতির খ্রিস্টীয় ভাবধারার প্রকাশ।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী মাসে এবং “ভালবাসার মাসে” ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবনের সাধুতা, ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি, সৃষ্টি ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালবাসার কথাই বলে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী একজন বাংলার মানুষ, বাংলার মাটিতে ও সংস্কৃতিতে তাঁর জন্ম। ধর্মপাল হিসেবে বাংলার মাটিতে উদ্ভাবিত খ্রিস্টমণ্ডলীর “পবিত্রতা”র নিদর্শন, তাঁর জীবনসাধনা, মণ্ডলীর পরিচালনা, ভালবাসার চর্চা “পবিত্রতা”র উদ্দেশ্যে মণ্ডলীর যাত্রা -- ইত্যাদি সবকিছু যেন ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী দৃশ্যমান করে তুলেছেন, প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন, নতুনের দিকে যাত্রার আহ্বান জানাচ্ছেন”।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপালের দায়িত্ব নেওয়ার মুহূর্ত থেকে, ঈশ্বর-সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি ছিলেন, আমার অন্তর-মনে, চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় ও আচার-আচরণে অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁরই দিকে চেয়ে নিজেই সর্বদা মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করি। তাঁর মতো যে হতে পেরেছি সেই গর্ব আমি কোনদিনও করতে পারব না। কিন্তু তাঁকে নিয়ে গর্ব করার ক্রটি আমার কোনদিনই হয়নি বলে আমি গর্বিত।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলী অনেক কিছুতে ছিলেন “প্রথম”। আমি যে, তাঁর মতো প্রথম হতে চেয়েছি তা কখনোই নয়। কিন্তু যা কিছুতে তিনি প্রথম হবার আদর্শ রেখে গেছেন, ভেবেছি সেটাই হবে আমার মতো অনুসারীর প্রথম আদর্শ। জ্ঞানে-ধ্যানে-আচরণে ও সেবাকর্ম-পালনে তিনি হয়ে আছেন আমার জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলীতে একজন অবিস্মরণীয় পথিকৃত ও অগ্রগামী ধর্মপাল।

আমার পূর্বসূরী পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ পলিনুস কস্তা, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরের সেবক ঘোষণা করে, আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলীকে ধন্য ও সাধু শ্রেণীভুক্ত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন। একযুগ পর ২০ শে এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে, ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে অনুসন্ধান কাজটি সম্পন্ন করার আনন্দ, অন্যদের মতো আমি নিজেও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। অতি আগ্রহ ও প্রার্থনায় আমরা অপেক্ষায় আছি সেই শুভ ক্ষণের জন্য যখন ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, “ভেনারাবেল” বা “ভক্তিভাজন” রূপে অভিহিত করে পরবর্তী ধাপে তাঁকে “ধন্য” শ্রেণীভুক্ত করা হবে।

মঙ্গলসমাচারের সারসংক্ষেপ “অষ্ট-কল্যাণবাণী”, বা “সুখমার্গ” বা “ধন্য” বাণীগুলো ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবনে মূর্ত হয়ে তিনি “ধন্য” হয়ে উঠেছিলেন। জীবদশায় যিনি “পবিত্রজন” ও “সাধু” বলে পরিচিত ছিলেন তাঁর জীবনে প্রকাশিত হয়েছে পবিত্রতা ও সাধুতার অসংখ্য গুণাবলী ও নিদর্শন। গালাতীয়দের নিকট পত্রে সাধু পল, পবিত্র আত্মার যে ফসলগুলো উল্লেখ করেছেন: “ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহনশীলতা, দয়াশীলতা, মঙ্গলময়তা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা ও আত্মসংযম” (গালাতীয় ৫:২২-২৩) এ সবগুলোই তাঁর জীবনে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

মেধা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর কোন অভাব ছিলনা; অথচ তিনি ছিলেন বিনম্র একজন ব্যক্তি। নানাজনে নানাভাবে এই কথা ব্যক্ত করে বলতেন: নম্র তাঁর আচরণ, অহংকারের কোন রেশ তাঁর মধ্যে ছিল না, তিনি একজন নম্র ও বিনয়ী, ভদ্র ও কোমলপ্রাণের মানুষ।

তিনি ছিলেন মহান একজন ভক্তিপ্রাণ ও নির্মল চরিত্রের মানুষ; তাঁর ছিল ভালবাসা ও ক্ষমা, সহনশীলতা ও আত্মত্যাগ; অন্তরে তিনি ছিলেন দীন ও পরিশুদ্ধ; তাঁর ছিল

দয়ামিশ্রিত দরদী স্বভাব ও শিশুসুলভ সরলতা; আর দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁর প্রদীপ্ত ভালবাসা। কোনদিন কেউ দেখেনি তাঁকে অন্যের সাথে রাগ করতে, কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে, কঠোর বাক্য উচ্চারণ করতে বা নিষ্ঠুরভাবে কারো সঙ্গে আচরণ করতে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা দ্বারা মণ্ডলীকে নবায়ন করার সময় কষ্টভোগী সেবক হয়ে তিনি জীবনের সকল প্রতিকূল অবস্থাকে গ্রহণ করেছেন।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলী তাঁর মহান পদ-দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সর্বদাই নিজেকে অযোগ্য ভাবতেন; কিন্তু তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর, যিনি তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনিই তাঁকে পরিচালনা দেবেন। তাই বিশপীয় মূলমন্ত্র হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন: “পরমেশ্বর আমার সহায়”।

তাঁর জীবনের আধ্যাত্মিকতা স্থানীয় মণ্ডলীর ওপর এক বিরাট ছাপ রেখে গেছে। বাংলাদেশের মণ্ডলীতে তিনি সূচনা করেছেন ধার্মিকতার এক নব যুগ। আর এ জন্যই বাংলাদেশের মণ্ডলী অধিক আগ্রহ ও প্রার্থনাভরে অপেক্ষায় আছে সেই দিনের জন্য, যেদিন তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত সাধুতা, মণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃতি পাবে এবং তাঁর পবিত্রতায় গোটামণ্ডলী, বিশেষভাবে বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলী, মহিমান্বিত হবে এবং পরিপক্বতার আরেকটি উন্নত ধাপে স্থানীয় মণ্ডলী বিচরণ করতে পারবে।

পরিশেষে সবার কাছে আকুল আবেদন করি যেন, সকলে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওয়েটনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে করতে তাঁরই মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন অনুগ্রহ যাঞ্চনা করেন, যা ঈশ্বরের অলৌকিক বা আশ্চর্যকাজ বলে প্রমাণিত হতে পারে। এই আশ্চর্যকাজটি ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওয়েটনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে “ধন্য” শ্রেণীভুক্ত করার জন্য একান্ত অপরিহার্য। ঈশ্বর আমাদের সহায়।

রচনা-৭: পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ বার্নাবা দ্বিজেন মণ্ডল: প্রাণের ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

অঞ্জলি লহ মোর ভক্তিতে, শ্রদ্ধা-ভালবাসা নিবেদনে,
বিনম্র অন্তরের ক্ষুদ্র অঞ্জলিতে, প্রাণে প্রাণে মিলন-সুরে।

অতি ভক্তিভাজন একজন প্রাণের মানুষ পরম শ্রদ্ধেয় বার্নাবা দ্বিজেন মণ্ডলকে আমি আমার অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার ক্ষুদ্র অঞ্জলি নিবেদন করি, উপরোক্ত পংক্তিগুলো উচ্চারণ করে।

বিগত ষাট দশকের গোড়া থেকেই বরিশালের অক্সফোর্ড মিশনের পুরোহিত ও সিস্টারদের সাথে আমার যোগাযোগ হয়। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে যাজকরূপে অভিষিক্ত হয়ে আমি যখন বরিশালের গৌরনদী ধর্মপল্লীর কাথলিক চার্চে কর্মরত ছিলাম তখন একদিন পুরোহিত দ্বিজেন মণ্ডলের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই প্রথম সাক্ষাৎটি ছিল যেন একটি প্রাবৃত্তিক ঘটনা; ভবিষ্যতের দীর্ঘ পথচলার একসঙ্গে যাত্রা করার সূচনা। এখান থেকেই শুরু করে পরবর্তীতে অনেক ঘটনাক্রম জলশ্রোতের মতো প্রবাহিত হয়েছে অভাবনীয় ভাবে।

বিগত শতাব্দীর আশি দশকে আমি যাজক হিসেবে বিশপ মণ্ডলকে চিনেছি। পরবর্তীতে আমি রাজশাহীর বিশপ (১৯৯০-১৯৯৫), চট্টগ্রামের বিশপ (১৯৯৫-২০১০) এবং ঢাকার আর্চবিশপ (২০১১-২০১৯) থাকাকালে, চার্চ অব বাংলাদেশের বিশপ হিসেবে শ্রদ্ধেয় বিশপ বি.ডি. মণ্ডলকে এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে কাথলিক বিশপদের সাথে একজন ভ্রাতা-বিশপ হিসেবে আমি তাঁকে পেয়েছিলাম। এই সময়ে তাঁকে যেভাবে দেখেছি, যে-কথা শুনেছি, যে-কর্মকাণ্ড ও দৃষ্টান্ত দেখেছি, সহকর্মী রূপে যেভাবে তাকে পেয়েছি ও তাঁর সাথে সম্পর্ক অনুভব করেছি, তারই একটি ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি।

বাংলাদেশ মণ্ডলীর একজন বিশপ: বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এমন একটা সময় ছিল যখন সবাই ভাবত যে, বাংলাদেশে কাথলিক বিশপগণসহ বিশপ বি.ডি. মণ্ডল, গোটা বাংলাদেশ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশপ। যদিও তিনি এ্যাংলিকান মণ্ডলী এবং পরবর্তীতে চার্চ অব বাংলাদেশের বিশপ ছিলেন তথাপি অন্ততঃ বিশপ হিসেবে সকলের কাছে এমন কি অনেক কাথলিক পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টার ও ভক্তজনগণের কাছে তাদের একজন বিশপ হিসেবেই গণ্য হয়েছেন। নিজস্ব স্বকীয়তা থাকা সত্ত্বেও কাথলিক মণ্ডলী ও এ্যাংলিকান মণ্ডলীর এটাই ছিল সাধারণ ভাবনা। এরূপ ভাবনার পেছনে ছিল তৎকালীন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বরিশাল অঞ্জলের কাথলিক মণ্ডলী ও অক্সফোর্ড মিশনের

বিশপ ব্লেয়ারসহ সকল পুরোহিত ও সিস্টারদের অবদান। এ বিষয়টা খুব ছোটখাট ব্যাপার নয়। এর বিশ্লেষণে অনেক কিছুই উপলব্ধি হয় যা আমাদের কাছে আজ ততো গুরুত্ব বহন করে না। কাথলিক বিশপ হিসেবে সেই একই ভাবনায় আমি বিশপ বি.ডি. মণ্ডলের সাথে একত্রে পথ চলেছি মণ্ডলীর স্বাভাব্য ও স্বকীয়তা স্বীকার করে।

একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, কাথলিক ফেডারেশন অব এশীয়ান বিশপ কনফারেন্সের (এফ.এ.বি.সি.) সিদ্ধান্ত মোতাবেক, বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশের কাথলিক বিশপগণ বরিশাল অঞ্চলে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উদ্দেশ্যে পাঁচদিন ব্যাপী একটি এক্সপোজার প্রোগ্রাম আয়োজন করেন। এক্সপোজারের কর্মসূচী স্বরূপ প্রত্যেক বিশপ অন্য ধর্মাবলম্বী একটি পরিবারে তিন দিন একত্রে বসবাস করবেন। চারজন কাথলিক বিশপদের সাথে বিশপ মণ্ডলকে যোগ করা হয় এবং তিনিও এক্সপোজারে সকল কর্মসূচীতে যোগদান করেন। বিশপ মণ্ডল সম্পর্কে তৎকালীন বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর এ ছিল ভাবনা।

খ্রিস্টীয় ঐক্যে প্রচেষ্টায় শ্রদ্ধেয় বিশপ বি.ডি মণ্ডলঃ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের গোড়া থেকে শুরু করে বেশ কয়েক বছর গৌরনদী থানায় যুদ্ধোত্তর কালে কাথলিক মণ্ডলীর “কোর” সংস্থা কর্তৃক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ করে। স্থানীয় কোরের পরিচালক হিসেবে আমি ও পরবর্তীতে ফাদার ফিলিপ ডি’রোজারিও, আমরা সর্বদাই, পুরোহিত/বিশপ বি.ডি মণ্ডলের কাছ থেকে পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেছি। উক্ত এলাকায় জাতি-ধর্ম এবং মণ্ডলী নির্বিশেষে কোর সংস্থাটি কাজ করেছে। এমন কি আমার অফিস সেক্রেটারি ছিলেন এ্যাংলিকান মণ্ডলীর সদস্য অচিন্ত কুমার সমাদ্দার। শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন মণ্ডল পুরোহিত ও বিশপ হিসেবে ঢাকা থেকে যতোবার ঐ এলাকায় যেতেন ততোবার তিনি কাথলিক মিশনে প্রবেশ করে ফাদার-সিস্টারদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করতেন।

বিগত শতাব্দীর আশি ও নব্বই দশক, এবং দু’সহস্রাব্দের প্রথম দশকে বিশপ মণ্ডলকে আমি যে ভাবে দেখেছি তার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে আমি আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, এবং মণ্ডলীতে তার ভূমিকা ও অবদান ব্যক্ত করতে চাই। নিম্নোক্ত ঘটনাসমূহের মধ্য দিয়ে আমি দেখেছি তাঁর জীবনের সহজ-সরলতা, মনোভাবের উদারতা, খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সৃজনী মননশীলতা ও পরিকল্পনা এবং দেখেছি খুবই একজন বিনম্র পালক।

(ক) গৌরনদীতে কল্লোল গৃহ নামে একটি কাথলিক হোস্টেল ছিল। ঘরটার অবস্থা তেমন ভাল ছিলনা এবং হোস্টেল চালানোর যথেষ্ট অর্থও ছিল না। বিশপ বি.ডি. মণ্ডল হোস্টেলটি জার্মানীর একটি অনুদাতা সংগঠনের অর্থায়নে পাকা দালান করে নির্মাণ করলেন ও হোস্টেলের কাথলিক শিক্ষার্থীদের জন্য স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করলেন।

(খ) বিশপ মণ্ডল জোবারপাড়ে একটি হোস্টেল কমিটির চেয়ারম্যান রূপে একজন কাথলিক পুরোহিতকে নিয়োগ দিলেন।

(গ) বরিশালের কাশিপুর গ্রামে জমি ক্রয় করে বিশপ মণ্ডল হাউজিং ব্যবস্থা করেন যেখানে বিভিন্ন মণ্ডলী ও ধর্মের পরিবারের জন্য প্লট বরাদ্দ করলেন।

(ঘ) আমি যখন বরিশালের পাল-পুরোহিত ছিলাম (১৯৮৬-১৯৯০) তখন বিশপ মণ্ডল ও তৎকালীন চট্টগ্রামের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও একমত হয়ে কাশিপুরে যৌথভাবে একটি আন্তঃমণ্ডলিক গির্জা নির্মাণ করেন। যে-গির্জাটি কাথলিক চার্চ ও চার্চ-অব-বাংলাদেশ মণ্ডলীর সদস্যরা নির্ধারিত ভিন্ন সময়ে নিজ নিজ উপাসনা করার জন্য মিলিত হতো।

(ঙ) যখন আমি রাজশাহীর ধর্মপাল ছিলাম তখন একবার শ্রদ্ধেয় বিশপ মণ্ডল রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত চার্চ-অব-বাংলাদেশ সিনডের জন্য একদিনের ধ্যান-সভা পরিচালনার জন্য আমাকে আহ্বান জানানেন। কুষ্টিয়ার বিশপ মনোনয়নের প্রস্তুতি স্বরূপ ছিল উক্ত ধ্যান-সভাটি। আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে একজন কাথলিক বিশপকে তিনি আহ্বান করলেন। তার উদারতা, মিলন-ভাব এবং আস্থা আমাকে স্পর্শ করেছে।

(চ) দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম দশকে চার্চ অব বাংলাদেশের খ্রিস্ট-সেবিকা সংঘ ও বিশপ মণ্ডলের মধ্যে সমঝোতার কিছু টানাপোড়ান ছিল। উক্ত বিষয়ে তিনি আমার সাথে বিশদ আলোচনা করলেন। শ্রদ্ধেয় বিশপ মণ্ডল আমাকে অনুরোধ করলেন যেন আমি খ্রিস্ট-সেবিকা সংঘের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করি। আমাকে অনুরোধ করার কারণ হিসেবে তিনি নম্রভাবে যে কথাটা বললেন তা হল, তিনি তো কোন ধর্মসংঘে ছিলেন না, কাজেই হয়তো ওদের কথা ওনি ভাল বুঝতে পারছেন না। এই দায়িত্বটা পালন করা আমার কাছে খুব চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ছিল। তাছাড়া খ্রিস্ট-সেবিকা সংঘকে যেমন ও বিশপ মণ্ডলকেও তেমনি দু'য়েকটি বিষয়ে আমি চ্যালেঞ্জ করেছি। বয়সে ছোট হওয়ায় সেটা আমার জন্য মনে হচ্ছিল আমরা ধৃষ্টতা। কিন্তু আবারও আমি অবাধ হয়েছি তার নম্রতার পরিচয় পেয়ে এবং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একজন কাথলিক মণ্ডলীর বিশপের ওপর এতো আস্থা রাখলেন। কয়েক মাসের মধ্যে দেখলাম উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভাল হয়ে গেল। বিশপ মণ্ডলের সময় থেকে খ্রিস্ট-সেবিকা সংঘের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা হিসেবে কাথলিক মণ্ডলীরই একজন ফাদার নিযুক্ত হয়ে আসছেন।

(ছ) কাথলিক মণ্ডলীর যে-কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, এমন কি শেষ মুহূর্তে আমন্ত্রণ করলেও তিনি সর্বদাই উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করতেন। খুবই সাধারণের একজন হয়ে তিনি সেই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। তাঁর উপস্থিতিতে আমরা পূর্ণতা ও আনন্দ অনুভব করতাম।

(জ) ঢাকার আর্চবিশপ নিযুক্ত হবার পরপরই তিনি নিজে, আমাকে অবগত না করে, আর্চবিশপ হাউজে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করেছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং প্রার্থনা ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হয়তো অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হয় নি ভেবে আমার ভীষণ লজ্জা বোধ হচ্ছিল; কিন্তু তাঁর বিনয়ী ভাব এতো গভীর যে, তিনি ঐ প্রসঙ্গটি কোনভাবেই তুলেননি। চলে যাওয়ার সময়ে আমি বললাম দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে তো, তাই আমাদের সাথে চারটা ভাত খেয়ে যান। অমনি তিনি রাজি হয়ে গেলেন ও খাবার ঘরে আমাদের সাথে প্রবেশ করলেন।

(ঝ) আন্তঃমাণ্ডলিক সংগঠনসমূহে ও সভা-সমাবেশে তাঁর নেতৃত্বের মধ্যে দেখেছি, সততা, স্বচ্ছতা ও বলিষ্ঠতা, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন, খ্রিস্টীয় ভাবধারা ও মূল্যবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং প্রাবৃত্তিক ভূমিকায় নিবেদিত প্রাণ।

পরিশেষে আমাকে খুবই আন্তরিকতার সাথে বলতে হয় যে, শ্রদ্ধেয় বিশপ বি.ডি. মণ্ডল আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে, দেশীয় মণ্ডলীর বাস্তবতায় খ্রিস্টের ঐক্য প্রচেষ্টায় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপে ও সম্পর্কে একজন গুরু হিসেবে পথ-প্রদর্শন করেছেন। মাণ্ডলিক ঐক্য বিষয়ে অধ্যয়ন করেছি, কিন্তু তাঁরই কাছ থেকে বাস্তব শিক্ষা ও প্রেরণা পেয়েছি। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীও অনেকভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ কেননা তিনি মণ্ডলীর বিভিন্নতার মধ্যে সেতুবন্ধন রূপে খ্রিস্টীয় ঐক্যের নিদর্শন হয়ে প্রেরণা যুগিয়েছেন সবার জন্য।

পরিবারের সাথে সম্পৃক্ততা: পরম শ্রদ্ধেয় বি.ডি. মণ্ডলের পরিবারের সাথেও আমি বেশ সম্পৃক্ত ছিলাম। একাধিকবার পারিবারিক আহারে অংশগ্রহণ করেছি। তাঁর সহধর্মিণী, মেয়ে ও ছেলের সাথে বেশ পরিচিত ছিলাম। মৃত্যুর আগে একটি ঘটনা ভীষণভাবে বিশপ মণ্ডলকে কষ্ট দিয়েছে। এমন কি মাঝে মাঝে তিনি দিনে দুই-তিনবারও ফোন করে আমার সাহায্য চেয়েছেন। হয়তো তাঁর প্রত্যাশা অনুসারে সব সমস্যার সমাধান আমি করতে পারিনি। সেই দিক থেকে ওনার একটা প্রত্যাশা পূরণ হয়নি এবং তৃপ্তির আনন্দ পেয়ে যেতে পারেননি। সেই তৃপ্তি না-পাওয়াটাও আমাকে পীড়া দিয়েছে অনেক।

কষ্টভোগী সেবক বিশপ বি.ডি. মণ্ডল: একজন বিশপের জীবনে যেমন আছে অনেক আনন্দের বিষয়, তেমনি আছে কষ্টের বিষয়। তাঁর সব কষ্টের কথা আমার জানা নেই। তবে আমি যে কষ্টটি জানি তার প্রেক্ষিতে আমি বলছি যে, তিনি একজন কষ্টভোগী সেবক ছিলেন। বিভিন্ন মণ্ডলী ও জাতীয় সংগঠনের মধ্যে বিভাজন, কোন্দল, দলাদলি, নেতৃত্বদানে মিথ্যাচার, মানহানী ও ঔদ্ধত্য, শ্রদ্ধেয় বিশপ মণ্ডলকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু সবকিছুই তিনি কালের সীমায় ক্ষমা দিয়ে নিরাময় করে গেছেন নিজেকে।

যুববন্ধু বিশপ বি.ডি. মণ্ডল: আমি অত্যন্ত খুশী ছিলাম যে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাঁকো ও এসসিএম কর্তৃক “দীক্ষাবন্ধু” রূপে বিশপ মণ্ডলকে সম্মাননা দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে উপলব্ধি হয়েছে যে তিনি মণ্ডলীর যুবাদের কতো ভালবাসতেন, কতো কাছে তাদেরকে রাখতেন এবং তাদেরকে নিয়ে কতো স্বপ্ন দেখতেন। উপরন্তু আন্তঃমণ্ডলিক সংগঠনের মধ্যে বিশেষ ভাবে ওয়াই.এম.সি.এ এবং ওয়াই.ডব্লিউ.সি.-এর মধ্যে তার অংশগ্রহণ ও অবদান ছিল প্রশংসার যোগ্য।

শ্রদ্ধেয় বিশপ বি.ডি. মণ্ডলের জীবনাবসান : আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এই মহান ব্যক্তি, বিশপ বি.ডি. মণ্ডলের প্রয়াণ দিবসে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ২৯ জুন, সেন্ট টমাস চার্চে গিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করা এবং সবার সঙ্গে একত্র হয়ে প্রার্থনা করা। পৃথিবী থেকে তাঁর চলে যাওয়ায়, আমার ব্যক্তি জীবনে ও মণ্ডলীতে তাঁর অবদান আরও সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি হয়েছে। সেদিন তাঁর জীবনের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আমি তাঁকে সমর্পণ করেছি স্বর্গস্থ পিতার হাতে। চিরকাল তিনি বেঁচে থাকুন আমাদের মাঝে।

একই বছর ১৬ আগস্টে আয়োজিত পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ বি.ডি. মণ্ডল মহোদয়ের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে প্রার্থনা সভায় যোগদানেরও সুযোগ হয়েছিল আমার। আমার নিজের এবং বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর হয়ে স্মরণ করেছি তাঁকে, তাঁর সকল জীবন-সাধনা ও কর্মযজ্ঞ আমাদের স্মৃতিচারণে। তাঁরই সঙ্গে একাত্ম হয়ে এবং তাঁরই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা গেয়েছি কৃতজ্ঞতাভরা অন্তরে: “আমায় তুমি ডেকেছো প্রভু তোমার কাজে, অন্তর মোর তাই এত গান তাই এত সুর বাজে।

উপসংহার: আমার নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে, আমি পরম শ্রদ্ধেয় বি.ডি. মণ্ডলকে যে-ভাবে দেখেছি, যেভাবে পেয়েছি, কর্মকাণ্ডে ও জীবন-সাধনায় যে সাক্ষ্য আমার চোখে দৃশ্যমান হয়েছে তার আলোকে বলতে পারি: পরম শ্রদ্ধেয় বি.ডি. মণ্ডল ছিলেন একজন যিশুর মানুষ এবং তাঁর নিয়োজিত পালক; জনদরদী, বিনম্র ও প্রদীপ্ত সেবক; খ্রিস্টীয় ঐক্যের সাধক, দিশারী ও গুরু; মাটির মানুষ হয়ে তিনি পেয়েছেন উচ্চাসন; তিনি ঈশ্বর ভক্ত ও বিনয়ী সেবক; খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন নেতা ও সর্বজনের পালক। আমার প্রার্থনা, প্রভুর মহিমা দিন দিন আরও প্রকাশিত হোক তার জীবন-গল্পে এবং স্বর্গীয় মহিমায় ভূষিত হোক তিনি অনন্তজীবনে।

চরিত্র-৮ : স্যামসন এইচ চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী

প্রয়াত স্যামসন এইচ চৌধুরী পরমেশ্বরের একজন “আশীর্বাদিত” ব্যক্তি । তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই মহতী স্মরণসভায়, বাইবেলের গীতসংহিতা পুস্তকের ৯১ নং সামগীতিতে বর্ণিত ঐশ আশীর্বাদীগুলো স্মরণ করে, স্যামসন এইচ চৌধুরীর প্রতি নিবেদন করি আমাদের অন্তরের ভক্তি ও ভালবাসার শ্রদ্ধাঞ্জলি । পরমেশ্বর তাঁর সেবককে বলছেন:

“সে আমায় আঁকড়ে ধরেছে ভক্তি-অনুরাগে;

সে আমায় মনে প্রাণে মেনেছে বলেই তাকে রক্ষা করব আমি;

সে আমাকে ডাকলেই সাড়া দেব আমি; বিপদে দাঁড়াব তাঁর পাশে;

মুক্তি দেব তাকে, দেব তাকে মহান গৌরব ।”

দীর্ঘ পরমায়ু দিয়ে তৃপ্তি দেব তাকে: দেখিয়েই যাব তাকে পরিত্রাণ-কর্ম আমার ।” (দ্র: ৯-১৬ পদ)

বাইবেলের বিচারকগ্ৰন্থে বর্ণিত একজন বিশেষ ব্যক্তিত্বের নাম স্যামসন । জন্ম মুহূর্ত থেকে পরমেশ্বর স্যামসনকে ডেকেছিলেন, তাকে আলাদা করে রেখেছিলেন, যাতে তিনি ঈশ্বরের সেবা করতে পারেন । তিনি ছিলেন জাতির একজন মহান নেতা । সংগ্রাম করার জন্য ঐশ্বরিক শক্তিতে তিনি ছিলেন শক্তিমান । এই সকল বিবরণে বাইবেলের স্যামসন এবং আমাদের শতবর্ষী স্যামসন এইচ চৌধুরীর সঙ্গে রয়েছে এক অভিনব মিল, যা বিকশিত হয়েছে তার গোটা জীবনে এবং জীবনজুড়ে ছড়িয়ে আছে তার সকল কর্মযজ্ঞে । ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া তাঁর আহ্বান, জাতির জন্য নেতৃত্ব, সংগ্রামী জীবনের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং ঈশ্বর ও মানবসেবার জন্য আমরা স্যামসন চৌধুরীকে জানাই প্রাণঢালা শ্রদ্ধা, অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা, এবং পরমেশ্বরকে জানাই আমাদের সকল ধন্যবাদ ও প্রশংসা, কেননা ঈশ্বর তাকে করেছেন “আশীর্বাদিত” ।

প্রাবৃত্তিক ভূমিকায়, পরমেশ্বরের কাছ থেকে যারা আহ্বান পান, তারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে শৈশব থেকেই দেখতে পান তার জীবনের মিশন ক্ষেত্র । তিনি দেখেছেন বিদেশ থেকে আগত মিশনারীদের সেবা: চিকিৎসা, মাতৃসদন, শিশুসদন, বাল্যবিধবা আশ্রম এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তাদের সেবা; তিনি দেখেছেন মিশনারীদের সাথে তার বাবা ডা. ইয়াকুব চৌধুরীর সম্পৃক্ততা – প্রথমে গোপালগঞ্জ, পরে চাঁদপুর ও পরিশেষে পাবনা জিলার আতাইকুলা মিশন চিকিৎসাকেন্দ্রের সাথে একাত্মতা, এবং তার বাবার “হোসেন ফার্মেসীতে” হয়েছে তাঁর নিজের হাতে খড়ি । একসময় তিনি পরমেশ্বরের ডাক উপলব্ধি করেন । উদ্যোগ নিয়ে তিনি আরও তিনজন সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা চারজন গুরু করলেন “স্ফায়র”, চতুর্ভুজ, বিচিত্রতার নিদর্শন ও মিলন-বন্ধনের প্রতীক ।

উপলব্ধি করলেন যিশুর কথায় “পবিত্র আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, তিনি আমাকে করেছেন অভিষিক্ত, তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রদের কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে।” (লুক ৪:১৮)

স্যামসন এইচ চৌধুরী, বাংলাদেশের বেসরকারী উন্নয়ন-খাতে ছিলেন একজন পুরোধা, বরেন্য একজন শিল্প-উদ্যোক্তা, আদর্শ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, উদ্ভাবনী মেধাসম্পন্ন একজন বিশাল ও বহুমুখী স্বপ্নদ্রষ্টা; তিনি ছিলেন দেশের ব্যবসায়ী সমাজের জন্য নৈতিকতা, সততা, চারিত্রিক প্রচ্ছন্নতা ও নিবেদিত প্রাণের একজন মহান প্রেরণাদাতা ও আদর্শ; সাদাসিঁদে, সাদা মনের এবং মানবতাবোধ সম্পন্ন একজন মানুষ; তিনি ছিলেন ধীরস্থির, নীতিপরায়ন ও প্রগতিশীল একজন ব্যক্তি।

ওষুধ-শিল্পে অতুলনীয় তার অবদান, করদাতা হিসেবে তিনি সেরাদের সেরা, সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ অসংখ্য ও অপূর্ব তার কীর্তি। তাই স্যামসন চৌধুরীকে দেয়া হয়েছে একাধিক স্বীকৃতি ও সম্মাননা, পুরস্কার, পদক ও নানা পরিভূষণ।

স্যামসন চৌধুরীর নিকট মঙ্গলসমাচার প্রচার করার অর্থ ছিল অসুস্থ, দারিদ্র-পীড়িত ও স্বাস্থ্যসেবা-বঞ্চিতদেরকে ভালবাসা এবং সেবায় তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া। বাইবেলের কথা অনুসারে ঈশ্বর যে মোহর তাকে দিয়েছেন তা ব্যবসায় খাটিয়ে, জনগণের কল্যাণে নিয়োগ ক’রে, তার বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি তিনি সাধন করেছেন। ব্যবসায়িক পেশাকে তিনি খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি তাঁর শিল্পকর্ম ও ব্যবসা-বানিজ্য আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠা, দূরদর্শিতা, শ্রম-মর্যাদা ও ন্যায্যতা, মান-সম্পন্নতা, বিশ্বস্ততা ও মমত্ববোধ দিয়ে পরিচালনা ক’রে তিনি এক অনন্য সাক্ষ্য রেখে গেছেন। তিনি সকল ব্যবসায়ী ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও দীর্ঘকালীন ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন।

৯১ নং সামসংগীতের ৯ পদে বলা হয়েছে: “প্রভু পরমেশ্বরে তুমি নিয়েছো আশ্রয়, পরাৎপরেই তুমি নিয়েছো শরণ”। জনগণকে ভালবেসে তিনি ঈশ্বরকেই ভালবেসেছেন; তাই প্রাত্যহিক সকল কর্মকাণ্ড সূচনার পূর্বে বাইবেল পাঠ ক’রে ধ্যান ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি তার ভালবাসা ও আসক্তি নিবেদন করতেন। মৃত্যুর পরে, আমাদের বিশ্বাস, পরমেশ্বর স্যামসন চৌধুরীকে নিজের করে নিয়েছেন এই কথাটি উচ্চারণ করে: “এসো, তোমরা পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা .. যে-রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে, তা তোমরা নিজেদেরই বলে গ্রহণ কর”। (মথি ২৫:৩৪)

অন্তিম ভোজে শিষ্যদের জন্য, যিশুর যাজকীয় প্রার্থনা ছিল: “তারা যেন সকলে এক হয়” (যোহন ১৭:২৩) – এই উক্তিটি খ্রিস্টান সমাজে তার সকল কর্মকাণ্ডে ও নেতৃত্বে এবং মণ্ডলীর অভ্যন্তরে ঐক্য প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে স্যামসন চৌধুরীকে বিশেষ প্রেরণা

যুগিয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি খ্রিস্টান সংগঠনের কর্মভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং কাথলিক মণ্ডলীর আর্চবিশপ ও বিশপদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে তাদের সাথে যৌথ ভাবে কাজ করেছেন। দেশের সরকারের নিকট খ্রিস্টান সমাজের ন্যায্য দাবি তুলে ধরতে, তিনি সমাজের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে একসঙ্গে কাজ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার স্মরণ হয়: তিনি আমাদের সর্বদাই বলতেন: “সরকার হতে পারে আমাদের সকল বিষয়ে জানে না, সুতরাং সরকারকে বুঝানোর দায়িত্ব আমাদের”। ব্যবসা-বানিজ্যের পাশাপাশি তিনি খ্রিস্টান সমাজের কল্যাণ নিয়ে অনেক ভাবতেন। এর পেছনে তার প্রেরণা ছিল যিশুর উক্তি: “যা-কিছু কৈসরের তা কৈসরকে দাও এবং যাকিছু ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও।”

আজ আমাদের প্রিয় স্যামসন এইচ চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকীতে স্মরণ করি তাঁর সহধর্মিনী অনিতা চৌধুরী, তার পুত্র ও কন্যা ও সন্তান-সন্ততি এবং স্ফায়র পরিবারের ৮১ হাজার সদস্যদের। তাদের সবার সাথে একাত্ম হয়ে স্যামসন চৌধুরীর অসংখ্য কর্মকীতি, অর্জন ও আদর্শ স্মরণ করি, আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আর ধর্মবিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে তাঁর ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যে, স্যামসন এইচ চৌধুরী ছিলেন প্রভু পরমেশ্বরের একজন “আশীর্বাদিত” ব্যক্তি; তাকে পেয়ে আমরাও হয়েছি “আশিষধন্য”। আমেন।

রচনা-২: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

ঢাকার আর্চবিশপের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ

“মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তরে” : আমার সেবাকাজের ওপর ধ্যান

আমার ৭৭তম জন্মবার্ষিকীতে, বিশপীয় অভিষেকের ৩০তম বার্ষিকীর পরিসমাপ্তিতে এবং ঢাকা মহাপ্রদেশের ধর্মপালের দায়িত্ব থেকে অব্যহতির এক স্মরণীয় দিনে, ১ অক্টোবরের পূর্বক্ষেপে বিগত ৪৮ বছর ধরে আমার সেবাকাজের ওপর ব্যক্তিগত ধ্যানটি নিম্নোক্ত কয়েকটি পয়েন্ট আকারে তুলে ধরছি।

প্রারম্ভিক কথা:

- > খ্রিস্টবর্ষ ১৯৪৩ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত (২৮ বছর) শৈশবকাল, শিক্ষাকাল ও গঠন কাল।
- > বিগত ১৯৭২-২০২০, ৪৮ বছরে দিকে ফিরে তাকিয়ে আমার সেবাকাজের ওপর এই ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ধ্যান।
- > এই ধ্যানে যাজকীয় সেবাকাজের তিনটি দিক সর্বদা ও সর্বক্ষেপেই উপস্থিত রয়েছে: পবিত্রীকরণ, শিক্ষাদান ও পরিচালন।

সেবাকাজের বিগত বছরগুলোকে চারটি অংশে ভাগ করে দেখছি:

ক ॥ পবিত্র ত্রুশ সংঘের যাজকরূপে সেবাকাজ: ১৯৭২-১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ: ১৮ বছর

- ১) স্বাধীন বাংলাদেশে অভিষিক্ত যাজকরূপে প্যারিশে পালকীয় সেবাকাজের সূচনা; যুদ্ধোত্তর কালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ; বিভিন্ন ধর্ম ও মণ্ডলীর জনগণের মধ্যে কাজ করার প্রথম সুযোগ।
- ২) ঐশাত্তিক পড়াশুনা: নীতি শাস্ত্র ও খ্রিস্টীয় জীবনের ওপর অধ্যয়ন।
- ৩) সেমিনারী ও সন্ন্যাসব্রতী গঠন-গৃহে গঠন-প্রশিক্ষণের কাজ, পবিত্র আত্মা মেজর সেমিনারীতে অধ্যাপনা।
- ৪) মণ্ডলীর জরুরী চাহিদা ও প্রয়োজনে, টিম বা “সেবাদল” হিসেবে ধর্মপ্রদেশীয় ও হলি ক্রস ফাদার মিলে আমরা, অর্থাৎ আমি, ফা: সিমা, ফা: বার্নার্ড, ফা: বেঞ্জামিন, এবং ফা: জ্যোতি এক সঙ্গে ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে মণ্ডলীর জন্য সেবাকাজ করতে উদ্যোগী ছিলাম; সেবাকাজের ক্ষেত্রসমূহ ছিল: দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার চিন্তাধারা অনুসারে বাংলাদেশ মণ্ডলীর নবায়ন, মণ্ডলীর সংস্কৃত্যায়ন ও স্থানীয়

মণ্ডলী গঠনের উদ্যোগ; উপাসনা-অনুষ্ঠানকে নবায়ন ও সমৃদ্ধায়ন, বিভিন্ন বিষয় ও দলের জন্য শিক্ষা-সেমিনার পরিচালনা; বাংলাদেশের খ্রিস্টীয় সাহিত্য রচনা ও প্রকাশনা; প্রতিবেশী ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমূহ ঘিরে সেবাকাজ; যুব সেবাদল, যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতীদের গঠন-প্রশিক্ষণ; পালকীয় সেবাকাজের জন্য জাতীয় সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, যা ছিল বর্তমান সিবিসিবি সেক্রেটারিয়েট (১৯৯৬) এর পথিকৃত, ইত্যাদি।

৫) চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে নির্জন ও পালকীয় সেবাকেন্দ্র এবং ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় সেবাদলের সূচনা ও কার্যক্রম (১৯৮৩-১৯৯০)।

৬) বিগত আঠারো বছরে তিনটি প্যারিশে নিয়োজিত ছিলাম এবং চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের প্রত্যেকটি ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবাদলের মাধ্যমে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কাজে যুক্ত ছিলাম।

খ ॥ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ হিসেবে সেবাকাজ (১৯৯০-১৯৯৫): ৫ বছর

১) ঐশবাণী: যোহন ২১:১৭: পিতরের প্রতি যিশুর আহ্বান: “যোনার পুত্র শিমন, তুমি আমাকে ভালবাস? ... আমার মেঘদের দেখাশুনা কর।” নির্দিষ্ট ধর্মপ্রদেশের প্রসঙ্গে যিশুর একই আহ্বান উপলব্ধি।

২) বিশপীয় মটো: “মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তরে” (জুন ৯, ১৯৯০ পবিত্র ত্রিভুত্বের পর্বদিনে বিশপরূপে নিয়োগ পাওয়া প্রেরণা)।

৩) আহ্বান: যাদের কাছে প্রেরিত তাদের মধ্যে পালক হবার আহ্বান।

ক) আহ্বানটা বিস্ময়কর, অস্বস্তিকর, আবার সাক্ষ্যদায়ক।

খ) অজানা এলাকার জনগনের পালক হওয়া: বাঙালী ও আদিবাসীর বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির জনগণ; কৃষ্টিগত বিভিন্নতা এবং যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের বিভিন্নতা।

৪) সেবাকাজের ধরন: পালক জনগণকে জানবে, চিনবে ও ভালবাসবে, আর জনগণও যেন পালককে চিনতে পারে; মঙ্গলবাণী ঘোষণা ও পালকীয় যত্নের মনোভাব সৃষ্টি ও ব্যাবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করা।

গ ॥ চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ হিসেবে সেবাকাজ (১৯৯৫-২০১০): ১৫ বছর

১) ঐশবাণী: লুক ৪:১৮-১৯: পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত: “প্রভুর আত্মা আমার ওপর অধিষ্ঠিত, তিনি আমাকে করেছেন অভিষিক্ত; তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে ... প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে।”

২) আহ্বান: চট্টগ্রামের জনগণের কাছে পালক হওয়ার একই আহ্বান: ইংরেজী-ভাষী জনগণ, বিভিন্ন কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বাঙালী জনগণ, পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের জনগণ।

৩) সেবাকাজ: লক্ষ্য মঙ্গলবাণী প্রচার: ঐশবাণী ঘোষণা; আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্ক ও সংলাপ; বিভিন্ন কৃষ্টির মানুষের কাছে মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়া :

ক) গঠন ও প্রশিক্ষণ: “ক্যাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা” অনুসারে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের শিক্ষা ও গঠন।

খ) পরিবার ও মৌলিক সমাজকে লক্ষ্য করে সর্বস্তরে পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সেবাকাজ।

ঘ ৷ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ হিসেবে সেবাকাজ (২০১১-২০২০) : ১০ বছর

১) ঐশবাণী: যোহন ১৭:১১: যিশুর যাজকীয় প্রার্থনা: “তারা যেন এক হয়”। এটাই মিলন, পবিত্রতা, ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ।

২) আহ্বান: সেবাকারী যাজকের সংস্কারীয় মর্যাদা নিয়ে পালক হওয়া; মিলন ও একতার পালক হওয়ার আহ্বান।

৩) সেবাকাজ: নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়া : মণ্ডলী হচ্ছে মিলনসমাজ, ঐশনিদর্শন ও প্রেরিত মণ্ডলীরূপে গঠন।

ক) মণ্ডলী মিলনসমাজ: (১) যিশুর সঙ্গে মিলন, (২) “তারা যেন এক হয়” এই পবিত্র আহ্বানে মিলন, (৩) পারিবারিক, যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনের আহ্বানে মিলন, (৪) ম-লীর প্রশাসনিক ও আত্মিক অনুগ্রহদানের মধ্যে মিলন, (৫) দীক্ষাস্নাত সকল ব্যক্তির পবিত্রীকরণ, শিক্ষাদান ও পরিচালনা - এই ত্রিবিধ কর্মদায়িত্বের মধ্যে মিলন।

খ) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা ও তার উত্তরকালে মণ্ডলী সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছে সে সম্বন্ধে সকলকে শিক্ষাদান করা।

গ) ভক্তজনগণকে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টীয় সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষাদান ছিল অন্যতম অগ্রাধিকার।

ঘ) মিলনসমাজ গঠনের লক্ষ্যে পরিচালনা দান করা।

ঙ ॥ সমাপনী মন্তব্য: আনন্দময় অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

- > মিলনসমাজ রূপে মণ্ডলীকে অভিজ্ঞতা করা ছিল ব্যক্তিগত স্বপ্ন পূরণের একটি সম্ভাব্য।
- > মণ্ডলী যে আত্ম-জ্ঞান লাভে সঠিক পথে বিচরণ করেছে, তা দেখে আনন্দিত।
- > মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার পরিচালনিক দান এবং উৎসর্গীকৃত জীবনের ক্যারিজম্যাটিক দানসমূহে আর্চডাইয়োসিস যে সমৃদ্ধ তা অভিজ্ঞতার আনন্দ অনুভব করেছে। তাছাড়া ধর্মপ্রদেশে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের মধ্যে আছে ব্যক্তিগত বহু প্রশংসনীয় আত্মিক শক্তি যা
- > মণ্ডলীর জন্য পবিত্র আত্মা দান করেছেন। মণ্ডলীর পরিচালনিক দায়িত্ব পালনে সেই দানসমূহের ব্যবহারে আনন্দ পেয়েছি।
- > ভবিষ্যতে মণ্ডলীর মধ্যে ভক্তজন, উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী ও যাজকদের মধ্যে মিলন আরও গভীর হবে সেই ভাবনা ও প্রত্যাশায় আমি আনন্দিত।
- > আনন্দময় প্রত্যাশায় থাকি যে, ভক্তজন ও তাদের নেতৃবৃন্দ সুযোগ পাবে ও সুযোগ গ্রহণ করবে নিজেদেরকে খ্রিস্টীয় জীবন ও মূল্যবোধে গঠন করতে, যেন তারা মনে ও আত্মায়, কর্মকাণ্ডে ও সাক্ষ্যদানে “সিদ্ধগণের সমবায়” সুযোগ্য স্থান করে নিতে পারে।
- > পরিশেষে, সকলার ভালবাসা ও সমর্থনে, সহৃদয়তা ও সহায়তায়, পরিচালনে ও পরামর্শে আপনাদের একাত্মতা অনুভব করেছে; প্রার্থনা ও শুভকামনায় স্মরণে ছিলাম সর্বদা। সর্বোপরি একই যাজকত্বের মিলনে আমরা অনুভব করেছি সংঘবদ্ধতা।

রচনা-১০: নিধন ডি'রোজারিও সম্পর্কে কয়েকটি কথা

বিংশ শতাব্দির প্রায় তিনটি দশক (ষাট, সত্তর ও আশি দশক) ধরে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে নিধন ডি'রোজারিও একজন খ্যাতনামা ভক্তবিশ্বাসী, খ্রিস্টীয় ও প্রজ্ঞাবান সাহিত্যকার ছিলেন।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে তাঁর জীবন, রচনা ও অবদান নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই মহান উদ্যোগে একজন শরিক হতে পেরে আমি নিজেও গর্বিত ও আনন্দিত। এই মহান ব্যক্তিকে স্মরণ করে আমার কিছু অভিব্যক্তি ও শ্রদ্ধা-সম্মান প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি ধন্য।

নিধন ডি'রোজারিও-এর রচনার বিষয়বস্তু ও প্রকাশনার মাধ্যম ছিল বিস্তৃত ও প্রসারিত, বৃহত্তর সমাজ-অঙ্গণে। মণ্ডলীর সীমানা তাঁকে সিমিত করে নি, বরঞ্চ যিশুর শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা সাহিত্য-শিল্পে তৎকালীন সময়ে তাঁর ছিল একচ্ছত্র বিচরণ, অসংখ্য ও অমূল্য অবদান। বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় সাহিত্যঙ্গণে পদচারণায় তিনি ছিলেন পথিকৃত। তাঁর বিচিত্র সাহিত্য-রচনায় তিনি ছিলেন: উপন্যাস-রচয়িতা, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, কলাম-লেখক, কবি, গীতিকার, বেতার কথিকার রচনাকার, ইত্যাদি।

তিনটি দশক ধরে তার রচিত সাহিত্যে আমি যাকিছু পড়েছি, তাঁর সান্নিধ্যে এসে যাকিছু দেখেছি এবং যাকিছু শুনেছি, তাতে আমার মনে যে ভাবনাগুলো স্পষ্ট হয়ে আসে তা হল নিম্নরূপ:

(ক) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা নিধন ডি'রোজারিও-কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। দ্বিতীয় ভাটিকান সভার চিন্তা-ভাবনা তাকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং বাংলাভাষায় তিনি তা প্রকাশ করেছেন। তৎকালীন সময়ে বিশ্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলো তিনি পড়তেন, মণ্ডলীর বিশপগণ এবং “প্রতিবেশী”র কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তার অনুবাদ করতেন অথবা তার সারসংক্ষেপ বাংলাভাষায় তুলে ধরতেন। যতবার “প্রতিবেশী অফিসে” সন্ধ্যা বেলা যেতাম ততবার দেখেছি তার টেবিলে ভরা মণ্ডলীর প্রধান প্রধান অনেক দলিল। নিজস্ব চাকুরির কাজ শেষ করে সন্ধ্যাবেলা “প্রতিবেশীতে” এসে স্নেহে প্রায় প্রতিদিন কাজ করতেন। এরই মধ্য দিয়ে আমার অনুভূত হয় যে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত হয়েছেন এবং তার সাহিত্য-চর্চায় প্রকাশ করেছেন।

(খ) যে তিনটি দশকের কথা বললাম, সেই দশকগুলোতে লক্ষ্মীবাজার, “প্রতিবেশী অফিস”কে ঘিরে একটি শিল্পী-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে নিধন ডি’রোজারিও ছিলেন খুবই শ্রদ্ধাবান, চিন্তাশীল ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি। উক্ত শিল্পী-গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন আরও অনেক নামকরা ব্যক্তি যারা স্বেচ্ছায় ও স্ব-উদ্যোগে নিয়মিত ভাবে মণ্ডলীর কল্যাণের জন্য কাজ করে যেতেন, যেমন, ফ্রান্সিস গমেজ (সোনাবাজু), বিমল গাঙ্গুলি, হেবল ডি’ত্রুজ, মার্ক ডি’কস্তা, যেরম ডি’কস্তা, ফাদার জ্যোতি গমেজ, জর্জ রুগ্রাম, ভিনসেন্ট গমেজ, প্রমুখ আরও অনেক সুহৃদ ব্যক্তিত্ব। নিয়মিত ভাবে তাদের মধ্যে আড্ডা বসত, বহু বিষয়ে আলোচনা করত, মণ্ডলীর জন্য কী প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া যায় তা চিন্তাভাবনা করত। অনানুষ্ঠানিক ভাবে মাঝে মাঝে সেমিনারীর শিক্ষক হওয়ার সুবাদে আলোচনার জন্য আমাকে ডাকা হত এবং তাদের সাথে অংশগ্রহণ করতাম। মণ্ডলীতে খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তজনগণের অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত ছিল খুবই দৃশ্যমান ও প্রশংসার যোগ্য। এই পরিবেশে নিধন ডি’রোজারিওকে দেখেছি এবং তার মননশীল জগতে প্রবেশ করার সুযোগ হয়েছিল। এই দলের মধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাবে তিনি অভিভাবক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন ও অংশগ্রহণ করতেন। সেখানে দেখেছি তাঁর চিন্তার গভীরতা, মনোজগতের প্রকাশ, বিনম্র ভ্রাতৃত্ব ও একসঙ্গে কাজ করার মনোভাব। তার মধ্যে ছিলনা কোন দাঙ্কিকতা, আত্ম-অহংকার অথবা নেতিবাচক বিচার-বিশ্লেষণ বা অমান্যকর কথাবার্তা।

(গ) “মৃত্যুঞ্জয়ী যিশু” নামক নাটকের রচয়িতা ছিলেন নিধন ডি’রোজারিও। যতদূর জানি এটি রচিত হয়েছে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। “প্রতিবেশীর শিল্পী-গোষ্ঠী”-র উদ্যোগে সিদ্ধান্ত হল এই নাটকটি মঞ্চায়িত হবে প্রথমবারের মতো, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে, ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে নবনিযুক্ত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও’র সমর্থনা অনুষ্ঠানে। একদিন আমার কাছে আহ্বান আসল উক্ত নাটকে যিশুর চরিত্রে অভিনয় করার। একদিকে আমি ফাদার, সেমিনারীতে অধ্যাপনা করছি, ভক্তজনগণের আমন্ত্রণে নাটকে অভিনয় করব – এ সব বিষয়ে আমাকে বিস্মিত করেছে। তথাপি ফাদার জ্যোতির পীড়াপীড়িতে রাজি হলাম। হেবল ডি’ত্রুজ পরিচালনা করবেন আর শিল্পী গোষ্ঠীর অন্যেরা সবাই থাকবেন।

অতীতে বেশ কয়েক বার নাটকে অভিনয় করেছি। কিন্তু “মৃত্যুঞ্জয়ী যিশু” বাংলাদেশে একটি ব্যতিক্রমধর্মী খ্রিস্টধর্মীয় নাটক। “মৃত্যুঞ্জয়ী যিশু” সম্বন্ধে আমার চিন্তা এভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়: এটি প্রচলিত নাটকের মতো নয়; সংলাপ বড়ো কথা নয়; ভাব ও পরিবেশ বড়ো সংলাপ হয়ে ওঠে; যবনিকার আড়ালে কণ্ঠস্বর, মঞ্চের সংলাপ ও অভিনয়, নীরবতা ও সঙ্গীত, শব্দ ও আলোকসাজ সবকিছুই যেন এক একটি চরিত্র, যার অভিনয়ে নিয়ে আসে ঐকতান। রিহাসালের সময়ে দেখেছি যে, নিধন ডি’রোজারিও

তার লেখা ও সংলাপ সংশোধন করছেন একটি আদর্শ সামনে রেখে। নাটকের পরিচালক হেবল ডি'ব্রুজ রিহার্সালের সময়, নিধনসহ অন্যসবার সামনে খুবই স্পষ্ট ও শক্ত করেই আমাকে বলে দিলেন: “ফাদার আপনি যখন যিশুর অভিনয় করবেন তখন আপনি মনে রাখবেন যে, আপনি যিশুর মতো – একাধারে মানুষ আবার অন্যদিকে ঈশ্বর। অভিনয়ের মধ্যে থাকবে এই দু'য়ের মিলন: মানব স্বভাব ও ঐশ্বর্যস্বভাব।” ভক্তজনের এই কথাগুলো ঐশতত্ত্বে যাকিছু শিখেছি তার স্মরণ করিয়ে দিল, অর্থাৎ যিশুর মানবস্বভাব ও ঐশ্বর্যস্বভাব – এই ঐশতাত্ত্বিক সত্যটাই অভিনয়ের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। ভক্তজনের মুখ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐশতাত্ত্বিক ধারণাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার নির্দেশটি আমাকে অনেক অনুপ্রাণিত করেছে। এই ধরনের ছিল নিধন ডি'রোজারিও-সহ অন্য পরিচালকদের চিন্তাধারা ও মনোভাব।

নিধন ডি'রোজারিও সম্পর্কে উপরে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করলাম। তাঁর জীবনের আরও কত দিক আছে যা অন্যেরা আরও সার্থকভাবে ও দক্ষতার সাথে বিবরণ দিতে পারবেন। তবে উপসংহারে যে কথাটি বলতে চাই তা হচ্ছে: মি নিধন ডি'রোজারিও নিজে দ্বিতীয় ভাটিকান সভার শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, স্বেচ্ছায় স্বেচ্ছাসেবী হয়ে, ঈশ্বর-প্রদত্ত আত্মিকদান ব্যবহার করে, একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী বৃহত্তর সমাজের উদ্দেশ্যে সাহিত্য চর্চা করেছেন, এর মাধ্যমে সবার কাছে মঙ্গলসমচার প্রচার করেছেন এবং বাংলাদেশের খ্রিস্টান সাহিত্য সম্ভারকে সমৃদ্ধ করতে অনন্য অবদান রেখে গেছেন। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের মন্ডলী ও খ্রিস্টানসমাজ তাঁকে স্মরণ করুক এবং তাদের চলার পথে তিনি একটি মহান প্রেরণা হয়ে চিরজীবী হয়ে থাকুক।

কার্ডিনালের প্রকাশিত রচনাসমূহ

- ২০২৬ মার্চ ১৯: “খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক রচনাসম্ভার: মিলনসত্তা – অংশগ্রহণ – মিশনকর্ম – সাক্ষ্যদান”, কার্ডিনাল-পরম্পরা, পাদ্রীশিবপুর, বরিশাল – ২০২৬ খ্রি.
- ২০২৬ January 30-31: Cardinal Patrick D’Rozario, csc and Fr. Vincent B. Rozario, csc,
“History of Holy Cross Novitiate in Bengal” and “History of Holy Cross Oriental Institute :
Pastoral and Retreat Centre”, Sacred Heart of Jesus Province, Moreau House, Dhaka
- ২০২৪ ডিসেম্বর ২৫: প্রধান লেখক ও সম্পাদক “শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর: ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ”। প্রকাশক শ্যামল লরেন্স গোমেজ, পাদ্রীশিবপুর।
- ২০২৩ জুলাই ২২, সম্পাদনায়: “খ্রিস্ট যে তুমি: আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির নবায়ন”, বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সিএসসি; অনুবাদক মন্টু ডি’কস্তা, কলকাতা, প্রকাশক মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ, বরিশাল।
- ২০২৩ এপ্রিল ৯: “একান্ত বাসনা করেছে”, অনুবাদ, Desiderio Desideravi, Apostolic Letter of Pope Francis. সিবিসিবি, এপ্রিল ৯, ২০২৩ খ্রি.
- ২০২৩ মার্চ ১৩: “শিক্ষা ও সেবা : ধর্মশিক্ষা – সামাজিক শিক্ষা – শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান”; কার্ডিনাল-পরম্পরা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ১৭ মার্চ, ২০২৩ খ্রি.
- ২০২২ December: Talks and Presentations Series – 3
“Church and Ministry: Bangladesh Local Church”, Cardinal Porompora, Pratibeshi Prakashoni, 25th December, 2022
- ২০২২ মার্চ: ধ্যান-সংকলন -১ : ভস্ম থেকে পুনরুত্থান – তপস্যাকালীন ধ্যান, কার্ডিনাল-পরম্পরা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ভস্মবুধবার ২ মার্চ, ২০২২ খ্রি.
- ২০২২ জানুয়ারি: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও সিএসসি-এর জীবন-চরিত, গ্রন্থ-লেখক: যোসেফ ডি’রোজারিও, কার্ডিনাল-পরম্পরা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ৮ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.

- ২০২১ অক্টোবর: বক্তব্য ও রচনা সংকলন - ১: “খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড - প্রথম খণ্ড;
প্রেক্ষিত: চট্টগ্রাম ও রাজশাহী ডাইয়োসিস”।
- ২০২১ অক্টোবর: বক্তব্য ও রচনা সংকলন - ২: “খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড - দ্বিতীয় খণ্ড;
প্রেক্ষিত : ঢাকা আর্চডাইয়োসিস”।
- ২০২১ পুনরুত্থান: উপদেশ-সংকলন - ১: “ধর্মোপদেশ : উপাসকমণ্ডলী ও ঈশ্বরের সাথে সংলাপ”, প্রতিবেশী প্রকাশনী।
- ২০২০ বার্তা-সংকলন - ১: “বড়দিন : সর্বকালের সুখবর”, প্রতিবেশী প্রকাশনী।
- ২০১২ “কাতলিক মণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত ধর্মসার”, সম্পাদক, প্রতিবেশী প্রকাশনী।
- ২০০২ “কাতলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা”: পবিত্র শাস্ত্রের উপর পালকীয় ধর্মোপদেশ পরিকল্পনা”, অনুবাদক ও সম্পাদক, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর।
- ২০০০ “কাতলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা”, অনুবাদক-দল, প্রধান সম্পাদক, প্রকাশনা: সিবিসিবি
- ২০০০ “মহান জুবিলী ২০০০” স্মরণিকা, লেখক ও সম্পাদক, চট্টগ্রাম।
- ১৯৯২ “মঙ্গলবাণীর পথযাত্রা”, পালকীয় পত্র, রাজশাহী বিশপ ভবন।
- ১৯৮৯ “ধন্যা কাতেরি তাকাকুইথার: সংক্ষিপ্ত জীবনী”, অনুবাদক, প্রকাশনা, জলছত্র, ময়মনসিংহ।
- ১৯৮৭ “বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মবিশ্বাস ও মানবোন্নয়ন”, গ্রন্থকার, প্রকাশকাল।
- ১৯৮৫ “তুমি আমায় ডেকেছো : এই তো আমি” : ‘মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের আহ্বান ও সাড়া দান’ অনুবাদ, প্রকাশনা, ঢাকা।
- ১৯৭৪ “খ্রিস্টীয় বাংলা-পরিভাষা”, সহ-সম্পাদক, প্রতিবেশী প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ।

লেখক পরিচিতি



কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি-এর জন্ম (১ অক্টোবর, ১৯৪৩) বরিশাল জিলার বাকেরগঞ্জ থানার পাদ্রীশিবপুর প্যারিশে। সেন্ট আলফ্রেড স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাগরদি হলি ক্রস নবিশেয়েটে প্রবেশ করেন এবং এক বছর পর (১৪/০৬/১৯৬২) প্রথমব্রত গ্রহণ করেন।

তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অভিষিক্ত যাজক (৮ জানুয়ারি, ১৯৭২)। যাজক হিসেবে ১৮ বছর (১৯৭২-১৯৯০) তিনি যে-সেবাকাজে নিয়োজিত

ছিলেন তা প্রধানত : জাতীয় উচ্চ সেমিনারিতে অধ্যাপনা, ডিনের দায়িত্ব এবং “প্রদীপন” সাময়িকীর প্রতিষ্ঠা-সম্পাদক, ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশে পালকীয় সেবাকর্ম, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ও গঠনদান, ধর্মপ্রদেশের পালকীয় সেবাদল ও সেবাকেন্দ্র পরিচালনা।

নতুন রাজশাহী ডাইয়েসিস (১৯৯০-১৯৯৫), চট্টগ্রাম ডাইয়েসিস (১৯৯৬-২০১০) এবং ঢাকা আর্চডাইয়েসিস (২০১১-২০২০)-এর ধর্মপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নভেম্বর ১৯, ২০১৬ খ্রি. বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো, পোপ ফ্রান্সিস তাঁকে কার্ডিনাল হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তিনি ৭৭ বছরের জন্ম-বার্ষিকীতে, অক্টোবর ১, ২০২০ খ্রি. ঢাকার আর্চবিশপের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

রচনা, অনুবাদ, গ্রন্থনা ও সম্পাদনায় তিনি সর্বদাই সম্পৃক্ত ছিলেন। বিচিত্র তাঁর রচনাসম্ভার: খ্রিস্টমণ্ডলীর ধারণা, শিক্ষাসেবা, ধর্মশিক্ষা এবং পালকীয় পরিকল্পনা এবং মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বিষয়ক বহু রচনা, প্রবন্ধ, বক্তব্য; বিভিন্ন উপলক্ষ ও বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে অসংখ্য কথিকা, বার্তা ও শভেচ্ছাবাণী, উপাসনা-ধ্যান-প্রার্থনা, ধর্মোপদেশ, গবেষণামূলক ইতিহাস, আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক ও সংলাপ এবং খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্ক, ইত্যাদি বিষয়ক রচনা।

ইতোমধ্যে তাঁর ২২ খানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। আগামীতে ব্যক্তিগতভাবে নির্জনসভা করার জন্য এবং অন্যদের সমবেত নির্জনধ্যান পরিচালনার জন্য একটি সহায়ক পুস্তক প্রকাশ করার প্রত্য্যাশা তিনি করেন এবং উপসনা-বর্ষপুঞ্জী অনুসারে বিশেষ কালের জন্য ধ্যানমূলক একটি পুস্তক প্রকাশ করার বাসনা রাখেন। এই পরিকল্পনা সম্পন্ন করার জন্য তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচনা করেন।